# শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি

অধ্যক্ষ ডক্টর হরিসাধন গোস্বামী
এম. এ. ( শিক্ষাতত্ত্ব ), এম. এ. ( বাংলা ), বি. টি.,
পি. এইচ. ডি. ( ক্যাল ), সাহিত্য-ভারতী ( বিশ্বভারতী )

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স
প্রা ই ভে ট লি মি টে ড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

প্রচ্ছদপট :

অঙ্কন—গৌতম রায়

মুদ্রণ—ব্লকম্যান প্রসেস

প্রথম প্রকাশ, ফাল্গুন ১৩৬৩

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১৩ হইতে
এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীসারদা প্রেস, ৬৫ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট,
কলিকাতা ৯ হইতে পি. কে. পাল কর্তৃক মুদ্রিত

# শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি

[ শিক্ষা-দর্শন ]

# ভূমিকা

শূণ্য থেকে কোনো জিনিসই আসেনি। ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ার ভেতর দিয়েই এসেছে মানুষের অভিজ্ঞতার ফসল। আদিম মানুষের কাছে যে সব উদ্দীপনা দেখা দিয়েছিল এবং সেই উদ্দীপনার প্রভাবে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল তার ফলে অর্জিত হয়েছিল মানুষের অভিজ্ঞতা। সেইটেই মানব জাতির অভিজ্ঞতার পুরোণো ভিত, যার উপর ভর করে নিত্য নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের মধ্য দিয়ে এবং পুরাতন নতুন জ্ঞানের সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে চলে এসেছে জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্রম-উত্তরণ।

তাই, পৃথিবীতে নতুন বলে কিছু নেই, সবই এই পূর্বতন অভিজ্ঞতার জের, একটা পদ্ধতি বা প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে নতুনত্বের যে জন্ম হয়, তা আসলে পুরাতন ও নতুনত্বের সমন্বয়ে এক অন্য ধরনের অভিজ্ঞতা। স্পীয়ারম্যানের 'নোয়ে জেনেসিস' ( Noe-genesis ) তত্ত্ব দিয়ে এটি ভালোভাবে অনুধাবন করা যায়। 'থিসিস—অ্যান্টিথিসিস সিনথেসিস' বলে যে তত্ত্বকথা সমাজবিজ্ঞানীরা বলে থাকেন তারও মূল কথা এই 'নোয়ে জেনেসিস'। থিসিস আসলে চিন্তার উদ্দীপনা, অ্যান্টি-থিসিস হোলো প্রতিক্রিয়া বা দ্বন্দ্ব বা সংঘাত আর এদের আকর্ষণে বিকর্ষণে 'ইডাকশন অফ কোরিলেটস্' ( Education of correlates )-এর মধ্য দিয়ে উদ্ভূত হয় যে 'সিনথেসিস'—তার নাম নূতন চিন্তা। একটা প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে তা আবর্তিত বিবর্তিত হয়ে আসে এবং একটা নতুন রূপ পায় বলে তার চেহারা হয় অন্যরকম। কিন্তু, এর গর্ভে লুকিয়ে আছে আদিম ও অর্জিত অভিজ্ঞতার ফলাফল। এইভাবেই মানুষের জ্ঞানবিজ্ঞান, শিক্ষাদীক্ষা, সংস্কৃতি সমাজ সভ্যতা এগিয়ে চলেছে। তবু, মানুষের হাতে রয়ে গেছে আরেক ক্ষমতা, যার নাম সজ্ঞান ও সক্রিয় মানসিকতা। মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে, পরিকল্পিতভাবে পুরাতন-নতুন অভিজ্ঞতার সম্পর্কের ভেতরে এবং তার আবর্তন-বিবর্তনের ক্রম-উত্তরণের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার ভেতরে একটা জোর ধাক্কা মারতে পারে, যার ফলে অভিজ্ঞতার মধ্য থেকেই নতুনের জন্ম এক নিরবচ্ছিন্ন ধারায় মহাসমারোহে পল্লবিত হয়ে উঠতে পারে মানবজীবনের চারটি মাত্রার (Four Dimensions) প্রত্যেকটি দিকেই, প্রত্যেকটি পদক্ষেপেই। পৃথিবীর জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষা-দীক্ষা সংস্কৃতিকে আমরা কোন্ উদ্দেশ্যের পথে, কোন পরিণতির দিকে নিয়ে যাব তার নির্দেশক আমরাই, অন্য কোনো অলৌকিক শক্তি নয়। এই জন্যই মানুষের হাতে আছে এক অমোঘ অস্ত্র—সদর্থক ও নঞর্থক চিন্তাভাবনা থেকে বাছাই

এর পর বাছাই এর মাধ্যমে সদর্থক চিন্তাধারার দিকে, নতুন নতুন অভিজ্ঞতার পথে এগিয়ে যাওয়া।

সমাজ জীবনের বাস্তব পটভূমিকায় শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিকে সদর্থক ধারায় প্রবাহিত করার জন্য চাই সজ্ঞান প্রয়াস। এই দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা চালিত হয়ে "শিক্ষা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি" পর্যায়ে কিছু বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ আছে।

শিক্ষার সামগ্রিক সূত্র অনুসন্ধান করতে গেলে তার বহুবিচিত্র শাখা-প্রশাখার কথা প্রসঙ্গক্রমে এসে পড়ে। 'শিক্ষা' জিনিসটা খুব খুঁটিনাটি অর্থে এক ব্যাপক ও বহু বিস্তৃত সমাজ-বিজ্ঞান।

এই দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা চালিত হয়ে সম্পূর্ণ ভারতীয় আদর্শের দিকে লক্ষ্য রেখে আবিশ্ব চিন্তাধারার ক্রম পরিণতি অনুধাবন করে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির সাধারণ সূত্রগুলিকে শিক্ষানুরাগী পাঠক-পাঠিকা, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও জনসাধারণের কাছে সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় মেলে ধরবার জন্যে কয়েকটি সুচিন্তিত পর্বে ভাগ করে কাজ করার যে পরিকল্পনা নিয়েছি, 'শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি তারই প্রথম প্রয়াস। প্রথম পর্বে দেশ-বিদেশের শিক্ষা সংক্রান্ত তাত্ত্বিক বা দার্শনিক চিন্তাধারার সাধারণ সূত্রগুলিকে আমাদের দেশের পটভূমিকায় আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির সূত্রগুলি যদি আমরা তুলে ধরতে পারি, তাহলে 'শিক্ষা' সম্পর্কে আগ্রহশীল পাঠক-পাঠিকা শিক্ষার একটি সামগ্রিক ধারণা করতে পারবেন এবং তা সার্থক হলে আমাদের পরিশ্রমও সার্থক হয়েছে বলে আমরা মনে করবো। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির মৌল সূত্রগুলিকে উপস্থাপিত করার ভেতরে একটি স্বচ্ছন্দ প্রাবন্ধিক রীতি অনুসরণ করা হয়েছে যার অন্যতম উদ্দেশ্য আমাদের বাংলা সাহিত্যের "প্রবন্ধ-সাহিত্য" শাখাকেও সমৃদ্ধ করা— অবশ্য কতখানি তা সম্ভব হয়েছে তার বিচার অপরে করবেন।

আলোচ্য গ্রন্থটি পরিমার্জন ও পরিবর্ধনের কাজে নিপুণভাবে সাহায্য করেছেন যাদবপুর বিদ্যাপীঠ (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) ও ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ অধ্যাপক শ্রীদিবাকরদাস মহান্ত মহাশয়। এই খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ্ তাঁর অমূল্য সময় ব্যয় করে গ্রন্থটির নানাদিক সম্পর্কে মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আমাকে চিরঋণী করেছেন।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ কর্তৃপক্ষ-কে, যাঁদের অসামান্য সৌজন্যের ফলে এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে।

"মধুনিকেতন"
পোঃ পাঁশকুড়া আর. এস.
মেদিনীপুর

হরিসাধন গোস্বামী

# সূচী

# প্রথম পরিচ্ছেদ

# শিক্ষার মূল তাৎপর্য

# শিক্ষার মূল তাৎপর্য

## ॥ ১ ॥

### লক্ষ্য ও সাধনা

শিক্ষার মূল তা° পর্য নিয়ে দেশ-বিদেশে আলাপ আলোচনার অন্ত নেই. 'শিক্ষা' বলতে কা বোঝায়, শিক্ষার উদ্দেশ্যই বা কী, শিক্ষার সংজ্ঞা কতরকমের হতে পারে এ নিয়ে তর্ক বিতর্ক চলে এসেছে দীর্ঘকাল ধরেই। নানা মতবাদের বিশ্বাস ও সংশয় ছিন্ন করে সঠিক নীতি নির্ধারণের জন্য শিক্ষাবিদ, অভিভাবক, শিক্ষানুরাগী, শিক্ষার্থী সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে সুচিন্তিত পন্থায়।

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন যুগে নানাবকমের সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যেই অনেক মনীষী শিক্ষার অর্থ, তাৎপর্য, উদ্দেশ্য, পরিণতি সম্পর্কে যুক্তিশীল তথা মনন-ধর্মী মতামত প্রকাশ করেছেন। সেই সব মতামত বিশ্লেষণ করলে দেখ. যায়, তাঁরা শিক্ষাব সংজ্ঞা বা তাৎপয নির্দেশ করতে গিয়ে এমন অনেক মন্তব্য করেছেন যার ভেতর একটি সার্বজনীন সত্যের যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। সেই সত্যটুকু যেকোনো সমাজ-ব্যবস্থার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য বলে আমাদের মনে হয়। অবশ্যই দেখতে হবে সেই সব চিন্তাধারা নানা যুগে উচ্চারিত হলেও আমাদের জাতীয় জীবনের সামাজিক-অর্থনৈতিক আদর্শের সঙ্গে তা কতখানি সঙ্গতিপূর্ণ। সেই সব আদর্শ বা ভাবধারা বিশ্বের চলমান সময়ে সর্বতোমুখী শিক্ষার বিকাশ সাধনের পক্ষে কতখানি গ্রহণযোগ্য বা কার্যকরী সত্য বলে গৃহীত হতে পারে তা বিচার বিবেচনা করে দেখতে হবে।

খুব চলতিভাবে 'শিক্ষা' কথাটির প্রতিশব্দ যাচাই করে দেখা যেতে পারে। কথাটির আভিধানিক অর্থ উদঘাটিত করে তোল', বা গড়ে তোলা। ভেতরে যে শক্তি আছে তার উন্মোচন বা প্রকাশ বা বিকাশ সাধনেরই অপর নাম শিক্ষা।

ইংরেজিতে 'এডুকেশন' কথাটির অর্থ ভেতরের শক্তির উদঘাটন করা। কিন্তু একটু ভেবে দেখলে দেখা যাবে কথাটি আংশিকভাবে সত্যকে প্রকাশ করছে। কারণ, শিক্ষা কি শুধু ভেতরের শক্তিই প্রকাশ করে থাকে, না বাইরের প্রভাবের সঙ্গেও তার সংশ্রব অনেকখানি? অনুকূল পরিবেশ না পেলে তো ভেতরের শক্তি

অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। বাইরের বাতাবরণ, চর্চা বা অভ্যাস এগুলিকে বাদ দিয়ে তো শুধু ভেতরের শক্তির উদ্ঘাটনের কথা তো ভাবা যায় না। মানুষের ভেতরে যে শক্তি আছে তার বিকাশ সাধনের জন্য দরকার বাইরের শক্তির প্রভাব, অনুকূল বাতাবরণের সাহচর্য। আবার দেখা যায়, এই বাতাবরণ সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হলেই ভেতরের শক্তির বিকাশ সাধন সহজ হতে পারে, সুন্দর হতে পারে। সমাজ ও জাতির প্রয়োজনে ব্যক্তির ভেতরের শক্তি ফুলের মতো প্রস্ফুটিত হয়ে কাজে লাগতে পারে। এইজন্য অবশ্যই দরকার সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্রীয় শক্তির সজ্ঞান ও সক্রিয় ভূমিকা।

অবশ্য প্রতিভা বলে একটা জিনিস আছে যা বহুবিধ বাধাবিপত্তির মধ্যেও ভেতরের শক্তির জোরে প্রস্ফুটিত হতে পারে অথবা ভেতরে শক্তি না থাকলেও বাইরের অনুকূল প্রভাবে একজন মানুষ কেষ্ট-বিষ্টু হয়ে উঠতে পারে। তবে কিন্তু, তা কেবলমাত্র ব্যতিক্রমের ঘটনা। প্রতিভা অনুকূল বাতাবরণ না পেলে তা বিপথগামীও হতে পারে কিংবা একেবারে বিনষ্ট হয়ে যেতেও পারে।

জাতির প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যেই কোনো-না-কোনো প্রতিভা বা শক্তি লুকিয়ে আছে যার সম্যক বিকাশ সাধনের জন্য চাই সজ্ঞান প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনা। একমাত্র রাষ্ট্রীয়-সামাজিক-অর্থনৈতিক সুসংগঠিত জীবন দর্শন ও পরিকল্পনা একটি জাতির প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর ভেতরের শক্তি বিকাশ সাধনের জন্য বাইরের অনুকূল বাতাবরণ সৃষ্টি করে তাকে সমাজ ও সভ্যতার অন্যতম অংশীদার ও স্রষ্টা হিসেবে তৈরি করার সুযোগ করে দিতে পারে।[১]

১। এই প্রসঙ্গে আমরা মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের একটি মন্তব্য বিশেষভাবে স্মরণ করতে পারি। কমিশন বলেছিলেন: শিক্ষার্থীর মগজে কতকগুলো পাঁচমেশালি তথ্যপুঞ্জ চাপিয়ে দিয়ে তাকে ভারাক্রান্ত করার চেয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হোলো তার অনুসন্ধিৎসাকে জাগিয়ে দেওয়ার পথনির্দেশ করা। ফ্রোয়েবেল বলেছিলেন: উপযুক্ত কর্ষণের সাহায্যে বেড়ে ওঠে উদ্ভিদ, আর মানুষ বেড়ে ওঠে শিক্ষার চর্চায়। এই সব ধারণা থেকে আমরা জানতে পারি, শিক্ষা মানে শুধু 'নেচার' ( Nature ) বা ভেতরের প্রকৃতির ব্যাপার নয়। তাকে শুধু 'নারচার' ( Narture ) বা পরিচর্চার ব্যাপারও বলা যায় না। আসলে, শিক্ষা জিনিসটাই প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতা ও তার সযত্ন পরিচর্যা, এই দুইয়েরই পারস্পরিক সাহচর্যে গড়ে ওঠে।

## ॥ ২ ॥

## শিক্ষা মানে জীবনবোধ

প্রাচীন ভারতীয় ঋষিরা বলেছিলেন—'জ্ঞানম্ বিজ্ঞান সহিতম্'। 'সা বিদ্যা যা বিযুক্তয়ে'। 'জ্ঞানম্ তৃতীয়ম্ মনুজস্য নেত্রম্'। শিক্ষা অর্থে তাঁরা বুঝেছিলেন বিশেষ ধরনের বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান অর্জন। যে-বিদ্যা আমাদের যাবতীয় অজ্ঞতা বা অবিদ্যার বন্ধন থেকে মুক্তি দেয়, যে-বিদ্যা আমাদের দূরদৃষ্টি বা দিব্যদৃষ্টিতে দেখবার শিক্ষণ দেয়, তারই নাম শিক্ষা। প্রাচীন ঋষিরা বস্তুগত জাগতিক প্রয়োজনকেও অস্বীকার করেন নি। তাঁরা বরং বস্তুকে একান্তভাবে জীবনধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণ হিসেবে আয়ত্তের মধ্যেই আনতে চেয়েছিলেন। মানসিক পরিতৃপ্তির জন্যে তাঁরা আরো অনেক বেশি গভীর তাৎপর্যের দিকে মনোনিবেশ করেছিলেন।

কী সেই গভীর তাৎপর্য বোধ? আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে সেই জিনিসটির নাম বলা যেতে পারে 'জীবন বোধ'। এর অর্থ জাগতিক যাবতীয় চিন্তাভাবনা জয় করে আরো উন্নত ধরনের মানসিকতার মধ্যে যুক্তির আনন্দলাভ করা। জীবনের তুচ্ছতা বা ক্ষুদ্রতা পার হয়ে বিরাটত্বের মধ্যে, অসীমত্বের মধ্যে, উদারতার মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করে দেওয়ার সেই ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও প্রয়াস প্রকৃত অর্থে ছিল জীবনবেদের সামিল। জীবনের এমন কোনো দিক নেই যার ভেতর সেই জীবনবেদের নির্দেশ বা তাগিদের অভাব থাকতে পারে। একটা পরিপূর্ণ মোহমুক্ত অনাবিল জীবনের দিকেই ছিল প্রাচীন ভারতের দৃষ্টি প্রসারিত।[২]

উপনিষদের ঋষির মুখে সেদিন উচ্চারিত হয়েছিল এই অমোঘ মহাবাণী—যার মধ্যে অমৃতত্ব নেই, শুধু ক্ষুদ্রতা ও তুচ্ছতার সংকীর্ণ দেওয়াল বা গণ্ডী আছে তা দিয়ে মানুষের জীবনের কী লাভ? মানুষের আদিম পশুত্ব নয়, তার শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর মূর্ত বিকাশে তাকে বিবর্তনের ধাপে মহত্ত্বের সীমায় তথা দেবতার

---

২। ইংরেজিতে যাকে বলে 'ডাইমেনসান', তা ছিল অনেক ব্যাপক, বিস্তৃত এবং উদার। জীবনবোধের উন্নত আদর্শ সব কিছুর ভেতরেই ছিল ক্রিয়াশীল। এককথায় মূর্ত ও জীবন্ত প্রকাশ ছিল জীবনবোধের লক্ষ্য ও সাধনা।

মর্যাদায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বাস্তব কর্মসূচী ছিল প্রাচীন শিক্ষাদর্শের মধ্যে। বর্তমানযুগে সভ্যতার নিদারুণ উন্নতি সত্ত্বেও আমরা দেখতে পাচ্ছি, মনুষ্যত্ব ধূলি-লুণ্ঠিত, যদিও মানবাত্মার জয়গান উচ্চারিত হয়ে এসেছে শত শত কণ্ঠে।[৩]

তাই, প্রয়োজন এমন এক সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পত্তন যার ভেতর প্রতিটি মানুষের বাস্তব জীবনের কঠিন রুক্ষভূমিতে বেঁচেবর্তে থাকার মৌল সর্তটুকু অবশ্যই প্রতিপালিত হয়।

সমাজতান্ত্রিক আদর্শের মধ্য দিয়ে শিক্ষার বিস্তৃত ও সুবিন্যস্ত কর্মসূচীর রূপায়ণের দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব চাহিদা, প্রবণতা ও ক্ষমতা অনুযায়ী বিকাশ সাধনের জন্য অনুকূল সুযোগের বিস্তার সকলের আগে প্রয়োজন।

গোটা সমাজের সর্বস্তরের শিক্ষার্থীরা সমাজতান্ত্রিক সমাজের রূপান্তরের কাজে যোগ্য নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পাবে এমন ধরনের সামাজিক বাতাবরণ সৃষ্টি করতে হবে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে।

ব্যক্তি এই ধরনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বস্তুগত জীবনের সমস্ত প্রয়োজন মিটিয়ে ফেলার কাজে যোগ্য ভূমিকা নেবে। কিন্তু, তা আত্মসর্বস্বভাবে নিজের সমস্যা সমাধানের জন্য নয়। সমগ্র জাতির সমস্যার সঙ্গে নিজেকে নিযুক্ত করে সামাজিক রূপান্তরের কাজে সে গ্রহণ করবে বিশিষ্ট, দায়িত্বশীল এবং তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা। বস্তুগত প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অর্থনৈতিক বৈষম্য ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে একদল প্রচণ্ড রকমের সুবিধা পাবে, আরেকদল কোনো সুবিধাই পাবে না বা সুবিধার মধ্যে দুর্দান্ত অসাম্য বজায় থাকবে—সে ক্ষেত্রে সমাজজীবনে কখনো সুস্থ পরিবেশ গড়ে উঠতে পারে না। এই সহজ কথাটারই আমরা মর্যাদা দিইনি।

ভারতীয় সমাজদর্শনের দিকে তাকিয়েই আমাদের চিন্তা করতে হবে আমরা কোন্ আদর্শের অভিসারী। জীবনের ব্যবহারিক ও বস্তুগত চাহিদার সামঞ্জস্যপূর্ণ

৩। ফুটপাতে অবহেলায় পড়ে থাকা সন্তানকে মাদার টেরেসার মতো মহাপ্রাণ সমাজকর্মী কুড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছেন প্রাণের আবেগ দিয়ে আলিঙ্গন করে। সেই সব শিশুদের মধ্যে তিনি দিতে চান সত্যিকারের জীবনবোধ। বাঁচার তাগিদের মধ্য দিয়েই মানুষের জীবনের প্রতিষ্ঠা, সে কাজ নিশ্চয় গৌরবের, প্রশংসার। কিন্তু সমস্যা কণ্টকিত 'সমাজব্যবস্থায় আমরা কজন মাদার টেরেসা পেয়েছি? ইচ্ছা বা আন্তরিকতা বা অনুভূতি থাকলেও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় আমরা কজন দরিদ্র অসহায় মুমূর্ষুকে সাহায্য করতে পারি?

সমাধান চাই সর্বাগ্রে। জীবনচর্চার ন্যূনতম প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বৈষম্য বা ফারাক মুছে ফেলতে হবে। তবে প্রয়োজনের চার দেয়ালে আবদ্ধ থাকাই তো আমাদের সমাজ সভ্যতার ধর্ম নয়। আমাদের আছে মহাবাণী। মুক্তি-মানে আমরা নিছক 'ফ্রিডম' বুঝি না—আমাদের মুক্তি সাধনা জীবনবোধের সাধনা।[৪]

তাই, নতুন ধরনের গণতান্ত্রিক-সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পত্তনই আমাদের কাম্য হওয়া উচিত। প্রয়োজন সকল মানুষের বেঁচেবর্তে থাকবার তাগিদের মৌলিক চাহিদা পুরণের প্রাথমিক শর্ত। সেইজন্য চাই সর্বপ্রকার সাহায্য ও প্রতিশ্রুতির নিশ্চিত নিরাপত্তা। প্রতি ব্যক্তি তথা শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশ সাধনের জন্য প্রয়োজন অনুকূল নিশ্চিত পরিবেশ ও সুযোগের গ্যারান্টি।

রাষ্ট্রীয়-সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে দরকার স্বচ্ছ, দৃঢ় ও নিরপেক্ষ কর্মসূচী, যার সাহায্যে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে এক উন্নততর মহান আদর্শের মানসিক চেতনায় সুশিক্ষিত করে তোলা যায়।

আমাদের বিরাট ও সুমহান ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি আছে, সম্পদ আছে। বিশ্বভুবন থেকে শ্রেষ্ঠ উপাদানকে গ্রহণ করে নেবার মতো আমাদের আদর্শগত চুম্বক-প্রেরণা আছে। অথচ জাতীয় ক্ষেত্রে বাস্তবসম্মত ও সুদৃঢ় কর্মসূচীর অভাবে আমাদের সবকিছুই যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে।

জীবনবোধ ও মূল্যবোধ এবং যুগ ও কালের সমস্ত দাবী ও প্রত্যাশা পূরণের অনিবার্য শর্তগুলি কার্যকরী করার জন্য চাই সুসংগঠিত ও সুনির্বাচিত সামাজিক মাধ্যম। এর মাধ্যমেই ব্যক্তির অন্তঃস্থিত ক্ষমতা, প্রতিভা, চাহিদা, দক্ষতা, অনুরক্তি প্রভৃতির সম্যক বিকাশ সাধন সম্ভব হতে পারে। গড়ে উঠতে পারে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির সুশিক্ষিত সুমার্জিত কর্মক্ষম ব্যক্তিত্ব, যাঁরা সমাজ সত্তায় একাত্ম।

৪। বস্তুগত উন্নতি যখন নিছক ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত হ্যাংলামিতে পরিণত হয়, তখন মানুষকে তা সংকীর্ণ এবং একদেশদর্শী করে তোলে। আমরা তো দেখতে পাই, সমাজের সবচেয়ে শিক্ষিত বুদ্ধিমান মানুষ কতো ধূর্ত, নীচ এবং আত্মসর্বস্ব হতে পারে সমাজ ব্যবস্থার দোষে। সামন্ততান্ত্রিক-ধনতান্ত্রিক-গণতান্ত্রিক অর্থনৈতিক বৈষম্যে ভরা জগাখিচুড়ি সমাজ ব্যবস্থায় কোনো উচ্চতর, মহান আদর্শগত প্রেরণা থাকে না বলেই তথাকথিত 'কালচার্ড' মানুষের মধ্যেও দেখা যায় মানসিক বর্বরতা।

প্রত্যেক ব্যক্তি যাতে সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাষ্ট্রনৈতিক তথা জাতীয় আদর্শের একজন সফল স্রষ্টা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে সেই শিক্ষণের কাজে সামাজিক মাধ্যমকে মজবুত করে গড়ে তোলাই হবে বাস্তবসম্মত এবং বিজ্ঞানসম্মত কাজ।

শিক্ষার মূল তাৎপর্য অনুধাবন করতে হলে সমগ্র শিক্ষার ব্যাপারটি এই পটভূমিকায় বিচার করে দেখতে হবে।

মনে রাখতে হবে আমরা আধুনিক যুগের মানুষ। প্রাচীন আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব ও সর্বজনীন দিকটি অনুসরণ করতে যাওয়া মানে এই নয় অন্ধের মতো প্রাচীন যুগের দিকে ফিরে যাওয়া। 'শিক্ষা' ব্যাপারটি তো নিছক জ্ঞানার্জনের ব্যাপার নয় বা কতকগুলি তথ্যের কচকচানি মগজে বা গলায় গলাধঃকরণের ব্যাপার নয়। যা খুশি হিজি-বিজি মগজে ও মুখে ঢুকিয়ে দেওয়া তার কাজ নয়।

মেকলের যুগে ইংরেজি শিক্ষা প্রচলন হওয়ার সময় একদিকে যেমন পাশ্চাত্য দিগন্তের সঙ্গে আমাদের সংযোগের নতুন স্বর্ণদ্বার খুলে গিয়েছিল, তেমনি ক্ষতি হয়েছে অন্য দিক থেকে—কেননা, ইংরেজ তার ব্যবসায়িক ও সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে কেতাবী শিক্ষার দিকে জোর দিয়েছিল কেরানী-কুল তৈরির উদ্দেশ্যে—সত্যিকারের মানুষ গড়ে তোলার দিকে নজর দেয়নি। ফলে, আমাদের জাতীয় স্বার্থ নিদারুণভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে—শিক্ষার কোনো জাতীয় সুস্পষ্ট নীতি তাই স্বাধীনোত্তর যুগেও ঠিক মতন গড়ে উঠেনি।

স্বামী বিবেকানন্দ এক সময় যথার্থ ভাবেই বলেছিলেন, শিক্ষা মানে কতকগুলি খবরাখবর জানার ব্যাপার নয়। কিংবা সেইসব তথ্যের ঠাসবুনুনি দিয়ে মস্তিষ্ককে ভারাক্রান্ত করার ব্যাপার-স্যাপার নয়। একটা যা-হোক কিছু বদহজম করা প্রলয়ংকর কাণ্ডকারখানা নয় এই শিক্ষার ব্যাপার। এর উদ্দেশ্য সত্যই অন্যরকমের। জ্ঞানের চর্বিতচর্বনকেই যদি শিক্ষা নাম দিয়ে অভিহিত করা হয় তাহলে তো পাঠাগারের শুকনো স্তূপীকৃত বইয়ের জঞ্জাল স্তূপকেই আমরা ঋষি আখ্যা দিয়ে বসতাম। এই ছিল স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তা।

ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষার ধারায় ছিল শুধু তোতা পাখির মতো বুলি কপচানো। নকলবাজি করে বা মগজভারি করে যেন-তেন-প্রকারেণ একটা 'হোয়াইট কলারের' চাকরির জন্য 'পাশপোর্ট' সংগ্রহ করাই সেই শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। মনুষ্যত্ব অর্জন বা ব্যক্তিত্বের সম্যক বিকাশ সাধনের মহান আদর্শের কথা নেহাৎ

ছিল কথার কথা। জীবনের গভীর তাৎপর্য জানবার জন্য সে শিক্ষাধারায় কোনো ঐকান্তিক প্রয়াস ছিল না। আমাদের জাতীয় সমাজকে জানবার জন্য কোনো সুষ্ঠু দৃষ্টিভঙ্গিও আমরা সেই শিক্ষার কাঠামোর মধ্যে পাই না।

ফলে, সেই বিদেশী নীতিপুষ্ট শিক্ষার ভেতর দিয়ে, কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে, আসলে আমরা পেয়েছিলাম এক কিম্ভূত কিমাকার বিকৃত রুচির কিছু বুদ্ধিমান মানুষ, যাদের না আছে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে সামগ্রিক জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি, না দেখা গেছে প্রকৃত মনুষ্যত্ব বোধের পরিপূর্ণ রূপ। তাই, এই ধরনের সঙ্কীর্ণ শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে একটা জাতির মর্মমূল শিথিল হয়ে যেতে বাধ্য।[৫]

## ॥ ৩ ॥

## ঐতিহাসিক পটভূমিকার বিশ্লেষণ

সমাজ বিবর্তনের পর্যায়ে মানুষ একদিন আদিম গোষ্ঠী প্রধান স্তর পার হয়ে ধাপে ধাপে এগিয়ে গিয়েছিল সামন্ততান্ত্রিক সমাজের দিকে। তারপর এল ধনতান্ত্রিক যুগ। বিগত শতাব্দীগুলিতে আমরা ভারতবর্ষে দেখেছি সামন্ততান্ত্রিক, আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সঙ্গে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার গোড়াপত্তন। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তার নিজের স্বার্থের অনুকূলে আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর পত্তন করে যে সামাজিক-অর্থনৈতিক জটিলতার জট তৈরি করেছিল তারই ভেতর দিয়ে আমাদের রেনেসাঁস বা পুনর্জাগরণের একটা তাগিদ সৃষ্টি হয়েছিল। সেই ধারার পরিণতিতেই এসেছে আমাদের স্বাধীনতা।

রাজা রামমোহন রায় ছিলেন নব জাগরণের প্রথম ও প্রধান পুরোহিত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ইংরেজ আমলেই এক স্বতন্ত্র ধারায় আমাদের

৫। স্বাধীন দেশে সেই একই শিক্ষাধারার জের যদি কিছু হেরফের ঘটিয়ে আমরা বহন করে যাই, তাহলে নীট ফল যা দাঁড়ায় তার নাম জাতীয় ক্ষতি। আমাদের প্রয়োজন শিক্ষাকে জীবনমুখী, বাস্তবধর্মী ও যুগোপযোগী করে প্রগতিশীলতার পথে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি যদি সঠিকভাবে নির্বাচিত হয় তবেই আমরা প্রকৃত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারবো। শিক্ষার ব্যাপক ও উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বাস্তবধর্মী বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষার দিকে এগিয়ে যেতে পারলে তবেই প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষার কাজ পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর হতে পারে। সেইজন্য প্রয়োজন স্বচ্ছ, সুদৃঢ় জীবন-দর্শন, যে-দর্শন দেশের সঠিকভাবে নির্বাচিত সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শের অনুগামী।

জাতীয় ভাবভাবনা ও ঐতিহ্যের মধ্যে দেখা দিয়েছিল নবজাগরণ। সেই নবজাগরণ সমাজের সার্বিক স্তরকে স্পর্শ না করলেও এবং জনগণের সার্বিক অংশ গ্রহণ তার মধ্যে দেখা না গেলেও জাতীয় ক্ষেত্রে একটি নতুন চেতনার পটভূমিকা অবশ্যই রচিত হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদী ধনতান্ত্রিক শক্তি বাইরের দিক থেকে আমাদের সমাজের মর্মমূলে যে আঘাত হেনেছিল, তারই ভেতর দিয়েই আমরা এক নতুন যুগের হাতছানি দেখতে পেয়েছিলাম। ফরাসী বিপ্লবের মধ্য দিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মিলনের যে যোগসূত্র গড়ে উঠেছিল, সেই ধারার সঙ্গেই আমাদের পূর্বসূরীরা দেশবাসীর আত্মিক সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। সর্বব্যাপী বা সমাজের সর্বত্রব্যাপী কার্যকরী শক্তির প্রকাশ হিসেবে সেই সংযোগ ছিল না। তবু, একথা মানতে হবে যে, ঐতিহাসিক গুরুত্বের দিক দিয়ে ভারতের মানসভূমিতে এসেছিল এক নতুন ধরনের পরিপ্রেক্ষিত।[৬]

কালের নিয়মে একদিন ইংরেজকে ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে—সত্য হয়েছে কবিগুরুর বাণী। কিন্তু, ইংরেজি শিক্ষার ঐতিহ্য রয়ে গেছে জাতীয়

৬। ইংরেজ এদেশে যে শিক্ষার ধারা প্রবর্তন করেছিলেন তার সবকিছুকেই অবশ্য এক আঁচড়ে বরদাস্ত করা যায় না। ঐতিহাসিক দিক থেকে মেনে নিতে হয় যে, ইংরেজরাই সর্বপ্রথম এই দেশে একটি সুবিন্যস্ত আধুনিক শিক্ষার কাঠামো গড়ে তুলেছিলেন। অবশ্য তাদের উদ্দেশ্য ছিল অন্যরকম। শাসন ও শোষণের হাতিয়ার হিসেবেই তারা ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন শিক্ষা-ব্যবস্থাকে, যদিও শিক্ষার মহান উদ্দেশ্য সম্পর্কে উচ্চ বাচ্যের কিছু কমতি ছিল না। একদল ইংরেজী-জানা ভদ্র সম্প্রদায় গড়ে তুলে শাসনধারার কাজে মজবুত কিছু সাঁকরেদ সৃষ্টি করার পেছনে অবশ্যই ছিল বণিক সুলভ মনোভাব। তবুও এই ধারার ভেতর দিয়েই আমরা একদল জাতীয় মনীষীর আবির্ভাব দেখতে পেয়েছিলাম, যাঁরা ভারতের নিজস্ব ভাবভাবনা ও ঐতিহ্যকে নতুন করে আবিষ্কার করার কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। আমাদের আরো লাভ হয়েছিল এরই ভেতর দিয়েই আমরা অনেক পাশ্চাত্য মনীষীর সান্নিধ্য পেয়েছিলাম। সেই সঙ্গে পাশ্চাত্যের জ্ঞানভাণ্ডারের অফুরন্ত মহাসম্পদেরও সান্নিধ্য। সেই সব সূত্র থেকে আমরা পেয়েছি এক সার্বজনীন অনুপ্রেরণা। ভারতের চিরকালীন বিশ্বজনীন আদর্শকে নতুন করে সঞ্জীবিত করে তোলার প্রেরণা। পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সাধনার অনুশীলন এদেশে ক্রমশ প্রসারিত হতে সুরু করে। বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার এই দানকে অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করার উপায় নেই। এই সব কারণে ইংরেজের সান্নিধ্য আমাদের জাতীয় জীবনে এক নতুন পরিপ্রেক্ষিত সৃষ্টি করেছিল, যার ফলে বিশ্বধারার সঙ্গে নতুন করে সংযুক্ত করার পথটি খুলে যায়। ইতিহাসের দিক থেকে এই প্রাপ্তি নিশ্চয়ই অসাধারণ। ভারতের নিজস্ব শিক্ষাদর্শনের বিবর্তন ও সংগঠনে ইতিহাসের এই আশ্চর্য গতি-প্রকৃতিকে সাদরে বরণ করে নেওয়াই সত্যিকারের কাজ।

জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে মিশিয়ে। এক আঁচড়ে তাকে বরবাদ করার কথা কেউ বলবে না। রামমোহন রায়ের কাছে সমগ্র জাতির কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। তিনিই যুগ-প্রগতিকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করে আমাদের জাতীয় জীবনকে যুক্ত করে দিয়েছিলেন আধুনিকতার সঙ্গে—সেই পরিমণ্ডল বিস্তৃত থেকে বিস্তৃততর হয়েছে নানা মনীষীর অবদানে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম যুগে মহাত্মা গান্ধী ডাক দিয়েছিলেন 'অসহযোগ আন্দোলনের'—ইংরেজের সঙ্গে সর্বব্যাপারেই অসহযোগিতার আহ্বান। তাঁর আগে রামমোহন শিক্ষার ক্ষেত্রে চেয়েছিলেন 'নিউ লার্ণিং' বা আধুনিক যুগের শিক্ষা। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠতম নির্যাসের ভিত্তিভূমি হবে শিক্ষার অপরিহার্য উপাদান। এই ছিল রামমোহনের ঐকান্তিক কামনা। কিন্তু মহাত্মাজীর 'অসহযোগ আন্দোলন' ইতিহাসের গতিকে উল্টোদিকে ফিরিয়ে দিয়ে জাতীয়তাবাদের নামে দেশকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল 'ওল্ড লার্ণিং' বা প্রাচীন ঐতিহ্য ভিত্তিক শিক্ষার দিকে। এই রকম সংশয় সেদিন অমূলক ছিল না। গান্ধীজী ছিলেন নিখাদ স্বদেশী আর রামমোহন ছিলেন প্রাচ্য পাশ্চাত্য সভ্যতার মিলন সূত্রের উপর দাঁড়িয়ে বিশ্বজনীন আদর্শের প্রবক্তা, যুগচেতনার প্রতীক। গণজাগরণের ক্ষেত্রে গান্ধীজী ও রাজা রামমোহন রায় কেউই তুচ্ছ নন—উভয়েরই অবদান নিঃসন্দেহে অনস্বীকার্য। কিন্তু কি করে যে ঐতিহ্য ও আধুনিকতাকে মিলিয়ে নিয়ে নতুন জাতীয় শিক্ষা-দর্শন গ্রহণ করা যায়, সেই সমস্যাটি রয়ে গেছে আমাদের জাতীয় জীবনে একটি জিজ্ঞাসার চিহ্ন হয়ে, তার সমাধান চাই। কোনো মনীষীকে তুচ্ছ করে নয়। ইতিহাসের প্রকৃত শিক্ষাই নিতে হবে আমাদের।

স্বামী বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন ভারতের আত্মিক শক্তির পুনর্জাগরণ এবং সেই সঙ্গে পাশ্চাত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠ উপাদানগুলির আত্তীকরণ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বিশ্বজনীন পটভূমিকায় ভারতের নিজস্ব সাধনার মূল্যায়ন করে হাতে কলমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করে দিয়েছিলেন 'বিশ্বভারতী' প্রতিষ্ঠা করে। জাতীয় শিক্ষানীতি নির্ধারণে দেশবাসীর মানস নেত্রে একটা 'মডেল' যাতে গড়ে উঠে, এই ছিল তাঁর ঐকান্তিক ইচ্ছা। মহাত্মা গান্ধীও চেয়েছিলেন জাতীয় ভাব-ভাবনার সঙ্গে শিক্ষার মৌলিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে। সেজন্য তিনিও ওয়ার্ধা পরিকল্পনার মাধ্যমে শুরু করে দিয়েছিলেন নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

ঋষি অরবিন্দ পণ্ডিচেরীতে প্রতিষ্ঠা করেন আন্তর্জাতিক মহা-বিশ্ববিদ্যালয়। দয়ানন্দজী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আর্যসমাজ ও গুরুকুল। অ্যানি বেসান্তের ছিল থিওজফিক্যাল স্কুল। যাদবপুরের জাতীয় শিক্ষা কাউন্সিল জাতীয় আদর্শে কার্যকরী শিক্ষার এক মহান কর্মযজ্ঞ শুরু করেছিলেন—বিনয় সরকার, সতীশ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিরা ছিলেন এই পথের পথিকৃৎ। আরো নানা জায়গায় নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়ে গিয়েছিল স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্বেই। এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে যথেষ্ট মৌলিকত্ব ও বৈচিত্র্য ছিল।[৭]

উনিশশো সাতচল্লিশে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর উনিশশো পঞ্চাশে দেশ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। পণ্ডিত নেহেরুর সুদক্ষ পরিচালনা ও নেতৃত্বে দেশ যখন অগ্রগামী, সে সময় দেশের ভেতরে ও বাইরে শুরু হয়ে যায় বিরাট রকমের ষড়যন্ত্র। এই ষড়যন্ত্রের জের এমনভাবে চলে যার ফলে দেশ জোড়া দেখা দেয় এক নিদারুণ মানসিক শূন্যতা। জাতীয় উৎসাহ ও উদ্দীপনা যা দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে ছিল তা স্তিমিত হয়ে গেল। মনে হোলো ভাবাবেগের যুগ আর নয়, কঠিন বাস্তবতার যুগে আমরা প্রবেশ করেছি। এমন এক এক সময় অবস্থা দাঁড়ায় যখন মনে হয় যেন সমস্ত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বিপর্যস্ত হয়ে যাচ্ছে এক আঁচড়ের আঘাতে। শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন যে কোনো চিন্তা বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা আমলাতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী কল কাঠির জোরে বিপর্যস্ত হতে দেখা যায়। জনগণ শিক্ষার ক্ষেত্রে যে স্বাধীন ইচ্ছা ও আন্তরিকতা নিয়ে অংশ গ্রহণ করে এসেছিলেন স্বাধীনতা-পূর্ব যুগে, তাঁরা ক্রমশ হারিয়ে ফেললেন অনুপ্রেরণা। নিছক দলবাজিতে সারা দেশের মন যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

৭। সকলেরই লক্ষ্য ছিল নবভারতের আদর্শসম্মত ও বাস্তবধর্মী শিক্ষা পরিকল্পনা গড়ে তোলার জন্য নীতি নির্দেশ করা। লক্ষ্যবিন্দু ছিল জাতির নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে কিভাবে বিশ্বদীক্ষাকে মিলিয়ে দেওয়া যায়। এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার পাশাপাশি ছিল ইংরেজ প্রবর্তিত সারা দেশজোড়া এক সুবিন্যস্ত শিক্ষার আধুনিক কাঠামো। দেশ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জনগণ জাতীয় ভাব-ভাবনায় উদ্দীপিত হয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন ধর্মনিরপেক্ষ উদার ও বলিষ্ঠ ধরনের গণতান্ত্রিক কল্যাণমূলক এক সমাজবাদী রাষ্ট্রের ভিত্তিভূমি। আমাদের প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় আদর্শের মূলনীতিতে উচ্চারিত হোলো মহান আদর্শের চরম অভিব্যক্তি। কিন্তু, দুর্ভাগ্যের বিষয়, সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল সারা দেশ জুড়ে এক বিচিত্র ধরনের মানসিকতা—ঘোষিত উচ্চ আদর্শের সঙ্গে বাস্তব ক্ষেত্রে নিদারুণ এক ফারাক। এরই ভেতর দিয়েই ইতিহাসের স্রোত বয়ে চলেছে, যার ছেদ নেই।

ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা-কাঠামোর গায়ে চুনকালির একটা চিত্র বিচিত্র রংপালিশ করে সংস্কারের যে মহড়া শুরু হোলো তার সঙ্গে বিভিন্ন কমিশন ও কমিটির সুপারিশের মিল নেই। এইভাবে জাতীয় শিক্ষার ভিত্তিমূলে আঘাত এসেছে এমন তীব্র ভাবে, যার ফলে শিক্ষা ব্যাপারটি দাঁড়িয়ে গেছে এক প্রহসনেব মতো ব্যাপার হয়ে। শিক্ষার তাৎপর্য যে জীবনভিত্তিক, বাস্তব জীবিকা অর্জনের সঙ্গে জাতীয় জীবনের চাহিদার যোগ যে আবশ্যিক, এই সাদামাটা সত্য কথাটা যেন বেমালুম ভুলে যাওয়া হয়েছে। অথচ শিক্ষার নানা ক্ষেত্রে যে কোনো উল্লেখযোগ্য কাজ হয়নি তা নয়—শিক্ষা সম্প্রসারণের উদ্যোগ আয়োজন, পরিকল্পনা, ব্যয় ইত্যাদি অনেক কিছুই ইংরেজ আমলের চেয়ে অনেক অনেক বেশি পরিমাণে হয়েছে। কিন্তু তবুও রয়ে গেছে আসল এক জায়গায় ফাঁকি। জনজীবনের চাহিদা ও লক্ষ্যপূরণের সঙ্গে প্রকৃত বাস্তবধর্মী সঙ্গতি গড়ে উঠেনি। গণতন্ত্রের বুনিয়াদ শক্ত করতে গেলে গণতান্ত্রিক কাঠামোর ত্রুটি বিচ্যুতিগুলির বৈপ্লবিক পরিবর্তন বা সংশোধন চাই, এই সত্যটি যেন কেউ উপলব্ধি করতে চাননি। অথচ আমাদের প্রয়োজন জীবনমুখী বাস্তবানুগ ঐতিহ্য অনুসারী বিশ্বপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গির প্রবর্তন। বর্তমান বিশ্বে সকলেই এক বিরাট সামাজিক-অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। ইতিহাসের চাকা উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দেবার সাধ্য কারো নেই।

## ॥ ৪ ॥

রাজা রামমোহন রায় ফরাসী বিপ্লবের শিক্ষার সঙ্গে ভারতের আত্মিক যোগাযোগের সেতুবন্ধন করে আমাদের আধুনিক যুগে উত্তীর্ণ করে দিয়ে গেছেন। তারপর পৃথিবীর বুকে এসেছে বহুবিচিত্র ঘটনার স্রোত। বিজ্ঞানের কল্যাণে সারা পৃথিবী এখন এক কেন্দ্রবিন্দুর দিকেই ধাবিত হয়েছে। বিজ্ঞানের নিত্য নতুন নতুন আবিষ্কার মানুষের চিন্তাভাবনা, বসবাস প্রণালী, বাঁচার তাগিদ ইত্যাদি নানা কিছুর মধ্যেই এনেছে এক বিস্ময়কর যুগান্তকারী গতিশীলতা। শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের কাছে এখন বুভুক্ষা, ক্ষুধা, বঞ্চনা, প্রতারণা, দস্যুবৃত্তি, পুঁজিবাদ, সামন্ততন্ত্র বা জমিদার-বাদ, কালোবাজার, ফাটকাবাজার, পণ্যের সঙ্গে

অস্ত্রের প্রতিযোগিতা, মারণ অস্ত্রের ঝনঝনানি ইত্যাদি ব্যাপার-স্যাপার মানব কল্যাণ বিরোধী শক্তি হিসেবে চিহ্নিত। এই ধরনের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের, জনগণের আশা আকাঙ্খা দুঃখদুর্দশা হাহাকার উদ্দীপনা উন্মাদনা সব কিছুর ভেতর দিয়েই আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতিকে নতুন করে পথ করে নিতে হবে।

গোষ্ঠী নিরপেক্ষতার যে মহান আদর্শ ভারত অনুসরণ করে এসেছে তা তার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিরই অনুগামী। শিক্ষার জাতীয় নীতি অনুধাবনের ক্ষেত্রেও আমাদের দরকার একটি সম্পূর্ণ ও স্বচ্ছ নিরপেক্ষ নীতি। আমাদের সুমহান ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সর্বাধুনিক মূল্যায়ণের ভেতর দিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে, এমন কি পৃথিবীর নানা প্রান্তে সংঘটিত বৈপ্লবিক চিন্তাভাবনার নির্যাসকেও নির্বিবাদে গ্রহণ করে নিতে হবে। শিক্ষার শ্রেষ্ঠ কাজ হবে জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে এক বিরাট বৈপ্লবিক চেতনাকে সমৃদ্ধ করে তোলা।

ইংরেজ আমলে আমাদের অভিজ্ঞতা আহরণের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র বিন্দু ছিল ইংরেজি শিক্ষা-দীক্ষা ভাষা সংস্কৃতি ইত্যাদি। কিন্তু, এখন ভারতবর্ষকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে আরো অন্যান্য দেশ থেকেও। আমেরিকা, রাশিয়া, চীন, জাপান, জার্মানী, সুইজারল্যাণ্ড, ডেনমার্ক ল্যাতিন আমেরিকা ইত্যাদি হরেকরকম দেশ থেকেই সেখানকার সংঘটিত নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার তাৎপর্যকে গ্রহণ করতে হবে আমাদের জাতীয় আদর্শের কষ্টিপাথরে বিচার করে। বিদেশ থেকে আহৃত যেকোনো অভিজ্ঞতাই আমরা গ্রহণ করি না কেন, তা যেন অন্ধ অনুকরণে পর্যবসিত না হয়। আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মধ্যে গতিশীলতা আনার জন্য যেটুকুই আমরা গ্রহণ করি না কেন, তা যেন প্রকৃত অর্থে আত্তীকরণ ও সাঙ্গীকরণ হয়। মনে রাখতে হবে আমরা ক্রমশ এক মিশ্র ও জটিল আধা-সামন্ততান্ত্রিক পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী সমাজ-ব্যবস্থার জের অতিক্রম করে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রবর্তনের দিকেই এগিয়ে যেতে চাই। আইনকে আইনের মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করে মানব কল্যাণের শ্রেষ্ঠতম আদর্শকে রূপায়িত করাই আমাদের উদ্দেশ্য। শিক্ষার চেয়ে বড়ো গণজাগরণের ও গণশক্তির বিন্যাস সাধনের বৈপ্লবিক হাতিয়ার আর কোনো কিছুই হতে পারে

না। তাই, শিক্ষাকে গড়ে তুলতে হবে একান্ত বাস্তব জীবনভিত্তিক শিক্ষা হিসেবে। সে শিক্ষা হবে জীবন ও জীবিকার একান্ত অনুগত। ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রাধান্য বা স্বার্থের দ্বন্দ্ব নয়, আমাদের প্রয়োজন ব্যক্তির মানোন্নয়ন ও সমাজসত্তার বিকাশ সাধন।

শিক্ষা পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে এমন কাঠামোর বিন্যাস চাই যার ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি হবে সমাজ তথা জনগণের জীবনের প্রথম সুরক্ষিত দুর্গ। খুবই পরিকল্পিতভাবে এবং মজবুতভাবে সারা দেশের অলিতে গলিতে রন্ধ্রে রন্ধ্রে শিক্ষার স্তরে এমন সুবিন্যস্তভাবে প্রসারিত করে দিতে হবে যার ফলে জনগণ বলিষ্ঠভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারেন শিক্ষার কর্মসূচীতে। এর ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি আমলাতান্ত্রিক খবরদারির হাত থেকে মুক্তি পেয়ে সত্যিকার আদর্শ ও বাস্তব কর্মসূচী নিয়ে সমাজজীবনের বৈপ্লবিক রূপান্তর সাধনে যোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবে। এইভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজজীবনের সর্বস্তরের শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষানুরাগী জনগণ, রাষ্ট্রীয় শক্তি একাত্ম হয়ে গড়ে তুলবে জাতীয় মর্যাদাসম্পন্ন এক সুশৃঙ্খল শিক্ষাব্যবস্থা। শিক্ষাক্ষেত্রে এই ধরনের বাস্তব সম্মত জীবন দর্শনই হতে পারে সত্যিকারের শিক্ষা-দর্শনের ভিত্তি ভূমি।

## প্রশ্নাবলী

১। শিক্ষার সংজ্ঞা কি?

২। সাম্রাজ্যবাদী শিক্ষার স্তর থেকে আমরা কতখানি নতুন ধরনের শিক্ষাচিন্তায় উন্নত হতে পেরেছি?

৩। শিক্ষার সংকীর্ণ ও ব্যাপক তাৎপর্য কি রকম হতে পারে?

৪। শিক্ষাই জীবন, জীবনই শিক্ষা—এই কথার তাৎপর্য কি?

৫। শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য কি?

৬। কি কি উদ্দেশ্যপূরণের জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়?

৭। শিক্ষার সামাজিক লক্ষ্য বলতে কি বোঝায়?

৮। শিক্ষা সংক্রান্ত ধ্যানধারণার বিভিন্ন মনীষীদের চিন্তাধারার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৯। শিক্ষার প্রকৃত ভিত্তি কি? এ সম্পর্কে যেসব দার্শনিক ভাবনা আছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণাত্মক পরিচয় দাও।

১০। শিশু কেন্দ্রিক শিক্ষা ও জীবন কেন্দ্রিক শিক্ষার বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করো।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

# শিক্ষার সংজ্ঞা নির্দেশনায় কিছু চুম্বক

# শিক্ষার সংজ্ঞা নির্দেশনায় কিছু চুম্বক

॥ ১ ॥

শিক্ষা দিতে গেলে বা পেতে গেলে আগে দরকার—'জানা'। এই 'জানার' প্রশ্নটি শিক্ষা-দর্শন ও শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে কৌতূহল সৃষ্টি করে এসেছে সেই গ্রীক যুগ থেকেই। ভারতেবও আদিযুগ থেকেই।

গ্রীক দার্শনিক সক্রেতিস বলেছিলেন জ্ঞানই সৎ, জ্ঞানই সত্য। কিন্তু কোন্ সেই জ্ঞান? যতদূর বোঝা যায়, তিনি জ্ঞান বলতে বুঝেছিলেন শুধুমাত্র শুদ্ধ অন্তরের জ্ঞানকেই। অথচ বিজ্ঞানের কল্যাণে আমরা দেখতে পাচ্ছি পৃথিবীতে চলেছে প্রতিমুহূর্তে নানা পরিবর্তন—অমিয় চক্রবর্তীর ভাষায় 'কোথায় চলেছো পৃথিবী?'

নিত্য নতুন নতুন আবিষ্কার পরীক্ষা-নিরীক্ষা আমাদের চিরকালের অনেক ধ্যান ধারণার ভিত্তিমূল কাঁপিয়ে দিচ্ছে। বিজ্ঞানের দাবী সে বলতে চায় শেষ সত্য বলে কিছু নেই। এক সত্য আবিষ্কার হচ্ছে, অন্য সত্যকে পথ ছেড়ে দিতে হচ্ছে। জ্ঞান বিজ্ঞানের এই বিপুল সমারোহের মধ্যে সেই জ্ঞানকেই আমরা সৎ বলতে পারি যা মানুষের কল্যাণে ও পৃথিবীর শুভকর্মে কাজে লাগাতে পারা যায়। অসৎ জ্ঞানের সাহায্যে পৃথিবীকে ধ্বংস করে ফেলা এক মিনিটের কাজ। পারমাণবিক শক্তির যুগে পৃথিবীকে গুঁড়িয়ে পুড়িয়ে শেষে করে দিতে বেশি সময় দরকার হয় না। আবার রেলের টিকিটের আয়তনের মাপে পারমাণবিক শক্তিকে মানবকল্যাণে কাজে লাগাতে পারলে কয়েক শতাব্দী ধরে রেলের ইঞ্জিন চালু রাখা যায়। শেষের জ্ঞানটাই সত্য, সেই জ্ঞানই সক্রেতিসের 'সৎ', আমাদের উপনিষদের 'অসতো মা সদ্গময়'—কেননা, এই জ্ঞানই তো মানবজাতির কল্যাণ ও শুভকর্মের অনুগামী।

বিজ্ঞানের যুগে আরেকটা বিপদ এই যে, জ্ঞানের পাহাড় জমিয়ে যন্ত্র বানাতে গিয়ে মানুষ নিজেই যন্ত্রের দাস হয়ে অমানুষ হয়ে পড়েছে। তাহলে সেই বাইরের জ্ঞানের সার্থকতা কোথায়? বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে, প্রযুক্তিবিদ্যার আশ্রয়ে আমরা জীবনযাত্রার যতোরকম স্থূল আয়োজন উপকরণ আছে তারই রোশনাই জেলে চোখ ধাঁধানো জৌলুসে উন্মত্ত হয়ে যেতে পারি কিন্তু অন্তদিকে বুদ্ধির

জোরে সেই স্থূল আয়োজন উপকরণ সীমাবদ্ধ একটি শ্রেণীর মধ্যে রেখে দেশের অধিকাংশ মানুষকে ঠেলে দেওয়া যায় নিদারুণ বুভুক্ষা ও দারিদ্র্যের সীমাহীন পঙ্কে—তাহলে সেই সভ্যতার কী দাম? মজা করে, বিদ্রূপ করে, দর কষাকষি করে, মগজের কসরত দেখিয়ে বুদ্ধির কাটকাবাজি করে এক শ্রেণীকে পদানত করে রাখা যায়। সেই সভ্যতার তাহলে কী দাম? সেইজন্য চাই পরিচ্ছন্ন জীবন ও সমাজ দর্শন, প্রজ্ঞার আলোকময় দীপ্তি। সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে, শিক্ষার মধ্য দিয়ে সমাজের সর্বস্তরে এক উন্নত বিজ্ঞানসম্মত জীবনযাপন ও জীবন-অনুভূতির উজ্জীবন। মানুষের ভেতরের শক্তির সঙ্গে বাইরের শক্তির সংঘাত নয়, একেকে উপেক্ষা করে আরেকের সার্বভৌম প্রতিষ্ঠা নয়। প্রয়োজন ভিতরের ও বাইরের অশুভ শক্তিকে পরাজিত করে মানবকল্যাণমুখী সদর্থক জ্ঞানের সুশৃঙ্খল বিন্যাস, সামাজিক অনুপ্রেরণা সামাজিক তাগিদ। এই কাজে সবচেয়ে অগ্রণী উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে পারে সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাষ্ট্রনৈতিক মানবকল্যাণমুখী বাস্তবধর্মী ও বিজ্ঞানসম্মত কর্মসূচীর প্রতিষ্ঠা। শিক্ষাই সেই কর্মসূচীর মাধ্যম।

উপনিষদের ঋষি বলেছিলেন—'অসতো মা সদ্‌গময়। তমসো মা জ্যোতির্গময়। মৃত্যোর্মাঽমৃতম্ গময়'। এর অর্থ আমাদের সত্যের দিকে পরিচালনা করো, অসত্যের দিকে নয়। আমাদের আলোর দিকে নিয়ে চলো। নঞর্থক মনোভাব নয়, সদর্থক মনোভাব নিয়ে জগৎ ও জীবনের দিকে পরিচ্ছন্নভাবে তাকাবার অত্যাশ্চর্য আকুতি লুকিয়ে আছে এই মন্ত্রের মধ্যে। অন্ধকার থেকে আলোর দিকে, আলোকতীর্থের দিকে নিয়ে চলো আমাদের। আমরা আলোকের অভিসারী। মৃত্যুকে পরাস্ত করে নিয়ে চলো পরিপূর্ণতার পথে, সাফল্যের দিকে, যা-কিছু মৃত্যু, যা-কিছু জরা, যা-কিছু জঞ্জাল, যা-কিছু অসৎ তাকে বিনষ্ট করে এগিয়ে চলো সৃষ্টিশীলতার পথে, গতিময়তার দিকে, শুভকর্মের মাঙ্গলিক ও নান্দনিক দিকটি সযত্নে পরিচর্যা করে—অন্তরে ও বাহিরে চাই এক আত্মীয় সুলভ ঐক্য। এই বাণী তো সম্পূর্ণতার বাণী, শুভ আদর্শের বাণী। শুভ ও অশুভ শক্তির দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত জয়ী হয় শুভশক্তিরই। মানব সংসারে এইটেই নিয়ম। এইটেই সত্যিকারের নিশানা। সেই শুভশক্তির দিকেই আমাদের যেতে হবে, এইটে কোনো নিছক স্তব বা প্রার্থনা নয়, এইটেই বাস্তব। বাস্তব কর্মসূচী

ও জীবনবোধের অনুশীলনে অশুভ শক্তিকে পরাভূত করে নিত্য নতুন নতুন সত্যের পথে, জয়ের পথে, সাফল্যের পথে এগিয়ে যেতে হবে মানব সভ্যতাকে। সভ্যতার ক্রম উৎক্রমনের এই সদর্থক দিকটিই জোর পেতে পারে শিক্ষা দর্শন ও শিক্ষার বাস্তব কর্মসূচী রূপায়ণের মাধ্যমে। শুভ শক্তির বিজয় পতাকা উড্ডীন করেই এগিয়ে যেতে হবে মানব সভ্যতাকে আরো প্রগতির দিকে, গতিশীলতার পথে। এইভাবেই আসবে মানবজাতির সার্বিক কল্যাণ ও পরিচ্ছন্ন মুক্তি। সত্যিকারের শিক্ষা-দর্শন এই সমুজ্জল উচ্চ আদর্শকেই চোখের সামনে তুলে ধরবে সকলের আগে। এর চেয়ে জরুরি কাজ আর কিছু নেই।

হতাশা, অবিশ্বাস, দ্বিধাদ্বন্দ্ব, যুদ্ধ, দাঙ্গা, রক্তপাত, রাজনৈতিক ধুরন্ধরতা, শঠতা ইত্যাদি যতো রকমের অন্ধকার দিক আছে, তাকে পরাজিত করতে হবে সজ্ঞান প্রচেষ্টায় এবং সংগঠিত উদ্যম নিয়ে। মানবজাতির সার্বিক সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক মুক্তির বিরোধী শক্তিকে পরাভূত করে, সমাজের সর্বস্তর থেকে দারিদ্র্য, অশিক্ষা, জরা, মৃত্যু, বুভুক্ষা, ক্ষুধাকে পরাস্ত করে এগিয়ে যেতে হবে সুখী ও প্রোজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকেই। বিজ্ঞানের বহুমুখী প্রগতিশীলতাকে কাজে লাগাতে হবে এমনভাবে যার সাহায্যে মানুষের জীবনের সর্বপ্রকার অশুভ অন্ধকার ও মারী শক্তিকে পরাভূত করা যায়। সেইজন্য চাই সজ্ঞান অথচ বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। ডষ্টয়ভস্কি বলেছিলেন, আদিম মানুষের কল্পনায় ভগবান নামে যে জিনিসটি প্রবেশ করেছিল আসলে তা বৃহৎ বিশ্ব সম্পর্কে আদিম মানুষের উদার ও সর্বতোমুখী ঐক্যের বিরাট পরিকল্পনা ছাড়া কিছু নয়। তুচ্ছতা ও দীনতার উর্ধে মানবিক শক্তির ঐক্য ও সম্প্রসারণ সম্পর্কে সেই ধারণা খুবই মূল্যবান এবং শিক্ষাপ্রদ সন্দেহ নেই। মানুষ আজ বিজ্ঞানের কৌশল আয়ত্ত করে মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকেও পরাস্ত করে রকেটের সাহায্যে চাঁদে অবতরণ করেছে আবার পৃথিবীর মাটিতে ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছে। বিরাটত্বকে, অসীমত্বকে করায়ত্ত করার সাধনায় মানুষের এই জয় নিঃসন্দেহে তার জ্ঞান বিজ্ঞানের সাধনার চরম অভিব্যক্তি।

সেই সঙ্গে একথাও ভেবে দেখা দরকার, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ যখন অনাহারে বুভুক্ষায় মুমূর্ষু, তখন বিলাসবহুল এই মহাকাশ পরিক্রমার পেছনে বিপুলতম আর্থিক ব্যয় যুক্তিসম্মত কিনা। মানুষের কল্যাণের জন্য, পৃথিবীর সমৃদ্ধির জন্য বিজ্ঞানের মহান প্রয়াসকে কেউ নিন্দা করবে না কিন্তু দেখতে হবে

আমাদের এই যুগে মানব সভ্যতার প্রয়াসের ভেতর কতখানি সদর্থক ইচ্ছা কাজ করছে। রাধাকৃষ্ণন বলেছিলেন, মানুষের একটা অন্যরকম ভাগ্যের পরিহাস আছে—সে তার নিজের শক্তিকে লাভ করবার এবং সেই শক্তিকে অনুভব করবার যোগ্যতা রাখে, যা আর কেউ পারে না। এইসব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমরা শিক্ষা-দর্শনের দিক দিয়ে বলতে পারি, প্রকৃত শিক্ষা নিছক জ্ঞানের চর্বিত চর্বন নয়। জ্ঞানের সর্বোচ্চ বিকাশ একদিকে, অন্যদিকে বিরাটতম জ্ঞানশূন্যতার কুহেলিকা—এই বিলাসবিভ্রম থেকে মানবজাতির চাই পরিচ্ছন্ন মুক্তি। প্রকৃত শিক্ষা বা জ্ঞান কোনো অশুভ শক্তিকে প্রশ্রয় দেয় না—তার আসল লক্ষ্য, সদর্থক দিকটির দিকেই। যে-জ্ঞান আমাদের পৃথিবীকে সুন্দর ও মহৎ করার কাজে উপযোগী, যে-জ্ঞান সমস্ত অশুভ অকল্যাণমূলক শক্তিকে পরাভূত করার শক্তি যোগায়, যে-জ্ঞান জনগণতান্ত্রিক সমাজবাদী সমাজ সভ্যতা সংস্কৃতির প্রবর্তনের পথে আলোক দিশারী, একমাত্র সেই জ্ঞান, সেই জীবন-দর্শন, সেই শিক্ষা-দর্শন আমরা গ্রহণ করতে পারি, তার থেকে পথনির্দেশ পেতে পারি এবং তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে পারি।[৮]

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, প্রকৃত শিক্ষা পরিপূর্ণতার আকাঙ্খাকে প্রসারিত করে। এই পরিপূর্ণতা মানেই মানুষের জীবনের যতোরকমের দিক আছে তারই সম্পূর্ণতা সাধন বা ঐক্য সাধন। মহামতি কাণ্ট বলেছিলেন একজন ব্যক্তির ভেতর যতো রকমের শক্তি আছে তার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য যতখানি সম্ভব সবকিছু করতে হবে। শিক্ষার একটি সাধারণ সূত্র নির্দেশ করে তিনি এইভাবে শিক্ষা-দর্শনের প্রাথমিক তত্ত্ব উদ্ভাবন করে দেখিয়েছিলেন, শিক্ষা মানে বিকাশ বা উন্মোচন। প্রকৃত অর্থে কাণ্টের এই চিন্তাধারার সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারার কোনো মূলগত বিরোধ নেই। আমাদের প্রশ্ন এই

৮। এই প্রসঙ্গে রাধাকৃষ্ণনের আরেকটি মন্তব্য বিশেষ ভাবে স্মরণযোগ্য। তিনি বলেছিলেন: যদি আমাদের জীবনযাত্রার প্রণালীকে উন্নত করতে হয়, তাহলে আমাদের আত্মবোধের চাই দ্রুত পরিবর্তন। যদি আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনধারার ভেতর পেতে হয় গতিশীল সঞ্চরণ প্রাণতা, তাহলে আমাদের প্রাচীন অন্ধ-কুসংস্কার বিসর্জন দিয়ে নতুন স্বপ্নের রূপায়ণের দিকেই এগিয়ে যেতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বলা যায়, মানুষের আন্তর-রহস্য, বহিঃপ্রকৃতির সীমাহীন দান, মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্রিয়াকৌশল—সবকিছুকেই মেনে নিয়ে পৃথিবীকে সুন্দর বাসযোগ্য ভূমি হিসেবে গড়ে তোলার জন্য চাই প্রাণপণ সাধনা। শিক্ষা-দর্শন এই কাজেরই দিগ্‌দর্শন।

যে, এই সূত্র বা নীতি হয়তো কথার কথা হয়ে থাকবে যদি না আমরা জনগণতান্ত্রিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাষ্ট্রনৈতিক বলিষ্ঠ বাস্তবধর্মী বিজ্ঞানসম্মত কর্মসূচী নিয়ে অগ্রসর হই, যদি না সমাজের ভেতর থেকে প্রেরণার কেন্দ্রবিন্দুকে মানব কল্যাণমুখী ও শুভবুদ্ধির আধারস্থল হিসেবে গ্রহণ করি।

রবীন্দ্রনাথের সেই অবিস্মরণীয় উক্তি এই প্রসঙ্গে মনে আসে। তিনি বলেছিলেন: 'জীবনের সঙ্গে জীবনের আশ্রয়স্থল খোঁজার নাম শিক্ষা'। জীবনবোধ আমরা পেতে পারি আন্তর-রহস্যের সঙ্গে বহিঃপ্রকৃতির বিরাটত্বের নিগূঢ় ঐক্যবোধের মধ্য দিয়েই। আর এই উপলব্ধি জীবনে সত্য হতে পারে যদি আমাদের জীবনের আশ্রয়স্থলটি বাস্তবানুগ হয়। জীবনের আশ্রয়স্থলটির নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি আসতে পারে সমাজসম্মত নিরাপত্তার ভেতর দিয়ে। এই নিরাপত্তা মানেই মানুষের যা-কিছু আবশ্যিক, সেই প্রত্যাশার পূরণ। এই প্রাথমিক সত্যটি মজবুত হলে তবেই মানুষের পক্ষে সামাজিক সত্য, জাতীয় সত্য বিশ্ব ঐক্যবোধের সত্য, মানবকল্যাণের সত্যকে জীবন্ত ও মূর্ত করে পাওয়া যায়। এই সব কিছুরই যোগফল থেকে আসে জীবনবোধ। শিক্ষার প্রকৃত অর্থ এই জীবনবোধকে পাওয়া। এবং এইভাবেই 'হওয়া'র জন্যেই শিক্ষার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি চাই।

উপনিষদের ঋষির কথা এই প্রসঙ্গে আমরা আবার স্মরণ করতে পারি। বলা হয়েছিল, সম্পূর্ণতা অর্জনের জন্যই ব্যক্তিকে অর্জন করতে হবে জ্ঞান। সেই জ্ঞান মানে শুধু তথ্য আহরণ নয়—এই জ্ঞান মানে প্রকৃষ্টভাবে অর্জন করা মানসিকতা, যার নাম প্রজ্ঞা, ইংরেজিতে যাকে বলে 'উইসডম'। জ্ঞানের সারাৎসার এই প্রজ্ঞা। তাই সৎ বা সত্য।[১]

১। নিছক জ্ঞানের তথ্যস্তূপ থেকে মানুষ যা পায় তা থেকে সে বড়জোর তথ্যবিদ্ হতে পারে। কিন্তু তথ্যের ভেতর প্রাণবস্তু নেই। তাই আত্মবিদ্ বা জ্ঞানী বা শিক্ষিত হতে গেলে মন্ত্রবিদ্ 'হওয়ার' সাধনা চাই। বাইরের জ্ঞান আর অন্তরের নিগূঢ় ঐক্যের মধ্য দিয়েই মানুষের পরিপূর্ণ সত্তার সম্যক বিকাশ সাধন সম্ভব। এ যুগের মানুষ তথ্যবিদ্ হয়, তন্ত্রবিদ্ হয়, মন্ত্রবিদ্ ও আত্মবিদ্ হয় না—তাই এই শিক্ষা ও সভ্যতার ভেতর গুরুতর সংকট।

## ॥ ২ ॥

## সার্বজনীনতা ও যুগের দাবী—পরস্পরের পরিপূরক

বিজ্ঞানের যুগে আমরা যন্ত্রকে গড়ে তুলেছি। সেই যন্ত্র মানুষেরই তৈরি। মানুষের প্রয়োজনেই তার সৃষ্টি। সেই যন্ত্র আমাদেরই যান্ত্রিক কৌশল ও প্রযুক্তিবিদ্যার কলাবৈভবে আমাদেরই মেধা ও বুদ্ধির দ্বারা চালিত ও নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু যন্ত্র যখন প্রাধান্য অর্জন করে, এমন কি যন্ত্রের উপর মানুষের আর লাগাম থাকে না, তখন মানুষ হয়ে পড়ে যন্ত্রের ক্রীতদাস। বিজ্ঞান আমাদের শাণিত বুদ্ধিবৃত্তির চর্চার ফল। এর অপপ্রয়োগ ঘটলে আমাদের পিঠ কুঁজো হতে কতোক্ষণ। যন্ত্র মানুষেরই তৈরি, মানুষের প্রয়োজনেই যখন সৃষ্টি, তখন তার ব্যবহারিক দিকটুকু মানুষের অন্তর সৌন্দর্য ও শুভবুদ্ধির কাজেই ব্যবহার করতে হবে। শুভবুদ্ধির প্রেরণায় বিজ্ঞানকে মানবমুক্তির অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। এইখানে চাই মানুষের প্রকৃষ্ট জ্ঞান, তার আন্তর সৌন্দর্য।

উপনিষদের ঋষি বলেছিলেন—সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে। যে-বিদ্যা আমাদের অশুভ বুদ্ধি থেকে মুক্তি দেয়, যে-বিদ্যা আমাদের অন্ধকার, হতাশা, অবিশ্বাস, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, যুদ্ধ, অশান্তি, সাম্রাজ্যবাদী নিগূঢ়, পুঁজিবাদী কলাকৌশল প্রভৃতির মতো সামাজিক অবক্ষয় সৃষ্টিকারী উপাদানকে নিরস্ত করে আমাদের মুক্তি এনে দিতে পারে, সেই বিদ্যাই পরাবিদ্য', সেই বিদ্যাই সৎ বিদ্যা। তারই সাহায্যে আমাদের ব্যক্তি ও সমাজের মন পরিচ্ছন্ন আন্তর সৌন্দর্যে ও বাইরের উৎকর্ষে সৌকর্যে সুন্দরভাবে গড়ে উঠতে পারে।

প্লেটোর সেই বিখ্যাত উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেছিলেন—শুধুমাত্র জ্ঞানচর্চার কচকচানিতে কি আন্তর সৌন্দর্য হারিয়ে যায় না? শুধুমাত্র তথ্যের স্তূপীকৃত জঞ্জালের ভেতর সত্যিকারের জ্ঞান কোথায়? তাই, পরিচ্ছন্ন জ্ঞান ও স্বচ্ছ দৃষ্টি আহরণের জন্য আমাদের অবগাহণ করতে হবে জীবন রহস্যের গভীরতম প্রদেশে। মনে রাখতে হয়, শিক্ষা কোনো নতুন নীতির জন্ম দেয় না, প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা দর্শনেরই প্রাথমিক নীতি, যাকে ইংরেজিতে বলা হয় 'ফার্স্ট প্রিন্সিপলস্'। সেই নীতির ভেতরেই জন্ম নেয় সকল নীতি। মানুষের মনের মধ্যেই নিহিত আছে এক সত্য ইতিহাস। প্রকৃতপক্ষে মানুষের সামগ্রিক সত্তাকে গতিমুখী করে তোলার যে দিক্‌দিগন্ত প্লেটোর দর্শনে দেখতে পাওয়া যায়, কালের বিবর্তনে নানা সামাজিক বৈষম্য ও অবিচারের ফলে ব্যক্তি

প্রতিভা সামাজিক সত্তায় রূপান্তরিত হওয়ার পথে বাধার সম্মুখীন হয়েছে, এইটে দেখা যায় ঐতিহাসিক সত্য হিসেবে। সেইজন্য প্রয়োজন এমন এক গতিশীল সামাজিক-অর্থ নৈতিক-রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ যা সমাজের ভেতরেই সৃষ্টি করবে ব্যক্তি ও সমাজ সত্তার স্ফুরণের সহায়ক অনুকূল বাতাবরণ।

সমাজব্যবস্থাকে সমাজতান্ত্রিক নীতির পথে সজ্ঞান ও সক্রিয় প্রচেষ্টায় গতিশীল ও বাস্তবানুগ করে তোলার কাজে শিক্ষার একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা আছে। ব্যক্তির আন্তর সৌন্দর্য বা সুকুমার বৃত্তির বিকাশ সাধনের ভেতর দিয়ে তাকে সামাজিক সত্তায় রূপান্তর সাধনের কাজে এমনভাবে অগ্রসর হতে হবে যার ফলে ব্যক্তি ও সমাজ গড়ে উঠবে কল্যাণমুখী শক্তিতে। আন্তর সৌন্দর্য গড়ে তোলার জন্য চাই সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত।

শিক্ষার সংজ্ঞা প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের একটি মহান বাণী আমাদের মনে পড়ে। তিনি বলেছিলেন, জ্ঞান মানুষের অন্তরেই নিহিত আছে, সে জ্ঞান বাইরের থেকে আসে না। ভিতরেই জ্ঞানের অবস্থিতি। পৃথিবীতে যতো রকমের জ্ঞান আছে তা মানুষের মনের রাজ্যেই অফুরন্ত পাঠাগার হয়ে সুপ্ত হয়ে আছে। বিশ্বরহস্যের এই চাবিকাটি মানুষের মন খুলে দিতে পারে কেবলমাত্র আত্মচক্ষু বা দিব্যদৃষ্টি লাভের দ্বারা। প্লেটো যাকে বলেছেন অন্তশ্চক্ষু বা 'ইনওয়ার্ড আই', ভারতীয় সংস্কৃতিতে তারই নাম 'তৃতীয় চক্ষু'।

শিক্ষাক্ষেত্রে শুধু বুদ্ধির প্রাবল্য নয়, চাই ইনটিউশন বা বোধের তপস্যা। একদল মগজওয়ালা যুক্তিবাদী তাত্ত্বিক পৃথিবী থেকে বোধ বা অনুভূতির শেষ ছোঁয়াচটুকুকে অস্পৃশ্য মনে করে মানবজাতির নিদারুণ ক্ষতি করে চলেছেন। বুদ্ধির নানা কচকচানি ও কসরত থেকে আসছে অসম্ভব রকমের অযৌক্তিক কার্যকলাপ এবং সামাজিক পার্ভাশন।

বস্তুর গুরুত্ব কেউ অস্বীকার করে না, সেই সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মন ও তার সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলিকেও দিতে হবে মর্যাদার আসন। বিজ্ঞান দিয়েই বোঝা যায়, পরমাণুর অস্তিত্ব ছড়িয়ে আছে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে—সেই পরমাণুর অস্তিত্ব সনাক্ত করতে পারে একমাত্র মানুষের মন। সেই শক্তিকে মানবকল্যাণে কাজে লাগাবার ক্ষমতা আছে মানুষেরই। যে মন বা বুদ্ধি পরমাণু বোমা তৈরি করে, সেই মনের ক্ষমতা নিঃসন্দেহে পরমাণু বোমার চেয়েও শক্তিশালী। আমাদের মন সর্বদা সচেতন নয় অথচ অবচেতন মন সতত ক্রিয়াশীল। আমাদের শুভবুদ্ধি

ও প্রেরণা যদি সেই অফুরন্ত শক্তি ও যুক্তিকে মানবকল্যাণের শুভ নির্দেশে নিয়োজিত করে সজ্ঞান প্রচেষ্টায়, তাহলে পৃথিবীর বুক থেকে অশান্তির রণদামামা দূরীভূত হতে পারে, দূর হতে পারে সামাজিক বৈষম্য, অনাচার ও অবিচার। সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের আদর্শ নিয়ে পৃথিবীকে রূপান্তরিত করা যায় 'ভগবানের সাম্রাজ্যে বা স্বর্গে', পশুত্ব থেকে প্রকৃত মনুষ্যত্ববোধের প্রতিষ্ঠায়। মানুষের শুভবুদ্ধিকে তার মনের অভ্যন্তরে নিহিত অফুরন্ত শক্তির সঙ্গে পরিপূর্ণ সম্বন্ধের মেল বন্ধনে সুপ্রতিষ্ঠিত কবতে হবে।

পৃথিবীর মানুষের মনে এই আত্মবিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব যে অশিক্ষা, কুশিক্ষা, দারিদ্র্য, বুভুক্ষা, শোষণ, শাসন, অপশাসন, জাতপাত বৈষম্য, কালোবাজারী দাপট, পুঁজিবাদী অনাচার ইত্যাদি সবকিছু অশুভ শক্তিকে মানুষ পৃথিবী থেকে একেবারেই লোপাট করে দিতে পারে। শুভশক্তি ও অশুভ শক্তির দোটানায় পৃথিবীতে চলেছে অনবরত এক দ্বান্দ্বিক আকর্ষণ বিকর্ষণ। শিক্ষাদর্শনকে বিজ্ঞানের ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করতে হবে শুভ শক্তিরই কল্যাণ নির্দেশ। সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মূল্যায়ন চাই নিরন্তর। ব্যক্তি সমাজ সত্তারই পরিপূর্ণ অংশ। ব্যক্তির প্রেরণার উৎসস্থল হবে সামাজিক অবস্থার দিগন্তবিস্তারী উদার পরিবর্তনের অনুগামী। প্লেটো ও স্বামী বিবেকানন্দ যা বলেছিলেন তার ভেতরের সত্যতাকে গ্রহণ করে নিতে হবে। নতুন পরিপ্রেক্ষিতে বিচার বিবেচনা করে শিক্ষার নীতিকে যুগের প্রকৃত দাবীর সঙ্গে সংযুক্ত করে নিতে হবে।

মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষা-দর্শনে আমরা দেখতে পাই মানুষের পরিপূর্ণ সত্তাব বিকাশ সাধনের কথা। শিক্ষা অর্থে তিনি বুঝেছিলেন মানুষের শরীর, মন ও আত্মার সামঞ্জস্যপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ বিকাশ। শরীর, মন ও আত্মার পাবস্পরিক 'ইনটিগ্রেশন' বা অনুবন্ধ স্থাপনের ভেতর দিয়েই মানুষ প্রকৃত সংস্কৃতিবান ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পারে। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাথমিক ইউনিট বা একক তাঁর কাছে ্যাক্তি-মানুষ। সমাজের একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে তিনি চেয়েছিলেন ্যাক্তির ব্যক্তিত্ব সংগঠনকে সকলের আগে। সামাজিক অবস্থা এমন সৃষ্টি করতে বে যার ফলে ব্যক্তি তার পরিপূর্ণ সামাজিক সত্তার বিকাশ সাধনে পাবে র্বপ্রকার-অনুকূল সাহায্য। ব্যক্তি সমাজ চেতনার অপরিহার্য উপাদান হিসেবে নজেকে সামাজিক সত্তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিলিয়ে নিয়ে সামাজিক

ব্যক্তিত্বের অধিকারী হবে ; এই রকম ধারণা পোষণ করেছিলেন মহাত্মা গান্ধী। তাঁর শিক্ষা-চিন্তার মূল বক্তব্যের মধ্যে সার্বজনীন সত্যতা অবশ্যই আছে। ব্যক্তি পরিপ্রেক্ষিত অথবা সমাজ পরিপ্রেক্ষিত কোন্‌টা বেশি গুরুত্ব পাবে বা কার দাবী সকলের উপরে—এই প্রশ্নের তাত্ত্বিক সমাধানের জন্য সার্বজনীন সততার দিকেই আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে, এইটেই যুগ ও সার্বজনীনতার দাবী।

ঋষি অরবিন্দ শিক্ষার তাৎপয বিশ্লেষণ করে বলতে চেয়েছিলেন যে, শিক্ষা ব্যাপারটি এমন-ই জিনিস যে প্রকৃত অর্থে শিক্ষার্থীকে কিছুই 'শিক্ষা' দেওয়া যায় না বরং শিক্ষার্থী নিজেই শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। ব্যক্তি স্বাধীনতার নীতিতে বিশ্বাস পোষণ করে তিনি যুক্তির সঙ্গে দেখিয়েছিলেন যে, শিক্ষার আয়োজন উপকরণ প্রকরণ এমনভাবে সাজিয়ে দিতে হবে যার ভেতর থেকে শিক্ষার্থী তার নিজস্ব ক্ষমতা ও দক্ষতা অনুযায়ী জ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদানকে নিজেই নির্বাচিত করে শিক্ষা গ্রহণ করে নিতে পারে। শিক্ষার্থী যেন এক নিপুণ গবেষক—অনবরত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে, নানারকম জিজ্ঞাসা ও কৌতূহলের মধ্য দিয়ে আত্মশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠবে শিক্ষার্থী, তার নিজস্ব রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী একধরনের নিজস্ব গরজে। পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদ্ রুশোর মধ্যেও আমরা ঋষি অরবিন্দ ও স্বামী বিবেকানন্দের মতো শিক্ষানীতির আভাস পাই। পাশ্চাত্যের অনেক শিক্ষা মনীষী শিক্ষার্থীকে শিক্ষকের আড়ালে রেখে শিক্ষককে পথ নির্দেশকের ভূমিকা পালনের জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁদের মতে, শিশুর আত্মশক্তি ও আত্মবিশ্বাস এবং স্বাধীন স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজের প্রেরণা দেবেন শিক্ষক। শিক্ষার্থীর ত্রুটিবিচ্যুতি সংশোধনের ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা হবে বন্ধু, দার্শনিক ও পথ নির্দেশকের মতো। নতুন নতুন কর্মসূচীর দিকে শিক্ষার্থীকে নিয়োজিত করে আড়ালে থেকে এমন পথ প্রদর্শকের ভূমিকা নেবেন শিক্ষক, যেন সমস্ত শিক্ষার পরিবেশটাই গড়ে উঠবে একটা অনুসন্ধিৎসা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার গবেষণাগার হিসেবে।

প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি এইখানে যে, পুস্তক-কেন্দ্রিক শিক্ষার উপর সেখানে অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় আর তার উদ্দেশ্য মানুষ গঠন করা নয়, যেন-তেন প্রকারেণ চাকরী জোগাড়ের একটা পাশপোর্ট সংগ্রহ করা। এইজন্য দায়ী আমাদের সমাজব্যবস্থা ও শিক্ষাব্যবস্থা। এর প্রতিকারের জন্য চাই সমগ্র সমাজ ব্যবস্থারই পুনর্বিন্যাস, একটা মৌলিক রূপান্তর সাধন। তবে সে কাজ

সহজ ব্যাপার নয়। তাই, সমাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক রীতিতে সমাজের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক শক্তির যথাযথ সমাবেশ ও পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে বাস্তবানুগ কর্মসূচীর মাধ্যমে এবং ধীরে ধীরে সমগ্র শিক্ষা পরিমণ্ডলকেই এক কর্মযজ্ঞের গবেষণাগার করে গড়ে তুলতে হবে।[১০]

প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা সারাজীবন ধরেই চলে। বুনিয়াদ যার যেমন গড়ে উঠে, সেইভাবে তার ক্রম পরিণতিও হয়। শিক্ষার কাজ হবে ক্রমিক পরিণতিকে গতিশীল করে তোলা। শিক্ষার্থীর চাহিদা পূরণ করতে হবে। শিক্ষার্থীর এই গতিময় প্রাণোচ্ছল বিকাশ সাধনের কোনো ছেদ নেই, বিরাম নেই। শিক্ষা তাকে দেবে জীবনবোধ। সমাজনৈতিক-রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক চেতনা। তাকে শুধু জীবনধারণের কতকগুলি কলাকৌশল বা ঘোরপ্যাঁচ শিখিয়ে দিলেই

---

১০। পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদ্ পেস্টালজীর শিক্ষাসংক্রান্ত সংস্কার কথা স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেছিলেন, শিক্ষার অপর নাম বিকাশ। এই বিকাশ মানে মানুষের শারীরিক, বুদ্ধিগত, নৈতিক ও কর্মবৃত্তির সর্বতোমুখী প্রকাশ। তিনি চেয়েছিলেন মানুষের এই শক্তিগুলির একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ বা সঙ্গতিপূর্ণ পরিণতি। শিক্ষার পরিকল্পনা এমন বাস্তব অভিমুখীন হবে যার ফলে শিক্ষার্থীর শারীরিক চাহিদা, মনের স্ফুরন, শক্তির উন্মোচন, সামর্থ্যের যোগ্যতা, নৈতিক ও আত্মশক্তির বিকাশ সুষ্ঠুভাবে সুবিন্যস্তভাবে গড়ে উঠতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, শিক্ষার্থীর মধ্যে অনন্ত শক্তি লুকিয়ে আছে। তার ভেতর আছে অফুরন্ত জীবন প্রবাহ। সেই শক্তি ও ক্ষমতা অনুকূল পরিবেশ পেলে তা ফুলে ফলে পল্লবিত হয়ে উঠতে পারে। আর যদি সুযোগ না পায়, প্রতি পদে পদে পায় নানা বাধাবিপত্তি, তাহলে আভ্যন্তরীন শক্তি যতই থাকুক না কেন, সেই শক্তি অচিরেই অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে এবং শিক্ষার্থী অবদমিত হয়ে শক্তিহীণ এমন কি বিপথগামী হয়ে যেতে পারে যা সমাজের পক্ষে জাতির পক্ষে নিদারুণ অপচয় এবং ক্ষতি ছাড়া আর কিছু নয়। শিক্ষার্থীর বিকাশ একটা ক্রমিক পর্যায় অনুসরণ করেই হয়ে থাকে। রাতারাতি কেউ পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয়ে উঠে না। ক্রমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীর শরীর, মন ও নৈতিক শক্তির উন্নতি হয়। সুযোগ-সুবিধা পেলে, অনুকূল বাতাবরণ পেলে, সে নানাগুণের অধিকারী হয়ে প্রোজ্জ্বল ব্যক্তিত্বে ও মনুষ্যত্বের গৌরবে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে। যতোই সে বড়ো হয়, ততোই বাড়তে থাকে তার অভিজ্ঞতার পরিমণ্ডল। অভিজ্ঞতার জগৎ প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে একটা রূপান্তর ঘটতে থাকে। অভিজ্ঞতার ফসলকে সে মনের মণিকোঠায় সম্পদ হিসেবে সঞ্চয় করে নেয়। পৃথিবীর সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে, দেশের সঙ্গে, পাঠ্য বিষয়ের সঙ্গে, অভিজ্ঞতার সঙ্গে, পরীক্ষা-নিরীক্ষার গ্রহণ-বর্জন নীতির মাধ্যমে সে তার অভিজ্ঞতার পরিমণ্ডলকে প্রসারিত করে নিজেকেই এমনভাবে সংহত ও সম্প্রসারিত করার গুণ অর্জন করে যার ফলে সে হয়ে ওঠে নতুন শক্তি ও কর্মক্ষমতার উৎস। শিক্ষার কাজ হবে শিক্ষার্থীর এই ক্রমিক পরিণতির দিকে তাকে অনবরত এগিয়ে যেতে সাহায্য করা।

শিক্ষার কাজ ফুরিয়ে যায় না। জীবনধারণের কলাকৌশলের সঙ্গে তাকে দায়িত্বশীল ও সমাজচেতন হিসেবে গড়ে তুলতে হবে এমনভাবে যার ফলে সে সমাজের সম্পদ সৃষ্টির ও অন্যতম স্রষ্টা হিসেবে নিজেকে আত্মপ্রকাশ করতে পারবে।

জন ডিউই বলেছিলেন—শিক্ষা নিছক জীবন ধারণের প্রস্তুতি নয়। আসলে শিক্ষা জিনিসটা জীবনেরই অভিব্যক্তি। অবশ্য আমাদের দেশের মতো উন্নয়নশীল পটভূমিকায় শিক্ষাকে জীবনভিত্তিক করে তোলার কাজ একটা মস্ত বড়ো কঠিন ব্যাপার। এখানে "জীবনধারণের ভিত্তিভূমি" বা "আশ্রয়স্থলকে" উপেক্ষা করলে চলে না। শিক্ষাকে "জীবিকাভিত্তিক" কাঠামোর উপরও এখানে স্থাপন করতে হবে। তবে সেইটেই শেষ কথা নয়। শিক্ষাকে শেষ পর্যন্ত জীবনভিত্তিক করতে হলে জীবিকাও যেহেতু জীবনযাপনের একটি অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য শর্ত, সেই দিকটি নজর রেখেই জীবনভিত্তিক শিক্ষার অন্যান্য দিকগুলিকেও মর্যাদাপূর্ণ করে তুলতে হবে। জীবনভিত্তিক শিক্ষা জীবিকাভিত্তিক শিক্ষার বিরোধী নয়। জীবনের যতোরকমের চাহিদা আছে তার জন্য প্রস্তুতির ব্যবস্থা করলে শিক্ষা নিতান্ত পেশাদারী বা যান্ত্রিক হয়ে উঠতে পারে না। একটা আনন্দময় পরিবেশের ভেতর দিয়ে জীবন ও জীবিকাভিত্তিক শিক্ষার প্রবর্তন করা যেতে পারে।

আমাদের মনে রাখা দরকার, আমরা যে যুগে বাস করছি তা বিশেষজ্ঞের যুগ। এই যুগে এক একজন এক এক বিষয়ে বিশেষ যোগ্যতা বা পারদর্শিতা নিয়ে জীবনযুদ্ধে এগিয়ে যেতে পারে। তবে মুস্কিল হচ্ছে, পেশাদারী শিক্ষায় শিক্ষিত হতে গিয়ে মানুষ পেশাগত জগতের বাইরে অন্য জিনিস সম্পর্কে মুখ ফিরিয়ে রাখলে সে যান্ত্রিক হতে বাধ্য। একজন ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার বা প্রযুক্তিবিদ যদি দেশের সাধারণ সংস্কৃতি ও নাগরিক জীবনের মৌল আদর্শ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না থাকেন তাহলে তা নিদারুণ দুঃখের কারণ হতে পারে। তাঁরা যদি সেক্সপীয়ার, রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি একটুও না জানেন বা মানুষের শৈল্পিক সৌন্দর্যবোধের কোনো খবর না রাখেন, তাহলে তাঁদের মধ্যে মানবিক ও সাংস্কৃতিক দিক অনুপস্থিত হতে পারে, যা এক ভয়াবহ মানসিক শূন্যতার সামিল। **এই সব কারণে, জীবনভিত্তিক শিক্ষার একটা সার্বজনীন কর্মসূচী সমস্ত স্তরেরই শিক্ষার অপরিহার্য ন্যূনতম শর্ত হওয়ার প্রয়োজন আছে।**

জীবনবোধের শিক্ষার সঙ্গে এক একজনকে এক একটি বিশেষ পারদর্শিতার শিক্ষাও অবশ্য আয়ত্ত করতে হবে। সমাজ অর্থনীতি রাষ্ট্রীয় আদর্শ সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সাধারণ নিয়মগুলি সকলেরই জানা দরকার আছে। বিশেষ পেশাগত বা বিজ্ঞানমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিকে জানতে হবে মানবিক বিষয়ের মৌল উপাদান। তেমনি মানবিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীকেও জানতে হবে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রগতিশীল নিয়মগুলি এবং সেই সঙ্গে যান্ত্রিক কলা-কৌশলেরও সাধারণ নিয়ম। এই ধরনের শিক্ষার সূত্রকে মেনে নিতে হবে অপরিহার্য সত্য হিসেবে।

শিক্ষার লক্ষ্যই তো পরিপূর্ণতা অর্জনেব চেষ্টা করা। পবিপূর্ণতার দিকে ক্রমাগত এগিয়ে যাওয়াই জীবনবোধ। কেননা, পরিপূর্ণতা তো শেষ কথা নয়। ধাপে ধাপে শিক্ষার নানা স্তব ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীকে এগিয়ে যেতে হয় আরো, আরো কিছু "জানার" জন্যে। প্রকৃতপক্ষে মানুষের জানার তো শেষ নেই। শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক শক্তিগুলিকে এমনভাবে সুনিয়ন্ত্রিত ও সংগঠিত কবে তুলতে হবে যার সাহায্যে সে নিজেকে অনেক বেশি যোগ্যতাশালী ও শক্তির অধিকারী করে গড়ে ওঠার প্রস্তুতি নিতে পাবে। এই আদর্শেরই রকমফেব কথা শিক্ষাবিদ্‌দের চিন্তাধারার মর্মকথা। রেমণ্ট, হর্ণী, জন ডিউই, স্পেনসার, পেষ্টালজী, মহাত্মা গান্ধী, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীশ্রীঅরবিন্দ, রাধাকৃষ্ণণ প্রভৃতি দেশ-বিদেশেব শিক্ষানায়কেরা মোটামুটি এইভাবেই শিক্ষার নীতি নির্দেশ করেছেন, যার ভেতর একটা গভীর ঐক্যবোধ খুঁজে পাওয়া যায়।

রেমণ্ট একজন শিক্ষানায়ক না হলেও শিক্ষাদর্শনের বিশেষজ্ঞ হিসেবে অবশ্যই চিহ্নিত। তিনি বলেছিলেন, শিক্ষা মানেই একটা পরিণতির দিকে অবিরত বিকাশের প্রচেষ্টা—শৈশব থেকে বয়স্ক পর্যায় পর্যন্ত এক গতিশীল ছেদহীন প্রস্তুতি চলে এর মধ্যে—শিক্ষার্থীর দৈহিক সত্তা, সামাজিক সত্তা ও নৈতিক বা আধ্যাত্মিক সত্তা সবকিছুই এই ক্রমাগত ধারায় গড়ে ওঠে। আমেরিকান শিক্ষাবিদ্‌ হর্ণী, যিনি জন ডিউইয়ের শিক্ষানীতির একজন তাত্বিক ব্যাখ্যাতা হিসেবে স্বীকৃত, বলেছিলেন, শিক্ষা আসলে শিক্ষার্থীকে একটা উপযোজনা শক্তি বা খাপ খাইয়ে

নেবার শক্তি জোগায়। সেই উপযোজনা শক্তি সংগ্রহের ফলে শিক্ষার্থী নিজেকে বুদ্ধির দিক দিয়ে, ভাবের দিক দিয়ে, অনুভূতির দিক দিয়ে, কাজের মধ্য দিয়ে সুসংগঠিত নাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে পারে। যতই তার শারীরিক, মানসিক দিক দিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন হয়, ততই সে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে এবং তার উপযোজনা শক্তিও ক্রমশ বাড়তে থাকে। যতই সে সচেতন হয়ে ওঠে, ততই সে বুদ্ধিগতভাবে, ভাগবতভাবে অনুভূতির দিক দিয়ে পরিবেশের একজন স্রষ্টা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে।

জন ডিউইর মতে, শিক্ষার তাৎপর্য নিহিত আছে ব্যক্তিত্ব বিকাশের অপরিহার্য নীতির মধ্যে। তিনি দেখিয়েছেন, শিক্ষার্থী তার জীবনে বিচিত্র অভিজ্ঞতা আহরণ করে এগিয়ে যায় পরিপূর্ণতার দিকেই। এই ধারা কখনো বাইরের দিক থেকে শিক্ষার্থীর উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার ব্যাপার নয়। এ ধারা অবশ্যই ক্রমবিবর্ত অনুসারী, স্বচ্ছ এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বাভাবিক। শিক্ষার্থী নিজেকে নানা শারীরিক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে খাপ খাইয়ে নিয়ে এগিয়ে যেতে পারে পরিপূর্ণতার দিকেই। এক্ষেত্রে ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্ব সংগঠনের মধ্য দিয়ে কতকগুলি অপরিহার্য সামাজিক ও ব্যক্তিগত গুণাবলী অর্জন করে নেয়। নিজেকে সে সমাজের নানা অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে সক্ষম হয়। যে শক্তির দ্বারা শিক্ষার্থী এই ধরনেব ক্ষমতা অর্জন করতে পারে তার নামই শিক্ষা। এই শিক্ষার ধারা চলে সারা জীবনব্যাপী সাধনার মতো। এই ধারা ছেদহীন অথচ স্পন্দিত ও গতিশীল। এই ধারা অব্যাহত রাখার জন্যে শিক্ষার্থীর সামনে তুলে ধরতে হবে শিক্ষার বহুবিচিত্র রকমের উপাদান। বহু বিচিত্র বিষয়ের অভিজ্ঞতা আহরণ করে সে যেন সমৃদ্ধ হতে পারে, অভিজ্ঞ হতে পারে। জীবন রহস্যের এমন কোনো দিক থাকবে না যা সে জানবে না। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে আহরণ করা সেই সব উপাদান তাকে এমন এক মানসিক বাঁধুনি এনেদেবে যার ফলে সে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরাপদ ও সুখী হতে পারবে। জীবনবোধের অনুপ্রেরণায় সে এই দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করে নেবে শিক্ষার মধ্য দিয়েই।

॥ ৩ ॥

## শিক্ষার তাৎপর্য

শিক্ষার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে স্যার জন অ্যাডামস্ দেখিয়েছেন, শিক্ষা ব্যাপারটি আসলে একটি দ্বিমুখী সক্রিয় পদ্ধতি, বা 'বাই-পোলার প্রসেস্'।

তাঁর মতে শিক্ষা জিনিসটা তো সজ্ঞান একটা পদ্ধতি এবং সেই সঙ্গে ইচ্ছাকৃতভাবে এক পরিকল্পিত ব্যাপার। এর অর্থ হলো, শিক্ষার পরিকল্পনা যাঁরা করবেন তাঁদের অনুপ্রাণিত হতে হবে সামাজিক-অর্থ নৈতিক-রাজনৈতিক আদর্শের দ্বারা পরিচালিত সুনির্দিষ্ট ও সুবিন্যস্ত পরিকল্পনার সাহায্য নিয়ে সচেতনভাবে। তাঁদের দেখতে হবে কিভাবে শিক্ষার্থীর জীবনবোধ জাগ্রত করা যায়, তার জীবন ও জীবিকার আশ্রয়স্থলকে নিশ্চিত ও নিরাপদভাবে গড়ে তোলা যায়। শিক্ষার্থীকে সুস্থ, সবল ও আদর্শ সামাজিক ও নাগরিক গড়ে তোলাব জন্যেই চাই শিক্ষাবিদদের দুবদৃষ্টি ও পবিকল্পনা রূপায়ণের বাস্তববুদ্ধি।

অ্যাডামস্ দেখিয়েছেন, শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের উপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব আসে শিক্ষকের কাছ থেকে। শিক্ষকই তার চোখে তৎক্ষণাৎ পরিবেশ। প্রচলিত শিক্ষা কাঠামোয় দেখা গেছে, শিক্ষক যদি আদর্শচ্যুত হয়ে যান, তাহলে শিক্ষার্থীদের উপর তার প্রভাব মন্দ হতে বাধ্য। এইজন্য শিক্ষকের নিজের মধ্যে অসংখ্য গুণাবলীর সমাবেশ অবশ্যই প্রয়োজন।

এ ছাড়াও, শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের উপর এনে দিতে হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আদর্শের প্রভাব, দেশ-জাতি-বিশ্বজনীনতার সর্বাধুনিক মূল্যবোধেব অনিবার্য প্রভাব, এককথায় শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির সার্বিক প্রভাব।

ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মধ্যে যে মহামূল্য সত্য নিহিত আছে, সেই সত্যকে সমাজজীবনের গতিশীল প্রবাহে কালোপযোগী করে রক্ষা করতে হবে এবং সেই সঙ্গে আনন্দজনক উপাদান হিসেবে প্রগতিশীল দুনিয়ার সামাজিক পরিবর্তনের ধারাকে গভীরভাবে মর্মস্পর্শী ও জীবন্ত করে তুলতে হবে এমন মূল্যবোধের আশ্রয়ে যার ভেতর শুভ কল্যাণকর শক্তিটিকে চিনে নিতে কোনো অসুবিধে না হয়।

বর্তমান যুগে শুধুমাত্র শিক্ষকের ব্যক্তিত্বই একমাত্র কার্যকরী উপাদান নয়। সমকালীন সমাজের গতিশীল সামাজিক-অর্থ নৈতিক-

রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক চেতনার ধারা থেকে শিক্ষার্থীরা কখনো মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারে না।

তাই, এযুগে শিক্ষকের কাজও খুবই দায়িত্বশীল ও জটিল হয়ে গেছে। তাঁকে শিক্ষার্থীর মনে প্রগতিশীল ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ও জীবনবোধের আদর্শের প্রভাব সঞ্চারিত করার কাজে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। তাঁকে মনে রাখতে হবে তিনি কি ধরনের সামাজিক অবস্থার মধ্যে কাজ করছেন এবং কি ধরনের সামাজিক রূপান্তর তাঁর কাম্য। প্রাচীনকালে শিক্ষাগুরুর কাজ ছিল শিক্ষার্থীর মনে একটা ব্যক্তিত্ব ও নীতি সংগঠনের চমৎকার শক্তি সংগ্রহে সাহায্য করা। কিন্তু বর্তমান যুগের শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গি আরো ব্যাপক ও প্রসারিত হতে বাধ্য। তিনি দেখবেন কিভাবে সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শের মর্মবাণীতে সমাজতান্ত্রিক পট পরিবর্তনের জন্য শিক্ষার্থীর মধ্যে, মূল্যবোধ সঞ্চালিত করা যায়। এই কাজে তিনি অবশ্যই হবেন একজন সমমর্মী বন্ধু, দার্শনিক ও পথ দ্রষ্টা। বহুমুখী বিচিত্র জীবনবোধের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে তাঁকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে শিক্ষার্থীদের। শিক্ষক নিজেই হবেন একজন শিক্ষাগত কর্মী। একেবারে আপনজনের মতো শিক্ষার্থীদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মহৎ গুণাবলী সংক্রমণের কাজে তিনি অগ্রণী ভূমিকা নেবেন। এই প্রক্রিয়ায় পারস্পরিক লাভ শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েরই। এই পদ্ধতিতে শিক্ষক শিক্ষার্থীর বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতা থেকে উপাদান গ্রহণ করে নিজেকে আরো প্রস্তুত ও কর্মক্ষম করে তুলবেন। শিক্ষার্থীও শিক্ষকের অফুরন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনা পেয়ে বহুসমৃদ্ধ উপাদান আহরণে আরো সচেতন ও সতর্ক হয়ে উঠতে পারবে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর দেয়া-নেয়া সহযোগিতা ও সাহচর্য অনেক বেশি ফলপ্রসূ।

মনঃ সমীক্ষক ফ্রয়েড বিজ্ঞান সম্মত বিশ্লেষণের মাধ্যমে নীতি নির্দেশ করেছিলেন যে, শিক্ষার্থীদের ভেতর একটা 'আত্মসর্বস্ব' 'অহংবোধ' কাজ করে। তারা শিক্ষকের ভেতর নিজেকে সংস্থাপিত করে উচ্চ অহংবোধের প্রতিস্ফূর্তি খুঁজে পেতে চায়। এইভাবে ইগো বা অহং, উচ্চ অহং বোধ বা সুপার ইগোর মধ্যে নিজের পরিতৃপ্ততা বা প্রোজেকশন খুঁজে পায়। আত্মসর্বস্ব বিভেদ ও বৈষম্য ভরা সমাজে মানুষের মন যেখানে বিকলনে ভরা, সেখানে এই ধরনের অবস্থার তাৎপর্য বুঝতে পারা যায়। কিন্তু গণতান্ত্রিক-সমাজতান্ত্রিক সমাজ অর্জন করা যেখানে আজকের যুগের প্রকৃতপক্ষে মানুষের আশা-

আকাঙ্খার, প্রতীক সেখানে শিক্ষার কাজ হবে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে পরস্পর সহযোগী বন্ধুত্বের— একে অপরের চেয়ে প্রধান এই ভাবটুকু সেখানে একধরনের হীনমন্যতা বা উচ্চমন্যতা সৃষ্টি করতে পারে। সেইজন্য শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে কাম্য হওয়া উচিত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর পারস্পরিক বন্ধুত্বপূর্ণ সহজ ও স্বাভাবিক সম্পর্ক। এখানে একে অন্যকে দেবে প্রেরণা ও অভিজ্ঞতার সাহায্য। কর্মে ও ভাবাদর্শে উভয়েই হবে মানব সভ্যতা সংগঠনের নিরলস কর্মী ও ভাগীদার।[১১]

১১। শিক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য শিক্ষার্থীর বহুমুখীন শক্তি ও প্রবণতার স্ফুরণে সাহায্য করা। বহুমুখী প্রবণতার বিকাশ সাধনে যদি উপযুক্ত শিক্ষা পরিকল্পনার মাধ্যমে কর্মসূচী গ্রহণ করা যায়, তাহলে ব্যক্তি-শিক্ষার্থী সমাজের যোগ্য নাগরিক হিসেবে অসংখ্য গুণের সমন্বয়ে গড়ে উঠতে পারে। শিক্ষার বিষয়বস্তু এমন ভাবে নির্বাচন করতে হবে শিক্ষার কাঠামোকে সুবিন্যস্ত রূপ দিয়ে, যার ফলে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক সত্তার প্রকৃত পক্ষে বিচ্ছুরণ সম্ভব হয়। যুগের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে বলা যায়, একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আবশ্যিকভাবে নিম্নলিখিত বিষয়বস্তু জানার দরকার আছে:—

ক. শরীরচর্চা নানাধরনের খেলাধুলা ও আমোদ-প্রমোদের ভেতর দিয়ে বিদ্যালয়ের কর্মসূচীতে শরীরচর্চার একটি আবশ্যিক ধারা বজায় রাখতে হবে।

খ. জ্ঞানের মৌলিক সূত্র—জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগৎ এখন বহুবিস্তৃত ও প্রসারিত হয়ে গেছে। জগৎ ও জীবনের চাহিদার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে চলতে গেলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধারণ মৌলিক নিয়মগুলি সম্পর্কেও উদাসীন থাকলে চলে না। এইজন্য শিক্ষার্থীকে জানতে হবে নিজ দেশের সংস্কৃতির উপযোগী মাতৃভাষা, দেশ ও জাতি তথা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্যবহারের উপযোগী কার্যকরী ভাষাজ্ঞান এবং তার সহজ ও সার্থক প্রয়োগ। জীবন ধারণের উপযোগী খুব সাধারণ ধরনের অঙ্কের ব্যবহারিক জ্ঞান, বিজ্ঞানের মূলসূত্র ও তার ব্যবহার সম্পর্কে কিছু দক্ষতা।

গ. নাগরিকত্বের শিক্ষা—এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীর পক্ষে জানা উচিত দেশ ও জাতির সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শকে বিশ্বের পটভূমিকায়। সারা বিশ্বে যাতে বৈষম্যহীন শান্তিপূর্ণ সামাজিক-গণতান্ত্রিক ভাবাদর্শের জয় সম্ভব হয় সেই মতো মানসিক সম্পদ আহরণ করতে হবে শিক্ষার্থীকে। এই ধরনের মানসিকতা বিদ্যালয় থেকেই যদি গড়ে ওঠে, তাহলে ভবিষ্যতের নাগরিকরা রাষ্ট্রপ্রধান হলেও স্বেচ্ছাচারী হবেন না বরং চাইবেন কিভাবে মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিপূর্ণ ঐক্য আসে এবং মানবসভ্যতা কিভাবে আরো উত্তরোত্তর কল্যাণবৃদ্ধির প্রেরণায় সমুন্নত হতে পারে। বর্তমান যুগের নাগরিকত্বের শিক্ষা দেশ, জাতি ও বিশ্ববোধের শ্রেষ্ঠতম অভিব্যক্তিরই প্রকাশ হবে।

ঘ. বৃত্তিগত শিক্ষা—শিক্ষার্থীকে জানতে হবে একটি অন্তত বৃত্তিগত শিক্ষা সম্পর্কে বাস্তব ধারণা। বৃহত্তর জীবনের পথে বৃত্তিগত শিক্ষার গুরুত্ব অপরিহার্য। শিক্ষাজীবনের শেষে শিক্ষার্থী যাতে করে নিজেকে কোনো জীবনধারণের কর্মে নিযুক্ত করতে পারে তার প্রাথমিক বুনিয়াদ গড়ে তুলতে হবে শিক্ষার পর্যায়ে। নতুবা শুধুমাত্র পুঁথিগত শিক্ষার দ্বারা কোনো লাভ হবে না। জীবনের সঙ্গে জীবনের আশ্রয়স্থলটির সুনিশ্চিত গ্যারান্টি চাই।

ঙ. বিশ্রামমুখীন শিক্ষা—অবসর সময়টুকু অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায় নিরানন্দের মধ্য দিয়ে। অথচ এই সময়ের ফাঁকটুকুও কাজে লাগিয়ে যথেষ্ট শিক্ষাপ্রদ ও আকর্ষণীয় করে গড়ে তোলা যায়। শিক্ষা হবে আনন্দময়। পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও খোস মেজাজের অনুকূল নানা বৈচিত্র্যময় আস্বাদ আহরণের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর সময়টুকুকে তার শরীর-মন-আত্মার পক্ষে নতুন নতুন কর্মের উদ্দীপনায় কাজে লাগাতে হবে পরিকল্পিত ভাবে। বিদ্যালয়ে ও বিদ্যালয়ের বাইরে অবসর সময়টুকুও শিক্ষাপ্রদ ও কার্যকরী করে তুলতে হবে।

চ. গৃহস্থালী, ব্যক্তিগত ও সামাজিক পরিচর্যার দায়দায়িত্ববোধ—এই ধরনের কর্মসূচীর মাধ্যমে শিক্ষার্থী নিজের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক এবং পারিপার্শ্বিক সমাজজীবনের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে সমাধানের জন্য হাতে কলমে অর্জন করবে নানারকমের সুনির্বাচিত অভিজ্ঞতা।

ছ. শিক্ষার্থীর নৈতিক চরিত্রগঠন—শিক্ষার্থীকে অবশ্যই এমন কিছু গুণাবলী অর্জন করতে হবে যা তার স্বভাবের পক্ষে একটি স্থায়ী উপাদান হয়। শিক্ষাসূচীর মাধ্যমে তার মধ্যে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে দেশপ্রেমের মহান বীজ। সে যেন সমাজ ও ব্যক্তিকে ভালোবাসতে শেখে, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রাণময় সত্তাকে গ্রহণ করার যোগ্যতা অর্জন করে, বিজ্ঞানের সাহায্যে যুক্তি ও তথ্য দিয়ে নিজেকে আদর্শ ও যোগ্য নাগরিক হিসেবে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনে প্রস্তুত হতে পারে। পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষ বুভুক্ষা, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, যুদ্ধ, দাঙ্গাহাঙ্গামা, পুঁজির দৌরাত্ম্য, জাতপাতের বৈষম্য, সাম্রাজ্যবাদী বিভীষিকা ইত্যাদি নানা ব্যাধিতে আক্রান্ত। এই অবস্থায় শিক্ষার্থীর চরিত্রের নৈতিক কাঠামো হবে এমনি যার ফলে সে নিজেকে কোটি কোটি মানুষের সুখ দুঃখের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত করে সমাজবাদী চেতনায় সঞ্জীবিত হয়ে এগিয়ে যেতে পারে। এই জন্যে তাকে অর্জন করতে হবে চারিত্রিক সততা, অধ্যবসায় বোধ, কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠার আন্তরিকতা, দূরদৃষ্টি, জীবনবোধের চেতনায় সমৃদ্ধশীলতা প্রভৃতি মহা মূল্যবান মানসিক সম্পদ। শিক্ষার স্বার্থকতা নির্ভর করছে কিভাবে এইসব মূলগত চাহিদা পূরণ করা যাচ্ছে তার উপর। মনে রাখা দরকার শিক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য নিহিত আছে এই মূলগত নীতির উপরেই।

## ॥ ৪ ॥

# শিক্ষার মূলগত চাহিদা

শিক্ষার মূলগত চাহিদার প্রসঙ্গ অনিবার্যভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন তাঁদের ১৯৪৯ সালের রিপোর্টে বলেছিলেন একটি স্পষ্ট কথা। বলেছিলেন, যদি আমাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে হয়, সমাজতান্ত্রিক নীতিতে ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্য ঘুচিয়ে সমাজের মধ্যে নীতির একটা ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হয়, তবে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পরিবর্তন।

জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে গেলে প্রয়োজন আমাদের মনন-ভঙ্গীর একটা মূলগত পরিবর্তন। কমিশনের মতে, শিক্ষার উদ্দেশ্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদ্‌দের মতানুসারে একটি বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির সংহত ধারণা এবং জীবন যাপনের একটি সম্পূর্ণতা অর্জন করতে সাহায্য করার আদর্শে হওয়া সমীচীন। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার কিছু হেরফের ঘটিয়ে, রং চং পালিশ পুলটিশ লাগিয়ে শিক্ষার যে ধরনের সংস্কারের চেষ্টা হয়ে এসেছে, তার দ্বারা শিক্ষার্থীর তথা শিক্ষার মৌলিক চাহিদা পূরণ করা যায় না।

সারা দেশ জোড়া সার্বিক শিক্ষা পরিকল্পনার এমন এক সংহত অথচ মৌলিক বিন্যাস প্রয়োজন যা রাষ্ট্রীয়-সামাজিক-অর্থনৈতিক কলাকৌশলের দ্বারা প্রভাবিত এক পরিকল্পনারই রূপায়ণ হতে পারে। তা না হলে নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার নামে অথবা বৈচিত্র্য আনার নামে যে ধরনের স্বাধীন উদার তথা শিথিল ঔদাসীন্য প্রকাশ পায়, তা দিয়ে কোনো জাতির মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পায় না, বরং জাতি আরো দুর্বল হয়ে যায়, এইটেই সত্য কথা। অথচ আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মধ্যেও অনেক গতিশীল উপাদান আছে, আমরা তার সঠিক মূল্যায়ন করি না। আমরা আধুনিক যুগে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে বাস করছি। পুরাতন মূল্যবোধের যেগুলি অপ্রয়োজনীয় বা অকেজো সেগুলি জোর করে আঁকড়ে থাকার কোনো যুক্তি নেই। যেগুলি অপরিহার্য নয়, অপদার্থ, অকেজো এবং জড়, বুদ্ধি বিবেচনায় ও সামাজিক দূরদর্শীতায় অপ্রয়োজনীয়, তা খুঁজে বের করে তাকে বাতিল করতে হবে। পুরাতনের গতিশীল উপাদানকে অবশ্যই

মেনে নিতে হবে কিন্তু পুরাতনের প্রতি অযথা মায়ামমতার কোনো মূল্য নেই। বরং নতুন নতুন মূল্যবোধকে সাদরে গ্রহণ করে নিতে হবে। নতুনের স্বপ্নে বিভোর হতে হবে তবে দেখতে হবে নতুনেরও কোন্‌গুলি গ্রহণীয়, কোন্‌গুলি বর্জনীয়। সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের যে সব উপাদানের চিরকালীন আবেদন বা আকর্ষণ আছে তাকে নতুন যুগের দৃষ্টিভঙ্গিতে এবং রাষ্ট্রীয়-সামাজিক-অর্থ নৈতিক আদর্শের পটভূমিকায় নব কলেবরে সজ্জিত করে যেমন গ্রহণ করতে হবে, তেমনি নতুন নতুন যুগ মূল্যবোধের ভেতর কোন্‌গুলি গ্রহণীয়, কোন্‌গুলি বর্জণীয়, তা দেখতে হবে সঠিক বাস্তব সম্মত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে।[১২]

এই দৃষ্টিভঙ্গির পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যায় ইংলণ্ডের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্ এম. এল. জ্যাক্‌স্-এর 'সামগ্রিক শিক্ষা' বা 'টোট্যাল এডুকেশন' গ্রন্থেও। তিনি এই গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে শিক্ষার ভেতর দিয়ে একটি সামগ্রিক, পরিচ্ছন্ন ও নিখুঁত ঐক্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির প্রবর্তনের জন্য শিক্ষার্থীর মনে একটি "সামগ্রিক মনোভাব" বা 'টোট্যাল আউটলুক' গড়ে তোলা প্রয়োজন। এই দৃষ্টিভঙ্গির অপর নাম দেওয়া যেতে পারে সংশ্লেষণাত্মক মনোভাব। অর্থাৎ, শুধু বিশ্লেষণ আর বিচার বিতর্ক নয়, শুধু তথ্যের কচকচানি নয়, শুধু ঐতিহ্য ও বিজ্ঞানের তথ্য রাজির ব্যাখ্যা নয়, শিক্ষার্থীর মধ্যে চাই এক দায়িত্বশীল সুসংহত চেতনা। পটেমকিল যুদ্ধ জাহাজের সেই কাহিনী মনে রেখে প্রত্যেকটি ভগ্নাংশের ক্ষুদ্র অংশের দিকেও তীক্ষ্ণ নজর রেখে একটি সংহত ও সার্বিক লক্ষ্যকে পূরণ করতে হবে নিখুঁত ও পরিচ্ছন্নভাবে। অভিজ্ঞতার দর্পণে শিক্ষার্থী যেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমাজের

১২। এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রেরণায় স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ শিক্ষাব মহান উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেই শিক্ষার্থীর চোখের সম্মুখে একটি ঐক্যপূর্ণ নিখুত ও বিশ্বের সর্বতোমুখী জীবনদর্শনের সার্বিক চিত্র উত্থাপনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা চালিত হলে শিক্ষার্থীর পক্ষে যুগের চাহিদার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে একটি সম্পূর্ণ অথচ অখণ্ড জীবন দর্শনের প্রেরণায় এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন শিক্ষার মূলগত চাহিদার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছিলেন, যদি আমাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে হয়, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির একেবারে আমূল পরিবর্তন করে এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনকে যদি সত্যিকারের গতিশীল ও প্রাণবন্ত করে তুলতে হয়, তাহলে পুরাতন জীর্ণ বিশ্বাস ও সংস্কারের অন্ধ আবর্ত কাটিয়ে নতুন নতুন প্রচেষ্টা, নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্বপ্নে মশগুল হতে হবে। শিক্ষার মৌল তাৎপর্য এইখানেই। দরকার উদার ও স্বচ্ছ জীবনদৃষ্টি। উদার ও নিখুঁত সামগ্রস্যপূর্ণ একটি জীবনধারা অর্জনের মানসিক প্রস্তুতি।

উপযোগী একটি সত্যিকারের মানসিক সম্পদ নিয়ে গড়ে উঠতে পারে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে সমস্ত গুণাবলী সে অর্জন করে জীবনের ক্ষেত্রে বেরিয়ে আসবে, সেই সব গুণাবলী তার মধ্যে এমন সংহত অথচ নিখুঁত আকারে নিজ সত্তার সঙ্গে, একাত্মীভূত হবে যার ফলে সে পরবর্তী জীবনেও সামগ্রিক স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তার চিন্তা ও ধ্যানধারণাকে বাস্তব কার্যধারার মধ্যে নিজেকে আত্মপ্রকাশ করতে পারবে ও সম্প্রসারণ করতে পারবে। তার মধ্যে সুসম্বদ্ধ ও দৃঢ় আত্মশক্তির এমন প্রকাশ ঘটবে যার সাহায্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমাজে দৃষ্টিভঙ্গিব এক নতুন বিপ্লব সংযোজিত হতে পারবে। জ্যাকস্ এই দৃষ্টিভঙ্গির শিক্ষাকেই 'সামগ্রিক শিক্ষা' বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং এই কাজটিকে তিনি সবচেয়ে জরুরী ও পবিত্রতম কর্তব্য হিসেবে নির্দেশ করেছেন। এই নিখুঁত ঐক্যপূর্ণ সংহত মনোভাবটি আসলে সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণেরই একটি পরিপূর্ণ প্রকাশ ও বিকাশ।

শিক্ষার্থীর মধ্যে এনে দিতে হবে প্রজ্ঞার মহিমা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতম বিজ্ঞানেব মূলসূত্র সম্পর্কে ধারণা। এর ফলে সে যে দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করবে তা তাকে এক নতুন গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক পদক্ষেপে সামিল হওয়ার জন্য প্রস্তুত করবে। শুধু শিক্ষার্থী নয়, শিক্ষককেও এই আদর্শের যোগ্য দাবীদার হতে হবে। পূর্ণ সত্য বলে কিছু পৃথিবীতে না থাকতে পারে কিন্তু পূর্ণতার পথে অবিরাম জয়যাত্রাই হবে পূর্ণতাকে অর্জন করার গতিশীল পদক্ষেপের নামান্তর। কোনো অর্ধ-সত্য নয়, সে নতুন হোক আর পুবাতন হোক, সংস্কৃতিগত ঐতিহ্যেরই হোক আর বিজ্ঞানেবই হোক —প্রয়োজন পূর্ণ সত্যের পানে ছুটে যাওয়ার নিরন্তর উদগ্র বাসনা। এ জিনিসটি কোনো বাঁধাধরা ছক বাঁধা বুলির জিনিস নয়। আসলে এ ব্যাপারটি এক গভীর জীবন দর্শনেরই অভিব্যক্তি। শিক্ষককে এই দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বেছে নিতে হবে তাঁর শিক্ষা দর্শন। তাঁর চলার পাথেয়।

উপযুক্ত শিক্ষাদর্শন না থাকলে শিক্ষকের পক্ষে তাঁর সাধনায় জয়যুক্ত হওয়া সম্ভব নয় আদপেই। এই প্রসঙ্গে রীডারের এক অসামান্য উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেছিলেন, শিক্ষাদর্শনের অভাবে অনেক শিক্ষক তাঁর ন্যূনতম কর্তব্যটুকু সম্পাদন করতে পারেন না। শিক্ষককে তাই এমন এক গভীর জীবনদর্শনের অনুপ্রেরণায় উজ্জীবিত হতে হবে যার সাহায্যে তিনি শিক্ষার্থীর বন্ধু, দার্শনিক ও পথনির্দেশক হিসেবে প্রকৃত প্রেরণা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে

পারেন। তাঁর নখদর্পণে থাকবে জ্ঞানভাণ্ডারের অফুরন্ত চাবিকাঠি, অভিজ্ঞতার দিগন্তপ্রসারী পথনির্দেশ। তিনি জাগিয়ে দেবেন মানবকল্যাণমুখী প্রেরণা, বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ, সামাজিক ন্যায়বিচারবোধ, স্বর্গীয় সুষমার নিরাবিল আনন্দের ধারা এবং সৃষ্টিশীল প্রাণময়তা। জীবনের সঙ্গে জীবনের আশ্রয়স্থলটি খোঁজার ভেতর লুকিয়ে আছে শিক্ষার আসল তাৎপর্য। শিক্ষাদর্শনের সার্থকতার মধ্যেই আছে জীবনদর্শনের গভীর পথনির্দেশ। রবীন্দ্র শিক্ষাদর্শনে তো আমরা সেই মহান সত্যটিকেই প্রত্যক্ষ করেছি।

মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম মানুষ বাঁচতে চায়। বাঁচার আকাঙ্খা নিয়ে সে চায় তার নিজের সত্তাকে বজায় রাখতে। জীবনকে টিকিয়ে রাখার অনিবার্য তাগিদ নিয়েই তাকে আহরণ করতে হয় নানা রকমের অভিজ্ঞতার ফসল। অভিজ্ঞতা যতই বাড়ে, ততই সে আরো উন্নত অভিজ্ঞতা অর্জনের দিকে এগিয়ে যায়। তিক্ত বা অকেজো অভিজ্ঞতাকে বরবাদ করে সে আরো নতুন নতুন অভিজ্ঞতার পথে পা বাড়ায়। দুঃখের সমুদ্র পার হয়ে সে চায় অমৃতের সন্ধান। এমনি করে পুরানো অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নিয়ে সে নতুনতরো বিচিত্রতর অভিজ্ঞতা অর্জনের পথে পাড়ি জমায়। এইভাবে তার অভিজ্ঞতা অর্জনের শিক্ষা আরো সক্রিয় ও সজীব হয়ে ওঠে। ফলপ্রসূ পুরাতন অভিজ্ঞতাকে সে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। নতুনতরো বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে সে সমৃদ্ধ করে তুলতে চায়। এইভাবেই সারা জীবনব্যাপী চলে জীবনের রস সন্ধানের সাধনা। এইভাবেই মানুষের জীবন একটা আত্ম-নিরিখের দর্পণ হয়ে ওঠে। এইভাবেই নিত্য নব নব রূপে এগিয়ে চলে আত্মনবীকরণের কাজ। খাদ্য যেমন মানুষের সজীব ও সুস্থ থাকার জন্যে অত্যাবশ্যক, তেমনি মানুষের অভিজ্ঞতা অর্জনও মানুষের এক অপরিহার্য প্রাণীন শর্ত। সমাজের মধ্যে প্রতিনিয়ত সংযোগ সাধন করে অভিজ্ঞতা আহরণের মধ্য দিয়ে মানুষ চায় তার আত্মনিরিখের মূল্যায়ন। সমাজ-জীবনের সঙ্গে মানুষের অভিজ্ঞতার সংযোগ সাধন চলে এইভাবে শিক্ষা পদ্ধতির মধ্য দিয়ে। ব্যক্তি মানুষের অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে সমাজের সমষ্টিগত অভিজ্ঞতা শেষ পর্যন্ত সর্বশ্রেণীর মানুষের সাধারণ সম্পত্তি হয়ে দাঁড়ায়। এইভাবে যুগে যুগে মানুষ তার সভ্যতা ও কৃষ্টির সম্পদ গড়ে তুলেছে।

এই সভ্যতা ও কৃষ্টির সম্পদকে সর্বসাধারণের কল্যাণে কাজে লাগাবার তাগিদে মানুষ গড়ে তুলেছে নানা প্রতিষ্ঠান ও নানা রকমের অনুষ্ঠান। সংগঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে উঠেছে এইভাবে। পার্সিনান মানুষের এই মনোভাবকেই আখ্যায়িত করেছেন 'নিমি' অভিধায়। তিনি দেখিয়েছেন, প্রত্যেক মানুষই সভ্যতা ও কৃষ্টির ধারার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে নিয়ে জীবনের আশা-আকাঙ্খা পূরণ করতে চায়। আবার ব্যক্তিত্ব সংগঠনের মধ্য দিয়ে সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে এইভাবে সে জীবনের অনিবার্য প্রয়োজনের তাগিদে নিত্য নতুন নতুন সম্পদ গড়ে তোলে। এই ধরনের শক্তিকে পার্সিনান আখ্যা দিয়েছেন 'হর্মি' বা জীবন প্রেষণা। জীবন প্রেষণা আসলে জীবন প্রেরণার উৎস এক ধরনের আদিম শক্তি। এর মূলমন্ত্র জীবনের গতিশীলতা।

পার্সিনানের এই চিন্তাসূত্র থেকে আরো জানা যায়, মানুষের ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠে সামাজিক পরিবেশের মধ্যেই। সামাজিক পরিবেশের মাধ্যমে ব্যক্তি তার নিজের আকাঙ্খা চরিতার্থ করার সুযোগ পেতে পারে। সমাজের সঙ্গতিপূর্ণ এবং ঐক্যপূর্ণ কর্মধারার মধ্যে এবং নানা উৎসাহ উদ্দীপনামূলক বিষয়ের মধ্য দিয়ে কিভাবে ব্যক্তি তার নিজস্ব আশা-আকাঙ্খার পূর্ণতা খুঁজে পেতে পারে, সেই জিনিসটি দেখা শিক্ষার একটি মূল্যবান কাজ। পার্সিনান এই প্রসঙ্গে এক বিখ্যাত উক্তি করে বলেছেন—ব্যক্তিত্ব কেবলমাত্র সামাজিক পরিবেশের মধ্য দিয়েই গড়ে উঠে এবং এর ভিতর দিয়ে সমাজের ঐক্যপূর্ণ কর্মধারা ও অনুরক্তির খোরাক সংগ্রহ করে শিক্ষার্থী নিজেকে সমৃদ্ধ করে তুলতে পারে। কি ধরনের মূল সামাজিক চিন্তাধারা, ঐক্যপূর্ণ সমাজবোধ ও সমাজ সচেতন ব্যক্তিত্ব সংগঠনের পক্ষে অত্যাবশ্যক, এ বিষয়ে নির্বাচনী নীতি গ্রহণে শিক্ষাবিদদের অগ্রণী ভূমিকা তাই বিশেষভাবে প্রয়োজন। যে সমাজ ব্যবস্থায় নানারকম শ্রেণী-বৈষম্য ও স্বার্থের সংঘাত, মূল্যবোধকে প্রতি পদে পদে হেয় ও পদদলিত করে সমাজকে এক কুৎসিত অবদমনের দিকেই নিয়ে যায়, সেই সমাজব্যবস্থার ভেতর থেকে সমাজ সচেতন ব্যক্তিত্ব সংগঠনের জন্য সামাজিক মূল্যবোধের মূল নীতিগুলি নির্বাচন করে নেওয়া অত্যন্ত কঠিন কাজ হলেও শিক্ষাবিদদের সে কাজটি তবুও করে যেতে হবে অক্লান্তভাবে।

শিক্ষার সার্থকতা এই যে, এর মাধ্যমেই সমাজের সবচেয়ে ফলপ্রসূ

অভিজ্ঞতাকে বাঁচিয়ে রাখা যায়। সবচেয়ে যা শিক্ষাপ্রদ তাকে অব্যাহত রাখার মাধ্যম হোলো **"শিক্ষা প্রতিষ্ঠান"**। নিত্য নতুন নতুন আবিষ্কার এবং যুগের চাহিদা অনুসারে মানবসমাজের সম্পদকে আরো সমৃদ্ধতর ও সম্পদশালী করে তোলার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আসলে সমাজজীবনের এক সংগঠিত রূপ। এর ভেতর দিয়ে সমাজের সবচেয়ে চমকপ্রদ, শিক্ষাপ্রদ এবং সুনির্বাচিত উপাদানগুলি বাঁচিয়ে রাখা যায়। সমাজ, জাতি ও সংস্কৃতির স্বার্থে তথা মানবজাতির কল্যাণে এই সব অভিজ্ঞতার ধারা এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মে হস্তান্তরিত হয়ে যায়। পরবর্তী প্রজন্ম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাংস্কৃতিক অব্যাহত ধারায় অবগাহন করে আহরণ করে অভিজ্ঞতার ফসল। সেই অভিজ্ঞতা যুগের চাহিদা অনুযায়ী সম্প্রসারিত ও সুনির্বাচিত হয়ে আরো সুনির্দিষ্ট আকারে এগিয়ে চলে। গতিশীলতাই তার ধর্ম। এর ভেতর দিয়েই শিক্ষার্থী একটি সংগঠিত পথের নির্দেশনা লাভ করে। কোনো জাতিরই ইতিহাস কখনো একেবারে শূন্যস্থান থেকে শুরু হয় না। এমন কি বিপ্লব হলেও, এবং তা যত বড়ো বিপ্লবই হোক না কেন, জাতির পুরানো অভিজ্ঞতার ফসল থেকে তাকে অবশ্যই শিক্ষা নিতে হবে। এর অর্থ এই নয়, আবিলতা বা পঙ্কিলতাকে পুষে রাখা। সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রাণীন গতিশীলতাকেই সেইজন্য খুঁজে নিতে হয়। সমাজ জীবনের যে সব ধ্যানধারণা যুগের প্রয়োজনে ও চাহিদায় অকেজো বা বাতিল বলে মনে হয়, সেগুলি অবশ্যই বর্জন করতে হয়। খুব সতর্কতার সঙ্গেই তা বর্জন করতে হয়। কেননা, কোনো হঠকারিতায় সার্বজনীন উপাদান বাতিল হয়ে গেলে সমাজের মূল্য মানেরই তা ক্ষয়ক্ষতি। অভিজ্ঞতা নিত্য নতুন অভিজ্ঞতার কাছে অবশ্যই পথ ছেড়ে দেবে। অভিজ্ঞতা তাই কখনো স্থানু নয়, বরং গতিশীল এবং প্রাণবন্ত। সে ক্রমশ আরো সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে, শিক্ষাপ্রদ হয়ে ওঠে। সমাজের জটিল রূপ দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাই সতর্ক হওয়া দরকার। অধিকতর নতুন ফলপ্রসূ অভিজ্ঞতার সম্পদ সঞ্চয়ের জন্য দরকার কালের উপযোগী পরীক্ষা-নিরীক্ষা। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এই জিনিসটি করা দরকার। যা মৃত জিনিস, জীবনের সঙ্গে যার নাড়ীর যোগ নেই, তেমন অভিজ্ঞতা যে স্তরেরই হোক না কেন, তা অবশ্যই বাতিল করতে হয় সজ্ঞান প্রচেষ্টায়।

## ॥ ৫ ॥

# আত্মনিরিখের মূল্যায়ন

আমরা একথা বলেছি, মান্ধাতা আমলের শিক্ষার ধারায় শুধু কেতাবী শিক্ষার উপর জোর ছিল। সমাজজীবনের জীবনধারণের পক্ষে সে শিক্ষা একেবারে অবাস্তব, অকেজো এবং শ্রেণী স্বার্থের পরিপোষক ছাড়া অন্য কিছু নয়।

এখনকার সমাজজীবনে চলেছে দ্রুত পরিবর্তন। যা অবাস্তব, অকেজো, অ বিজ্ঞানভিত্তিক তার কোনো মূল্য নেই এখনকার সমাজজীবনে। এই কারণে আধুনিক শিক্ষায় বৈজ্ঞানিক, কারিগরী, বৃত্তিমূলক শিক্ষার গুরুত্ব বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। জীবনধারণের অনিবার্য তাগিদ বাদ দিয়ে শুধু মগজের কিছু তথ্য চর্বনে সামাজিক প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। সেইজন্য জীবনের প্রয়োজনে ও তাগিদে নতুন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্ব সবদেশেই স্বীকৃত হয়েছে। আমাদের দেশে ইংরেজ-প্রবর্তিত শিক্ষাধারার ভেতরে কিছু মেরামতির কৌশলে সে সব সংস্কার ও আয়োজন করা হয়েছে বা হচ্ছে তার ভেতর পরিষ্কার কোনো 'অবজেকটিভ' দৃষ্টিভঙ্গি নেই। সমগ্র দেশ জোড়া শিক্ষার ক্ষেত্রে স্পষ্ট, উজ্জ্বল, ক্ষুরধার কোনো জাতীয় শিক্ষানীতি না থাকায় এক এক রাজ্যে এক এক রকম শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে জাতীয় সংহতিকে ক্ষুণ্ণ করা হচ্ছে ভীষণভাবে। অথচ জীবনের প্রয়োজনে, জীবন ধারণের অনিবার্য তাগিদে শিক্ষার স্তরকে প্রকৃত প্রস্তুতি পর্ব হিসাবে গ্রহণ করার কোনো অপরিহার্য শর্ত আমাদের শিক্ষার নীতি ও কার্যক্রমে প্রতিফলিত হয় নি।

বর্তমান যুগে পুস্তক কেন্দ্রিক মানবিক বিদ্যা সমাজজীবনের প্রয়োজন মেটানোর পক্ষে একেবারেই অনুপযুক্ত। আবার শুধু বিজ্ঞানভিত্তিক বৃত্তি কেন্দ্রিক কারিগরী-প্রবণ শিক্ষাধারায় মানবিক শিক্ষার উপাদান না থাকলে মানুষ নিছক যন্ত্রের ক্রীড়ানক হয়ে পড়তে পারে এ আশঙ্কা অমূলক নয়। সুতরাং এমন শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের দরকার যা বিজ্ঞানভিত্তিক বৃত্তিমুখী শিক্ষার মজবুত কাঠামোর মধ্যেই সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতার অনুকূল হয়। মানুষের জীবন বর্তমান যুগে প্রতি পদে পদে এক আত্ম নিরিখের নব মূল্যায়ন দাবী করছে। মানুষের সমগ্র জীবনদর্শনে যুগের অনিবার্য দাবী প্রতিফলিত হতে বাধ্য।

এই প্রসঙ্গে আমরা জন ডিউইয়ের শিক্ষাদর্শনের কথা স্মরণ করতে পারি। তিনি বলেছিলেন, শিক্ষাদর্শনের সাহায্যে আমাদের সমধিক অগ্রাধিকার দিতে হবে গতিশীল ও সজ্ঞান ইচ্ছাগত শিক্ষা প্রচেষ্টাকে।

ছকবাঁধা বাঁধাধরা শিক্ষার পরিবর্তে তিনি শিক্ষার ক্রমবিকাশের স্তরে স্বাধীন কর্মবৃত্তির সুযোগ ও প্রসারের কথা বিশেষভাবে বলেছেন। কিন্তু জন ডিউইয়ের এই 'প্রয়োগবাদী' বা 'প্র্যাগ্‌ম্যাটিক' চিন্তাধারার মধ্যেও ভ্রান্তি রয়ে গেছে। কারণ, শিক্ষার ক্রমিক স্তরে একটি সুনির্দিষ্ট ও সুনির্বাচিত শিক্ষাক্রম অমান্য করে অবাধ স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে যাওয়ার অর্থ সমাজমণ্ডিত ব্যক্তিত্ব গঠনে বৈচিত্র্যের নামে স্বেচ্ছাচারিতা প্রশ্রয় পেতে পারে। **আমাদের বিবেচনায় বিজ্ঞান ও কারিগরীভিত্তিক মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির সহায়ক সুনির্দিষ্ট ও সুনির্বাচিত শিক্ষার ক্রমপর্য্যায়ের বিন্যাসের ভেতর দিয়েই শিক্ষার্থীর মেধা, অনুরাগ ও কর্মক্ষমতার মূল্য স্বীকার করে এগিয়ে যেতে হবে। দেশের প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীকে একটি সুসংগঠিত স্তর পর্যন্ত মৌল শিক্ষাক্রম অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে, যার নাম প্রাথমিক বুনিয়াদ।**

বিজ্ঞান, কারিগরী ও বৃত্তিকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার ভেতর কিছু বিপদ লুকিয়ে আছে বলে অনেকে মনে করেন। তাঁরা বলেন, নিছক কারিগরী জ্ঞান ও বুদ্ধিগত প্রচেষ্টা মানুষকে আত্মসর্বস্ব, হীনমন্য, সঙ্কীর্ণচেতা এবং একধরনের একপেশে বিশেষজ্ঞ হিসেবে তৈরি করে। ফলে, এঁদের বিবেচনায়, মানবিক ও সামাজিক সম্পদ ও উপাদানগুলি অবহেলিত হয়ে গিয়ে একধরনের ফাঁকা ও ফোঁপরা ধরনের মানুষ তৈরি করে। **এর পরিবর্তে বিজ্ঞান-কারিগরী-বৃত্তিকেন্দ্রিক শিক্ষার ভিত্তিভূমিতে যদি মানবিক ও সামাজিক উপাদানের জীবনভিত্তিক সমাজদর্শনকে মূলভিত্তি করে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে ওঠে, তাহলে তা সামাজিক মানবিক জীবনদর্শনের উপযোগী হতে পারে।** শিক্ষার সর্বস্তরেই সেইজন্য জীবনবোধের দর্পণকেই প্রাধান্য দেওয়ার কথা এঁরা বলেছেন। জন ডিউই এই সারসত্য স্বীকার করে বলেছিলেন—শিক্ষা ঠিক জীবনের জন্য প্রস্তুতির ব্যাপার নয়—শিক্ষা আসলে একটা জীবন। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন: আমি চাই মানুষ তৈরির শিক্ষা, আমি চাই মানুষ তৈরির ধর্ম। আধুনিক যুগে সমাজজীবনের উপযোগী আধুনিক মানুষ গড়ে তুলতে হলে

বিজ্ঞান, কারিগরী, বৃত্তি, মানবিক ঐতিহ্য সবকিছুকেই প্রাধান্য দিতে হবে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে চাই একটি অবজেকটিভ দৃষ্টিভঙ্গির আশ্রয় নেওয়া। সমাজব্যবস্থার ফারাক বজায় রেখে বিবেকের শিক্ষায় কোনো কাজ হয় না বলেই এদেশে এতো শত ফকীরের মধুর বচন সত্ত্বেও নরনারায়ণ ধূলি লুন্ঠিত, এইটেই বাস্তব সত্য। এ অবস্থায় শিক্ষা পরিকল্পনার মধ্য দিয়েই মানবিক সামাজিক মূল চেতনা সৃষ্টির জন্য আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে কর্মকেন্দ্রিক বিজ্ঞানধর্মী মানবিক সৃষ্টিশীল ও সামাজিক শিক্ষাধারা প্রবর্তনই হবে উপযুক্ত কাজ।

জন ডিউই বলেছিলেন, আধুনিকযুগে একদিকে আছে সমাজ ও যুগের অনিবার্য আহ্বান, অন্যদিকে আছে নির্জ্ঞানভাবে সামাজিক সাংস্কৃতিক শিক্ষাগত পরিবেশের প্রভাবে মানুষের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠনের তাগিদ। এই দুইয়ের মধ্যে যে অসঙ্গতি বা ফাঁকটুকু আছে তা পূরণ করে নিতে হবে। মনে রাখতে হবে শিক্ষা জীবনেরই প্রয়োজন, জীবনের প্রয়োজনেই শিক্ষা। তবে এই প্রয়োজন নিতান্তই প্রয়োজন মাফিক সুবিধেজনক কোনো যান্ত্রিক ব্যাপার নয়। চাহিদা ও প্রয়োজন মিটিয়ে আমাদের সত্তাকে এক উন্নততর মানসিক ও প্রজ্ঞায় সমুন্নত করার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে—বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেই ব্যক্তির সমাজচেতনার পরিব্যাপ্তিই হবে আসল লক্ষ্য।

## প্রশ্নাবলী

১। মানব সভ্যতার ক্রমবিবর্তন কিভাবে এসেছে ?

২। সৃষ্টির আদিম পর্যায় থেকে ক্রমে মানবিক পর্যায়ে এসে কিভাবে মানুষ কতকগুলি সংগঠিত মাধ্যম তৈরি করেছে ?

৩। শিক্ষায় গৃহগত পরিবেশের প্রভাব কতখানি কার্যকরী ?

৪। আধুনিক বিদ্যালয়কে কেন সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলা যায় ?

৫। শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্ম ও রাষ্ট্রের প্রভাব কতখানি থাকা সমীচীন ?

৬। বিদ্যালয়কে সমাজের "ক্ষুদ্র সংস্করণ" বলা কতখানি যুক্তিযুক্ত ?

৭। সমাজচেতনায় বিদ্যালয়ের ভূমিকা কি ধরনের।

৮। 'গণতান্ত্রিক শিক্ষা' বলতে কি বোঝায় ?

৯। 'ব্যক্তিতান্ত্রিক' ও 'সমাজতান্ত্রিক' ভাবধারার মিলন কিভাবে হতে পারে ?

১০। শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে সংগঠিত ও অসংগঠিত প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা কেমন হতে পারে ?

১১। শিক্ষাকে গণতান্ত্রিক জীবনযাপনের উপযোগী করার জন্য যে সব চিন্তাভাবনা হয়েছে তার একটি চুম্বক তুলে ধরো।

১২। শিক্ষাকে সমাজ পরিবর্তনের ও সামাজিক রূপান্তর সাধনের হাতিয়ার করা যাবে কিভাবে?

১৩। শিক্ষা কি জীবন-ভিত্তিক অথবা জীবিকা ভিত্তিক ব্যাপার?

১৪। সামাজিক নেতৃত্বের উপযোগী শিক্ষা কিভাবে দেওয়া যেতে পারে?

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

# শিক্ষার সুসংহত কর্মধারা

# শিক্ষার সুসংহত কর্মধারা

## ॥ ১ ॥

## শিক্ষার সঙ্কীর্ণতা ও ব্যাপকতা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংগঠিত রূপের কথা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। এর মধ্য দিয়েই শিক্ষার্থীরা নানা অভিজ্ঞতা আহরণের এক পরিকল্পিত মাধ্যম পেয়ে থাকে। এই ক্ষেত্রের ভেতর একটি সুনির্দিষ্ট নিয়মের আওতায় তারা শিক্ষাগত সুযোগ পায়। তবে এইটে মনে রাখা দরকার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে জগতের পরিবর্তনশীল জীবননীতির অনিবার্য প্রয়োজন অনুসারে গতিশীল হতে হবে। তাকে সাংস্কৃতিক ও যুগোপযোগী মূল্যবোধ বাঁচিয়ে রাখার অবস্থা বা পরিবেশ সৃষ্টি করার ভূমিকা পালন করতে হয়। কেননা শিক্ষার কাজ শুধু নিছক প্রয়োজন মেটানো নয়, এমন কি এ জিনিস তার আসল উদ্দেশ্যও নয়। শিক্ষার আসল কাজ শিক্ষার্থীকে গতিনির্দেশ করা, তাকে সমাজ-সম্মত করে তোলা। পরিবেশের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে শিক্ষার্থীর মধ্যে সত্যিকার প্রগতিশীল ও বিজ্ঞানধর্মী মূল্যবোধ গড়ে তুলতে হয়। শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের আনুকূল্যে শিক্ষার্থী নিজেই দায়িত্বশীল, সচেতন এবং স্বাবলম্বী হওয়ার পথনির্দেশ পেয়ে নিজেকে তৈরি করে নিতে পারে। শিক্ষার্থীর এই মৌল চাহিদা পূরণের জন্য শিক্ষার এক সঙ্গতিপূর্ণ পরিকল্পনা চাই। চাই এক সুসংহত শিক্ষার কর্মসূচী ও তার বাস্তব প্রয়োগ।

'শিক্ষা' ব্যাপারটি এমন জিনিস যে তাকে আমরা কোনো মতেই সঙ্কীর্ণ অর্থে গ্রহণ করতে পারি না। সঙ্কীর্ণ অর্থে শিক্ষা জীবনের নিছক প্রয়োজন মেটাতে পারে বা মেটাবার চেষ্টা করতে পারে কিন্তু সে কাজ তো নিতান্তই গতানুগতিক এবং সাধারণ ব্যাপার। এর ভেতর কোনো ভাবাদর্শ বা জীবনবোধের প্রেরণা থাকে না। শিক্ষাকে কখনো আমরা নিছক প্রয়োজন-মাফিক সাধারণ ও সঙ্কীর্ণ সীমায় ব্যাখ্যা করতে পারি না। আমরা চাই শিক্ষার ব্যাপক উৎকর্ষ সম্পর্কে উপলব্ধি। যে শিক্ষা মানুষকে জীবন প্রণালী

আয়ত্ত করার শক্তি যোগায়, জীবনবোধের গভীর অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে, ব্যাপক অর্থে শিক্ষার সেই তাৎপর্যকেই আমরা মূল্য দিতে চাই।

ব্যাপক অর্থে শিক্ষার তাৎপর্য নির্দেশ করে বলা যায়, শিক্ষা সামগ্রিকভাবে মানুষের সত্তার উন্মেষসাধনে সাহায্য করবে। শিক্ষা হবে গতিশীল, প্রাণবন্ত। জীবনধারণের প্রয়োজনীয় কলাকৌশল ও মৌলিক সূত্রগুলি শিক্ষাদান করবে সে। শিক্ষার্থীর সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব গঠনে এনে দেবে সমাজ সচেতনতার পরিপূর্ণ আভাস। শিক্ষার্থী সেই সমাজচেতনার একজন অংশীদার ও স্রষ্টার ভূমিকা পালন করবে। গভীর আত্মদর্শনের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সে অনবরত নিত্য নতুন অভিজ্ঞতা আহরণ করে সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ উপাদানসহ আধুনিক বিজ্ঞানের অপরিহার্য সূত্রগুলি অনুধাবন করার মধ্য দিয়ে আয়ত্ত করবে জীবনবোধের রহস্য ও তার সমাধান। অভিজ্ঞতা আহরণ করে সে তাকে এমনভাবে গতিময় করে তুলবে যার ফলে তাৎপর্যপূর্ণ মূল্যবোধ সংরক্ষণ করা যাবে এবং তাকে জীবন্ত করে তুলে যুগচেতনায় উদ্দীপিত হয়ে গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক চেতনায় সমৃদ্ধ হতে পারবে। এর মধ্য দিয়ে সে তার ব্যক্তিত্ব ও নৈতিকতাবোধকে মানবকল্যাণমুখীন আদর্শের ঘনীভূত প্রকাশনায় রূপ দেবে। সে অনুসন্ধিৎসু ও বিশ্বতোমুখী হয়ে এক বিশ্বজনীন বা সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়ে জগৎ ও জীবনের রহস্যকে উদ্ভাবন করে তার মর্মবাণী করায়ত্ত করবে জ্ঞানের মধ্য দিয়ে, কর্মের মধ্য দিয়ে, তপস্যার মধ্য দিয়ে। শিক্ষার সঙ্কীর্ণ লক্ষ্যের ভেতর থাকতে পারে নিছক রুজি রোজগার বা সংকীর্ণ জ্ঞানার্জনের ব্যাপার। কিন্তু ব্যাপক অর্থে, শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে দূর লক্ষ্যের অভিসারী। শরীর-মন-আত্মার সুষম বিকাশ সাধনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীকে পেতে হবে জগৎ ও জীবনের মূল রহস্যের তাৎপর্যপূর্ণ উপলব্ধি।

## ॥ ২ ॥

## সামাজিক অভিজ্ঞতা ও মূল্যবোধ

শিক্ষার কাজ সম্পর্কে এইটুকু নির্বিধায় বলা যায় যে, সমাজের বিকাশ সাধন করা, সমাজের প্রতিপালন করা এবং সমাজকে সংরক্ষণ করার মধ্যেই তার ভূমিকা অবশ্য নির্ধারিত।

শিক্ষাই সমাজের বিভিন্ন কার্যাবলীর মান নির্ণয় করে থাকে। এরই সাহায্যে সমাজের অনভিজ্ঞ বা আনকোরা শিক্ষার্থীরা অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পায়।

তাই, শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর জন্যে গড়ে তুলতে হয় এক **"বিশেষ ধরনের পরিবেশ।"** এর ভেতর দিয়েই শিক্ষার্থী পেতে পারে তার নিজস্ব প্রবণতা ও শক্তি অনুযায়ী আত্মপ্রকাশের এক সুনির্দিষ্ট ও সুনির্বাচিত পথ।

শিক্ষার পরিবেশ এমনভাবে গড়ে তুলতে হয় যার ভেতর দিয়ে শিক্ষার্থী সজীব ও গতিশীল উদ্দীপনা সংগ্রহের প্রেরণা পেতে পারে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভেতরেই গড়ে তুলতে হয় এক বিশেষ ধরনের সামাজিক পরিবেশ। বাইরের বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে গড়ে তুলতে হয় এক অনিবার্য সামাজিক সংযোগ। এর ভেতর দিয়ে শিক্ষার্থীকে খুঁজে নিতে হবে নানা সামাজিক কর্মযজ্ঞে তার উৎসাহ ও অনুরাগ। প্রত্যক্ষ মেলামেশা ও জ্ঞানের আদান-প্রদান এইজন্য প্রয়োজন। পরিবেশের পরোক্ষ ফলাফল কিভাবে শিক্ষার্থীর মনকে প্রভাবান্বিত করছে তা বিচার বিবেচনার জন্য চাই পরিকল্পিত বাতাবরণ।

পরিবেশের পরোক্ষ ফলাফল শিক্ষার্থীর শরীর-মন-আত্মাকে কতখানি গভীরভাবে স্পর্শ করছে, তা বিচার বিবেচনা করে দেখতে হবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে।

একথা অনস্বীকার্য, পরিবেশের বহুমুখী ও বহুবিচিত্র প্রভাবের মধ্য দিয়েই এবং নানারকমের কর্মবৃত্তিতে অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়েই শিক্ষার্থী তার পরিবেশের ভেতর থেকে অসংখ্য বিশেষত্ব ও গুণাবলী রপ্ত করে নিতে পারে। সেগুলি তার সত্তার সঙ্গে একেবারে গ্রথিত হয়ে যায়। সম্মিলিত কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণের ভেতর দিয়ে উৎসাহ উদ্দীপনা গ্রহণ করা শিক্ষার্থীর পক্ষে সহজসাধ্য ব্যাপার হয়। পরিবেশের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব শিক্ষার্থীর সচেতন ও নির্জ্ঞান মনকে এমনভাবে নাড়া দেয় যার ফলে সে অনেকবেশি দায়িত্বশীল, আত্মসচেতন এবং গতিশীল হয়ে গড়ে উঠতে পারে। সমাজের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে নানা রকমের ভাবধারা ও কর্মাদর্শের মধ্য দিয়ে সে অনেক কিছু গুণাবলী সার্থকভাবে অর্জন করতে পারে। শিক্ষার এই সদর্থক দিকটি সেজন্য লক্ষ্যণীয়।

**"সামাজিক অভিজ্ঞতার" আদান প্রদানের জন্য দরকার শিক্ষার পরিবেষ্টনীর মধ্যে বিশেষ বিশেষ ধরনের আয়োজন। একথা মনে রাখতে হবে যে, বিশেষ ধরনের সুনির্বাচিত ও সুসংগঠিত কর্মসূচী ভিত্তিক পরিবেষ্টনীতে শিক্ষার্থীর পক্ষে বিচিত্র ধরনের অথচ ফলপ্রসূ অভিজ্ঞতা আহরণ করা সহজ হয়। বিশেষ ধরনের পরিবেশ গঠনে মুখ্যত তিন ধরনের শিক্ষাগত প্রচেষ্টার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়ঃ**

এক—শিক্ষার্থীর বিশেষ আগ্রহ, প্রবণতা ও শক্তির দিকে লক্ষ্য রেখে পরিবেশের মধ্যে অনুকূল সাহায্য ও পথ নির্দেশের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যেতে পারে। এর দ্বারা শিক্ষার্থীর মন যেভাবে গড়ে উঠতে চায়, যে যে প্রবণতা ও শক্তির ক্ষেত্রে তার বিশেষ ধরনের আগ্রহ, তার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা সম্ভব হয়।

দুই—শিক্ষার্থীকে সামাজিক বিবর্তনের অগ্রগতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিশেষ ধরনের চেষ্টা নেওয়ার দরকার আছে। দেখতে হবে কিভাবে তাকে পরিবেশের মন্দ প্রভাব থেকে মুক্ত করে ভুলভ্রান্তি আচার বিচার কুসংস্কারের বিভ্রান্তি থেকে পরিশুদ্ধ শুভবুদ্ধির দিকে কল্যাণের দিকে চালিত করা যায়, সেই দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা দরকার।

তিন—শিক্ষার কাজ হবে পরিবেশকে ব্যাপকভাবে, বিস্তৃতভাবে, সুনির্বাচিত, সুনির্দিষ্ট ও সুসংগঠিতভাবে গড়ে তোলা।

পরিবেশ এমন ধরনের হবে যার সাহায্যে শিক্ষার্থী সত্যিকারের ফলপ্রসূ, শিক্ষাপ্রদ, বিচিত্র অথচ ঐক্যমুখী মহান অভিজ্ঞতাগুলিকে অর্জন করে নিতে পারবে।

মনে রাখা দরকার, শিক্ষার্থীর মনে "পরিবেশের নিজ্ঞান প্রভাব" দারুণভাবে ক্রিয়াশীল হয়। তার সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের উপর এই নিজ্ঞান পরিবেশের প্রভাব এত গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী হয় যে সারা জীবন সেই প্রভাবের অভিজ্ঞতা থেকে সে সঞ্চয় করে নেয় তার ক্ষমতা এবং এইভাবে সে সমৃদ্ধ ও সচেতন হয়ে ভবিষ্যৎ জীবন বহন করে নিতে পারে। পরিবেশের এই নিজ্ঞান প্রভাবকে জন ডিউই খুবই গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার কাজ বলে মনে করেছিলেন।

শিক্ষার আরেকটি কাজ তাকে হতে হবে গতিশীল, সজীব এবং প্রাণবন্ত। মনে রাখতে হবে, শিক্ষার্থীর মধ্যে যে প্রবণতা, অনুরক্তি ও উদ্দামতা আছে তা নতুন পথ নিয়ে গড়ে উঠতে চায়। সে ক্ষেত্রে চিরাচরিত পথ অনুসরণ করলে, গতানুগতিক বাঁধাধরা পথে এগিয়ে গেলে, স্বভাবের ধর্মকে বিড়ম্বিত করা হয়। সমাজের সংস্রব এসে মানুষের স্বাভাবিক গতিশীলতা নানাভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়. এমন কি পরিবেশের প্রভাবে মানুষের মধ্যে আনে নানারকমের বিকৃতি ও অস্বাভাবিকতা।

এই সব কারণে শিক্ষার কাজ হবে শিক্ষার্থীর প্রবণতা ও অভিরুচিকে একটি "সুনির্দিষ্ট ও সুনির্বাচিত গতিপথে" পরিচালনা করা। এই গতিপথ

নির্দেশ করতে গিয়ে হয়তো কিছু **"নিয়ন্ত্রণের"** প্রয়োজন হতে পারে। শৃঙ্খলাবোধ ছাড়া এ জিনিস আলগাভাবে চলতে দেওয়া যায় না। কিন্তু আবার এই নিয়ন্ত্রণ বা শৃঙ্খলা মানে কোনো কিছু জবর দস্তি নয়। নিয়ন্ত্রণ হবে স্বতঃস্ফূর্ত, স্বাভাবিক এবং পরিচ্ছন্ন। সমগ্র ব্যবস্থাপনার মধ্যেই গড়ে তুলতে হবে সতর্ক ধরনের নিয়ন্ত্রণ।

শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক প্রবণতা ও অভিরুচির বিকাশ সাধনে এই নিয়ন্ত্রণ কোনো বাধা সৃষ্টি করবে না। বরং তার স্বাভাবিক বিকাশকে করবে গতিময়, স্বচ্ছন্দ, আরো সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্ত। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই সমাজসম্মত উন্নত পথ আবিষ্কৃত হতে পারে। সামাজিক প্রবণতা ও কর্মবৃত্তির দিকে শিক্ষার্থীকে এমনভাবে পরিচালিত করতে হবে যাতে তার ভাবধারা ও বুদ্ধির উৎকর্ষ অপ্রত্যক্ষভাবে আরো কার্যকরী হয় এবং তাকে আরো মূর্ত ও সজীব করে গড়ে তোলে।

শিক্ষার কাজ হবে একটা **"অন্তর্নিহিত নিয়ন্ত্রণ"** গড়ে তোলা। এর সাহায্যে শিক্ষার্থী উৎসাহিত হবে স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বচ্ছন্দ প্রচেষ্টায়। যৌথ প্রচেষ্টা ও যৌথ শিক্ষণের ক্ষেত্রে সে আরো উৎসাহিত ও উদ্দীপিত হয়ে উঠবে।

শিক্ষককে দেখতে হবে শিক্ষার্থী তার সর্বাধিক জ্ঞানলাভের মধ্য দিয়ে 'সামাজিক জ্ঞান' লাভ করছে কতখানি। সমাজসম্মত মন বা সমাজধর্মী মন গড়ে তোলার কাজে শিক্ষার্থীকে গতিনির্দেশ করা হবে শিক্ষার অন্যতম মুখ্য কাজ। জন ডিউইয়ের চিন্তাধারা অনুসরণ করে বলা যায়, সমাজধর্মী মন গড়ে তুলতে পারলে তার দ্বারা শিক্ষার্থীরা যৌথ ও সহযোগিতামূলক কাজে অংশ নিয়ে শেষপর্যন্ত সমাজের শক্তি হিসেবে নিজেরাই সমাজকে পরিচালনা করার শক্তি অর্জন করবে। গণতান্ত্রিক-সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের কাজে শিক্ষার্থীদের সমাজধর্মী মনকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অত্যাবশ্যক শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারলে এই সব শিক্ষার্থীরা পৃথিবীর বুকে যে কোনো অশুভ অসামাজিক কার্যের বিরুদ্ধে একধরনের **"রক্ষাকবচের"** কাজ করতে পারে। বিদ্যালয় হবে এমন এক ধরনের **"মানুষ গড়ার ল্যাবরেটারি"** যেখান থেকে পৃথিবীর যাবতীয় অসাম্য, বৈষম্য, অনাচার, বিভ্রান্তি, যুদ্ধ, দাঙ্গা, রক্তপাত, বীভৎসতা, কুশ্রীতা সবকিছুর বিরুদ্ধে একদল সংগঠিত ও সুশৃঙ্খল সমাজধর্মী মানুষ তৈরি হয়ে আসতে পারবে। কিভাবে পৃথিবীর সকল মানুষকেই অধিকতর যোগ্যতার সঙ্গে

সমাজধর্মী শিক্ষায় সুষ্ঠুভাবে শিক্ষা দেওয়া যায়, এই চিন্তাই এখন দেশবিদেশের শিক্ষাবিদ্‌দের কাছে বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে।[১৩]

শিক্ষার একটি অত্যাবশ্যক কাজ হোলো, কিভাবে শিক্ষার্থী বিভিন্ন প্রকারের **"সম্পর্ক"** স্থাপনের ক্ষমতা অর্জন করে, সেইটে দেখা। প্রথমতঃ দেখতে হবে শিক্ষার্থী কিভাবে প্রাকৃতিক অবস্থার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারছে। দ্বিতীয়তঃ দেখতে হবে সমাজের সঙ্গে তার সংযোগ ও সম্পর্ক কতখানি গড়ে উঠেছে। তৃতীয়তঃ, সে সমাজ সভ্যতার ধারার সঙ্গে নিজেকে কতখানি যুক্ত করতে সক্ষম হচ্ছে। চতুর্থতঃ, কিভাবে সে উচ্চ ভাবাদর্শ, জীবনপ্রেরণা, সমুন্নত নৈতিক বা

১৩। শিক্ষার কাজকে আমরা সংকীর্ণ আত্মসর্বস্বতরে বেঁধে রাখতে পারি না। তার ব্যাপকতাকে যত বেশি পরিমাণে আমরা বিস্তৃত করে দিতে পারি সেই দিকে লক্ষ্য দেওয়া দরকার। মনে রাখতে হবে মণ্টেইনের সেই বিখ্যাত উক্তি—শিক্ষা জিনিসটা নিছক শিক্ষাদানের চেয়েও আরো কিছু বেশি। রুশো বলেছিলেন, তাঁর লক্ষ্য শিক্ষার্থীর মনকে কিছু জ্ঞান জাতীয় পদার্থ দিয়ে ভরপুর করে দেওয়া নয়—কিভাবে জ্ঞানের কলাকৌশল সে আয়ত্ত করতে পারে সেই প্রক্রিয়াটি সহজ ও স্বাভাবিকভাবে অর্জন করতে দেওয়াই আসল কাজ। আমাদের দেশের মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন এই দৃষ্টিভঙ্গির কথা মনে রেখেই বলেছিলেন যে, শিক্ষার্থীর মগজের উপর কতকগুলো পাঁচমেশালী তথ্য ভরিয়ে দেওয়া কোনো কাজের কাজ নয়—দেখতে হবে শিক্ষার্থীর নিজের মধ্যে জ্ঞানার্জনের স্বাভাবিক কৌতূহল কেমনভাবে গড়ে উঠেছে। আমাদের তাই দেখতে হবে শিক্ষার্থী এমন সব জ্ঞান আহরণ করবে যা নিছক প্রয়োজন মাফিক নয়। শিক্ষা যখন নেহাৎ প্রয়োজন মাফিক হয় তখন তা সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ ধরনের একটা জড়পিণ্ড ধরনের জিনিসে পরিণত হয়। আমরা যদি এযুগে বলি, শিক্ষার কাজ এক বিশেষ ধরনের রুজি-রোজগারের শিক্ষণের ব্যবস্থা করা, তাহলে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যই একেবারে একপেশে বলে গণ্য করা হবে। অবশ্য জীবিকা অর্জনের শিক্ষাও দিতে হবে কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে দেখতে হবে আরো অনেক কিছু অতিরিক্ত। মনে রাখতে হবে যে, মানুষের সামাজিক চাহিদা এখন দারুণভাবে বেড়ে গেছে। শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীকে দিতে হবে এমন কৌশল আয়ত্ত করার স্বাভাবিক অথচ সুশিক্ষিত কর্মক্ষমতা যার ফলে সে সমাজের নানা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মধ্যে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার শক্তি অর্জন করতে পারে। যতদিন পুঁজিবাদী অসম প্রতিযোগিতামূলক সমাজব্যবস্থা চলবে ততদিন খাঁটি সমাজধর্মী শিক্ষার্থী গড়ে তোলা সত্য সত্যই এক অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু, তবু নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে শিক্ষার মাধ্যমে, কিভাবে শুভশক্তিগুলিরই জয় হতে পারে। বর্তমান যুগ অসম্ভব রকমের জীবন যন্ত্রণা ও জটিলতার যুগ। যন্ত্রসভ্যতাকে যতদিন আমরা গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ও অর্থপূর্ণ কাজে রূপান্তরিত করতে না পারছি, ততদিন জীবন ও জীবিকার সমস্যা সমাধানে জটিলতার গ্রন্থিমোচনের জন্য সহজ ও সরল সূত্র আবিষ্কারের জন্য নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে।

আধ্যাত্মিক আদর্শের সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করতে পারছে। যে কোনো সমাজব্যবস্থায় শিক্ষার ক্ষেত্রে এই **"চার ধরনের সম্পর্ক স্থাপনের কাজ"** খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার।

শিক্ষার্থীর জীবনে এই চার ধরনের সম্পর্ক স্থাপনের কাজটি সুষ্ঠুভাবে গড়ে তুলতে পারলে শিক্ষার ক্ষেত্রটি সুদূরপ্রসারী হয়ে উঠতে পারে। একটু ব্যাখ্যা করে বলা যায়, শিক্ষার মধ্য দিয়ে জানতে হবে প্রকৃতিকে। প্রকৃতির মধ্যে যে রহস্য ও বিস্ময় আছে তা মানুষ আবিষ্কার করুক, দেখুক এবং জানুক। নিজের প্রতিভা ও দীপ্তি নিয়ে প্রকৃতির রহস্য আবিষ্কার করে তাকে ব্যবহারিক জগতে ব্যবহার করার কাজে সে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠুক। প্রকৃতির প্রতি এই অনুরাগ সে প্রদর্শন করতে পারে কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, সৌন্দর্য চেতনা, বিজ্ঞান চেতনা প্রভৃতির মাধ্যমে। অনুভূতিতে এবং প্রয়োগ কৌশলের মাধ্যমে। ইতিহাস, ভূগোল, সমাজবিজ্ঞান, রাজনীতি, দর্শন, অর্থনীতি, কৃষিনীতি, শ্রমনীতি, বিচারনীতি প্রভৃতি বিষয়ের সাধারণ ও প্রাথমিক সূত্রাবলী থেকে সে জানতে শিখুক সামাজিক সম্পর্কের বিষয়গুলি। এই সব জ্ঞানরাজ্য থেকে সূত্র আহরণ করে খোলা চোখ নিয়ে সমাজের সঙ্গে মেলামেশায় ও নানা সামাজিক কাজকর্মে অংশ গ্রহণ করে সে জানুক সামাজিক সম্পর্কের দশদিগন্ত। সে অনুভব করুক সে একজন গণতান্ত্রিক-সমাজতান্ত্রিক সমাজ আদর্শের প্রথম সৈনিক। সমাজধর্মী সমাজ সচেতন মন নিয়ে তাকে বহুমুখী জ্ঞানরাজ্য থেকে আহরণ করতে হবে সমাজগঠনের কার্যকারিতা, সমাজের বর্তমান রূপ এবং তার থেকে আরো উন্নততর সমাজ বিবর্তনে উত্তরণের কলাকৌশল। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কবোধ থেকে সে শিক্ষা গ্রহণ করুক বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের শিক্ষা। দারিদ্র্য ও অসাম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার নিরলস সংগ্রামশীল মনোভাব সে আয়ত্ত করুক। জ্ঞানবিজ্ঞানের ঐতিহ্য ও ক্রমবিকাশ যে মানুষের জন্যই প্রয়োজন, এই বিশ্বাস তার মধ্যে গড়ে উঠুক গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে। তাছাড়া, সে জানুক মানুষের চেয়েও আরো এক বিশ্ব পরিব্যাপ্ত বিরাট প্রকৃতির অস্তিত্ব আছে যাকে জানা যায়, অনুভব করা যায়, উপলব্ধি করা যায় এবং জীবনের পটভূমিকায় একটি ঐক্যবোধ ও বিশ্বজনীনতার নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সীমা-অসীমের দোলাচলে এক গভীরতম রহস্যকে চেনা যায় এবং চেনা যায় না অথচ আমাদের সৃষ্টির প্রকাশনায় সে অনেকখানি অভিব্যক্ত হতে পারে। এক

বিরাটত্বের অনুভূতি আমাদের সঙ্কীর্ণতা ও তুচ্ছতাকে নিয়ে যায় মহত্বের দিকে, ঐক্যের দিকে, সার্বজনীনতার দিকে, বিশ্বজনীনতার দিকে, সম্প্রসারণশীলতার দিকে। এই অনুভূতি ও প্রয়োগ কৌশল থেকে মানুষের জীবনে জাগে এক পবিত্রতম অনুরাগ, সৌন্দর্যচেতনা, বিজ্ঞানচেতনা। ফলে, শুভবুদ্ধির প্রেরণায় মহৎ ও বিরাটত্বের আকর্ষণে পৃথিবীর মানুষেব সমাজ যেন এক ঐক্যবিন্দুর দিকেই গ্রথিত হয়ে যায়। ব্যক্তি মন ও সমাজ মনের মানসিক দৈহিক আত্মিক প্রসারতা আসে। বিশ্বজনীন সামগ্রিক বোধ থেকে জন্ম নেয় ব্যক্তিত্বের সামাজিক সংগঠন। দেশ জাতি বিশ্ব মনুষ্য সমাজ ঐতিহ্য আধ্যাত্মিকতা বিজ্ঞানময়তা সব কিছুর ভেতর আসে এক সর্বানুভূতি ও কর্মের নতুনতরো পরিচ্ছন্ন ও স্বচ্ছ চেতনা। এই ধরনের সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে যদি শিক্ষার কাজ এগিয়ে চলে, তাহলে শিক্ষার ভেতর দিয়ে ফুটে উঠে এক অনুপম সুন্দর গভীর তাৎপর্য ও ব্যাপ্তির প্রসারতা। এ কাজ নেহাৎ প্রয়োজন ভিত্তিক তাগিদেব ব্যাপার হয় না, হয় একান্তই স্বাভাবিক, পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর। এই পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী একটি সামগ্রিকতার চেতনায় ও সমাজ সত্তার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে 'সাবজেকটিভ-অবজেকটিভ' দৃষ্টিভঙ্গির অংশীদার হতে পারে। অন্তঃদৃষ্টি ও বহিঃদৃষ্টি, ভাব ও কর্ম, বুদ্ধির চেতনা ও বোধি একসূত্রে গ্রথিত হয়ে মানুষকে গড়ে তুলতে পাবে সত্যিকার সমাজমণ্ডিত মানুষ হিসেবে। জীবন ও জীবনের আশ্রয়স্থলটিকে একটি কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করেই শিক্ষার কাজ সার্থক ও সুন্দর হতে পারে।

## ॥ ৩ ॥

## মুল লক্ষ্য বিন্দু

শিক্ষার মূল লক্ষ্য বিন্দুতে আছে সর্বপ্রকার মূল্যবোধের কেন্দ্রস্থলটিকে জানার ব্যাপার। বর্তমান যুগ বিশেষজ্ঞের যুগ সন্দেহ নেই। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা যদি নিজ নিজ জ্ঞানরাজ্যের বিশেষ ক্ষেত্রে আবদ্ধ রেখে দেশের ও মানবজাতির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতন না হন, তাহলে তাঁদের মনোবৃত্তি সুকুমারধর্মী না হয়ে যান্ত্রিক হয়ে যেতে কতোক্ষণ। সেইজন্য শিক্ষার ভেতর দিয়ে মূল্যবোধের

কেন্দ্রস্থলটি জানার অভ্যেস করতে হবে শিক্ষার্থীকে তার প্রাথমিক বুনিয়াদ গড়ে ওঠার ভেতরেই। প্রাথমিক ও আবশ্যিকভাবে জ্ঞানবিজ্ঞানের নানা শাখা যুগান্তকারী ফসলের নির্যাসের সঙ্গে আধুনিকতম জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আবিষ্কারের মূলসূত্র জানতে হবে শিক্ষার্থীকে।

এইভাবে এক নতুন ধরনের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি নিতে হবে তাকে। একটি মূল্যবান শিক্ষার স্তর পর্যন্ত শিক্ষা সময়ে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকেই জানতে হবে মানবিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের মূল সূত্রগুলি। সর্বপ্রকার মূল্যবোধের সাধারণ কেন্দ্রবিন্দুটি সকলের আগে জানা দরকার। যে কোনো গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা পত্তনের ক্ষেত্রে এই সাধারণ মূল্যবোধের কেন্দ্রবিন্দুর প্রতি জোর দেওয়া উচিত। সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ, বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ এই দুই ধারার সমন্বয়ে অতি আধুনিকতম উপাদানের সাধারণ সূত্রগুলি রপ্ত করাতে হবে শিক্ষার্থীকে। এইভাবেই সে সামগ্রিক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পেতে পারে। জীবন প্রেরণার ক্ষেত্রে এই জিনিস হতে পারে সত্যিকার বাস্তবসম্মত ব্যাপার। প্রকৃত শিক্ষার কাজ কখনো কোনো সময় খণ্ড বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। প্রকৃত শিক্ষার সাধনা মানে সামগ্রিকতার সাধনা, পূর্ণতার সাধনা। শিক্ষা মানুষের সারা জীবনব্যাপী এক মহান সাধনা। ইস্কুলে, কলেজের শিক্ষা সেই সাধনার প্রস্তুতি পর্ব। মানুষের শিক্ষার কোনো বিরাম নেই, ছেদ নেই, সীমারেখা নেই। সারা জীবন মানুষ শিক্ষা লাভ করে, অভিজ্ঞতা অর্জন করে। শিক্ষার বুনিয়াদ এমনভাবে পোক্ত করতে হবে যার ফলে শিক্ষার্থী একটা সঠিক পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে দক্ষতার সঙ্গে যোগ্যতার সঙ্গে জীবনের পথে পাড়ি দিতে পারে। এইজন্য শিক্ষার সমস্ত প্রচেষ্টার মধ্যে গড়ে ওঠা দরকার পরিচ্ছন্ন, ব্যাপক ও বিস্তৃত কর্মসূচীর একটি ছন্দোময় বিন্যাস। ফ্রোয়েবেল বলেছিলেন: চারাগাছ যেমন পরিচর্যার মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠে, তেমনি মানুষও বেড়ে ওঠে শিক্ষার মধ্য দিয়ে। সেই শিক্ষা এক অব্যাহত ধারার শিক্ষা—সারা জীবন ধরে চলে সেই শিক্ষার সাধনা। তাই বলা যায়, প্রকৃতির হাতেই আকাড়া সব কিছু ছেড়ে দেওয়া যায় না—মানুষকে সজ্ঞান ইচ্ছায়, সজ্ঞান প্রচেষ্টায় অনেক কিছু কারিকুরি করতে হয় কিন্তু সেইটে যেন শৈল্পিক বিন্যাস হয়, যান্ত্রিক কৃত্রিমতা যেন না থাকে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সমাজজীবনের অভিজ্ঞতার ধারাকে অব্যাহত রাখতে হবে এমনভাবে যেন তা গতিহীন ও যুগের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। পুরাতন অভিজ্ঞতা যা মানুষ অর্জন করেছে, সঞ্চয় করেছে তার তাৎপর্য অনুধাবন করতে হবে নতুন যুগের পরিপ্রেক্ষিতে, পরিবর্তনশীল সামাজিক প্রেক্ষাপটে। নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে এবং নতুন নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের মধ্য দিয়ে "অনবরত ক্রমিক বিবর্তনের" দিকেই এগিয়ে যেতে হবে।

শিক্ষা একটি গতিশীল সক্রিয় পদ্ধতি। এরই মাধ্যমে মানুষের সমাজ-সংস্কৃতি দেশ জাতি মহাজাতির অভিজ্ঞতার ফসলকে অনাগতের প্রবহমান ধারার দিকে আমরা গতিশীল, আবেগে সঞ্চালন করে দিতে পারি। সেই অভিজ্ঞতার ধারাকে সজীব ও প্রাণবন্ত করার জন্যে প্রয়োজন সজ্ঞান পদক্ষেপ। সংগঠিত প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা এইজন্যই সব চেয়ে বেশি। এইসব প্রতিষ্ঠান পরিবেশের প্রভাবকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সুনির্বাচিত অভিজ্ঞতাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। সমাজের মূল্যবোধকে যেমন সে স্থিতিশীল হতে সাহায্য করে, তেমনি নতুন নতুন মূল্যবোধকেও যাচাই করে তাকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসংগঠিত করে তুলতে পারে। সমাজের ক্ষেত্রে যেগুলি **"মৌলিক মূল্যবোধ"**, তা নিরূপিত হয়ে যায় কালের কষ্টিপাথরে। যুগের চাহিদা ও দাবী অনুসারে সেইসব মৌলিক মূল্যবোধ নতুন নতুন যুক্তি ও তথ্যের উপর ভর করে এক গতিশীল প্রাণবন্ত ভাবমূর্তি গ্রহণ করে। এইভাবে তা আরো উন্নততর অভিজ্ঞতার পর্যায়ে উন্নীত হয়ে যায়। এমন অনেক মূল্যবোধ থাকে যাকে আমরা সার্বজনীন বা চিরন্তন বলে মনে করি। তার মূল্য বা উপযোগিতা কোনো দিন ফুরিয়ে যায় না। যুগের পরিপ্রেক্ষিতে সেইসব মূল্যবোধকে নতুন করে তাৎপর্য দিতে হয়। যেমন উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, ভারতবর্ষ ও প্রাচীন গ্রীসে সত্যম্ শিবম্ সুন্দরমের মঙ্গলময় আদর্শ ও বাণীর যৌক্তিকতা বা সার্থকতা এই বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানকেন্দ্রিক সভ্যতার যুগেও অবাস্তব বা অবান্তর বলে গৃহীত হতে পারে না। বরং তা প্রসারিত হয়ে নতুন তাৎপর্য নিয়ে সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ কল্যাণম্ বিজ্ঞানম্ হয়ে উঠতে পারে যুগ মূল্যবোধের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে। এইসব মূল্যবোধ অর্জনের পদ্ধতির পরিবর্তন ভিন্ন যুগে ভিন্ন রকমের হতে পারে। কিন্তু,

সার্বজনীন ভাবধারার সার্বজনীনতা বা ঐক্যপ্রবণতা সেজন্য ক্ষুণ্ণ হয় না। শিক্ষা-দর্শনের দিক দিয়ে এই নীতি খুবই মূল্যবান সন্দেহ নেই।

ব্যাপক অর্থে শিক্ষার কাজ হতে পারে, কিভাবে শিক্ষার্থী পরিবেশের সঙ্গে উপযোজনা করবার শক্তি সংগ্রহ করছে তা শুধু নয়, দেখতে হবে কিভাবে সে নিজেকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেষ্টনীর অন্যতম উপাদান হিসেবে বা ধারক বাহক হিসেবে পরিবেশেরই একজন স্রষ্টা ও সেবক হয়ে উঠেছে।

ব্যক্তি ও সমাজের পরিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের ভেতর দিয়েই সমাজ ও সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারে। শিক্ষার্থী সেই কাজে সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারে। শিক্ষার কাজ চরিত্র গঠন করা। চরিত্র বলতে বোঝায় মানুষের সামগ্রিক সত্তারই পরিপূর্ণ বিকাশ। চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব প্রায়ই একার্থবোধক। নৈতিক প্রেরণা নিয়ে মানুষ যখন কতকগুলি সৎ ও মানবিক গুণের অধিকারী হয়, তখনই আমরা বলি চরিত্র অর্জনের কথা। ঋষির যুগে ব্রহ্মচর্য ছিল চরিত্র গঠনের প্রাথমিক মুখ্য উপাদান। যুগের পরিবর্তনে এবং বিজ্ঞানের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার যুগে পাশ্চাত্য দেশে 'যৌন স্বাস্থ্য রক্ষার' কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে। আমরা আমাদের দেশে "চরিত্র" বলতে বুঝি ব্যাপকভাবে সদ্‌গুণের একত্র সমাহারকে। পাশ্চাত্য জগতের 'ক্যারেকটার' আর আমাদের 'চবিত্র' একধরনের অর্থবহ নয়। শিক্ষা ব্যাপক অর্থে মানুষের চরিত্রকে সংগঠিত করবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন—আমি চাই সেই শিক্ষা যা মানুষ তৈবি করে—মানুষ তৈরির শিক্ষাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। সমাজের আভ্যন্তরীণ জীবনে উৎপাদনাত্মক শক্তির অসম প্রয়োগে যে বৈষম্য তাকে দূর করতে হবে সর্বাগ্রে। নতুবা কোনো ব্যক্তির মধ্যেই সৎ গুণাবলীর চরিত্রগত কাঠামো দানা বাঁধতে পারে না। একজন দুজন স্বামী বিবেকানন্দ হয়তো যে কোনো যুগে ব্যতিক্রম।

গণতান্ত্রিক যুগে সকল মানুষের জন্য চাই সমান সুযোগ, সমান অধিকার। সর্বসাধারণের চরিত্রকে ন্যায় নীতির ভিত্তিভূমিতে প্রতিষ্ঠার জন্য তাই সুনাগরিকত্বের শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়। বর্তমান যুগ সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক ভাবভাবনার যুগ। সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শের মর্মমূলে এখন সমাজবাদী সমাজগঠনের কথাই উচ্চারিত। এ যুগে জনগণের সোচ্চার দাবী উন্নততর জীবনযাত্রা প্রণালী, অধিকার ও কর্তব্যবোধের নতুনতরো অভিজ্ঞান অর্জন করা।

এ যুগে কোনো বিশেষ ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনাই শেষ কথা নয়। গণতন্ত্র আসলে এক ধরনের জীবন পদ্ধতি—সরক৲ারী ব্যবস্থাপনার চেয়েও এ জিনিস অনেক অনেক বড়ো।

গণতন্ত্র জিনিসটা একধরনের মেজাজ বা প্রবণতা বা আ ন্দোলন। গণত যেহেতু একধরনের বিশেষ রকমের জীবনপদ্ধতি, এর শিকড় তাই জ নয় নগণের যৌ বে। প্রচেষ্টায় এমন গভীরভাবে প্রোথিত হতে পারে যার ফলে কোনো অশুভ শক্তি এই জীবনযাত্রার মর্মমূলে আঘাত হেনে সুবিধে করতে পারবে না। জনগ সংস্কৃতি মিলিত শক্তিই এর প্রাণবিন্দু।

জন ডিউই-র ভাষায় গণতন্ত্র জিনিসটি সরকারী ব্যবস্থাপনার চেয়েও ভিন্নতর জিনিস। আসলে তা একধরনের যৌথ জীবনযাপনের কলাকৌশল, সম্মিলিতভাবে অভিজ্ঞতা বিনিময় বা যোগাযোগেরই একটা সক্রিয় মাধ্যম।

বর্তমান বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী স্বৈরাচারী ধর্মান্ধতা জাতীয়তা প্রভৃতি নানা রাজনৈতিক দুরন্তপনা জনগণতান্ত্রিক সমাজবাদী মানবকল্যাণমুখী সমাজ গঠনের আদর্শকে বারংবার আঘাত করছে নানা আদলে ও প্রকরণে। সেইজন্য সারা বিশ্বের গণতান্ত্রিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের ভেতর দিয়ে জনগণতান্ত্রিক আদর্শের বিশ্বজনীন রূপটিকে অব্যাহত ধারায় প্রবহমান রাখার জন্যে সংগঠিত সজ্ঞান প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে।

মনে রাখতে হবে, বর্তমান বিশ্ব জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রভূত কল্যাণে ও প্রসারে ক্রমশ ঐক্যভূত ও বিশ্বজনীন হয়ে উঠেছে। এক প্রান্তের ঘটনা ও আবিষ্কার এক মুহূর্তে অন্য প্রান্তকে আন্দোলিত করেছে। পৃথিবীর মানুষ নিজ নিজ দেশের ভাবধারা ও আদর্শের উপর বিশ্বাস রেখেও বিশ্বজনীনতার দিকে বেশিমাত্রায় ঝুঁকেছে।

ক্রমশ পৃথিবীর সবদেশের মানুষ বুঝতে চাইছে যে, পৃথিবীর জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধনা কারো একচেটিয়া ব্যাপার নয়। সেই জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধনাকে শুভ কাজে লাগিয়ে পৃথিবী থেকে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অসাম্য, অনাচার, কুসংস্কার, শোষণ, বৈষম্য প্রভৃতি অনাসৃষ্টিকে বিদায় দেবার জন্য গণতান্ত্রিক মেজাজ ও ধ্যানধারণা ক্রমশ সোচ্চারভাবে দেখা দিয়েছে। পৃথিবীর মানুষ পৃথিবীকে তার শক্তি, সামর্থ্য, বুদ্ধি, বিবেচনা, ধ্যানজ্ঞান, ভাবাদর্শ ও কর্মপ্রেরণা দিয়ে এক সুন্দর লীলাভূমিতে পরিণত করার জন্য উদ্যত এবং বদ্ধ পরিকর। সমাজ সভ্যতার ধ্বংসকারী অশুভ শক্তি জনগণের দুর্বার শক্তির কাছে অবশ্যই পদানত হবে।

শিক্ষার কাজ তাই হবে শুভ সামাজিক প্রবণতাগুলিকে বিশেষভাবে গতিময় ছন্দোময় করে তোলা। সেইভাবে শিক্ষার্থীদের পথ নির্দেশ করা। পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে মুক্ত করে সৃষ্টিশীল সমাজ সংস্কৃতি ও সভ্যতার পীঠভূমিতে রূপান্তরিত করার কাজে শিক্ষার ক্ষেত্রই সবচেয়ে অগ্রণী হাতিয়ার।

এই প্রসঙ্গে মহাত্মাজীর শিক্ষাদর্শন ও সমাজতাত্ত্বিক নীতির কিছু চুম্বক তুলে ধরা যায়। তাঁর চিন্তাধারা পরাধীন ভারতের এক সুগমসন্ধিক্ষণে সমুচ্চারিত হয়েছিল। কিন্তু তবুও তিনি শিক্ষানীতি এমনভাবে নির্দেশ করেছিলেন যার ভেতর আমরা একটি সার্বজনীন উদার পরিচ্ছন্ন শিক্ষা-দর্শনেরই সন্ধান পাই। যাঁরা তাকে প্রগতিবিরোধী, প্রতিক্রিয়াশীল ও অকেজো বলেন তাঁরাও যেমন একদেশদর্শী, আবার যাঁরা উত্থানের সঙ্গে ভাবাপ্লুতার সঙ্গে তাঁর চিন্তাধারার মর্মকে সঠিক অনুধাবন না করে আক্ষরিকভাবে অন্ধভাবে তাঁকে অনুসরণ করার চেষ্টা করেন তাঁরাও একদেশদর্শী। আসলে গান্ধীজী ভারতের জাতীয় জীবনের পটভূমিকায় একটি নিজস্ব শিক্ষা-দর্শন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন যা অপরিবর্তনীয় নয় অথচ সত্যের জন্য সততই উন্মুখর। সোবিয়েত রাশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা জানতে গেলে যেমন মার্কস্ লেনিনের দর্শনকে জানতে হয় কিংবা ইংরেজি শিক্ষার কাঠামোকে জানতে গেলে সে দেশের প্রগতিপন্থী ও সংরক্ষণ পন্থীদের মনোভাবের দ্বন্দ্বকে জানতে হয়, তেমনি ভারতবর্ষের শিক্ষা-দর্শনকে যুগোপযুগী করে চিন্তা করতে হলে মহাত্মাজী এবং রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-দর্শনকে অবশ্যই জানতে হয়।

কর্মভিত্তিক শিক্ষা কিংবা উৎপাদনাত্মক শিল্প, মানুষ তৈরির জন্যে অন্যান্য আনুষঙ্গিক যেসব চিন্তাভাবনা তিনি করেছিলেন সেগুলি দিয়ে মহাত্মাজীর বিচার সঠিক নয়। তিনি আসলে কি চেয়েছিলেন সেইটেই বড়ো কথা। তাঁর লক্ষ্যবিন্দুকেই মর্যাদা দিতে হবে। তিনি চেয়েছিলেন সত্যিকারের মহিমামণ্ডিত ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং নতুন সামাজিক বিন্যাস। এমন এক সামাজিক ধারণা তাঁর মনে ছিল যা নিখুঁত অর্থে হবে প্রতিদ্বন্দ্বীবিহীন, শোষণহীন, বিকেন্দ্রীভূত স্ব-স্বাধীন এক মুক্ত সমাজ—সম্পূর্ণভাবে আত্মনির্ভরশীল, পরিতৃপ্ত এবং আত্মবিবর্ধণকারী। সমাজের ভেতরেই তিনি চেয়েছিলেন সেই শক্তির স্বতঃস্ফূর্ত

প্রকাশনা। গোটা সমাজটাই যদি এইভাবে গড়ে ওঠে তাহলে বিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে সমাজেরই একাত্মতায় যে ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠবে সেই ব্যক্তিত্ব হবে সমাজমণ্ডিত ব্যক্তি। শুভ শক্তিকেই তিনি নির্বাচিত করে তাকে যেভাবে সমাজের স্বতঃস্ফূর্ত নিয়ামক শক্তিতে বিন্যাস করতে চেয়েছিলেন তার ভেতর আছে এক সুগভীর আত্ম-দর্শন, সমাজদর্শন ও বিশ্বদর্শনবোধ। শিক্ষার অগ্রণী ভূমিকাকে তিনি এইভাবেই একটি লক্ষ্যবিন্দুর দিকে পরিচালিত করার প্রয়াস নিয়েছিলেন।

## প্রশ্নাবলী

১। শিক্ষা ক্ষেত্রে আদর্শবাদী চিন্তাধারার কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে কি না?

২। আধুনিক যুগে 'বিশেষজ্ঞের শিক্ষা' ও 'সাধারণের শিক্ষা'র পার্থক্য কিভাবে চিন্তা করা যাবে?

৩। শিক্ষার প্রয়োগবাদী চিন্তাধারার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।

৪। শিক্ষার গতি প্রকৃতি নির্ণয়ে দার্শনিক চিন্তাধারার প্রয়োজনীয়তা কতখানি?

৫। শিক্ষার আধুনিকীকরণ বলতে কি গণতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রী শিক্ষাকেই বোঝায়?

৬। শিক্ষাদর্শনে আদর্শবাদ, স্বভাববাদ, প্রয়োগবাদ, মানবতাবাদ প্রভৃতি চিন্তাধারার একটি সংক্ষিপ্ত সার্বিক বিশ্লেষণ করো।

৭। জন ডিউই ও রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শের মিল কতখানি?

৮। 'অভিজ্ঞতা-কেন্দ্রিক' শিক্ষাই কি শিক্ষার সর্বশেষ ব্যাপার?—আলোচনা দ্বারা যুক্তি খণ্ডন করো।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

# শিক্ষা ও সমাজ ধারার বিবর্তন

# শিক্ষা ও সমাজধারার বিবর্তন

## ॥ ১ ॥

আদিমকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত চলেছে মানুষের শিক্ষাধারার এক অব্যাহত ধারা। এই ক্রমিক বিবর্তনের মধ্যে কোথাও কোনো ছেদ নেই, ফাঁক নেই, বিরতি নেই। শিক্ষা পদ্ধতির বিবর্তন ধারা পর্যালোচনা করলে আমরা ধারাবাহিক ইতিবৃত্তের এক ক্রমিক পরিণতি বা উত্তরণের সন্ধান পাই।

মানুষ প্রথমত ছিল আদিম পর্যায়ে। সেই পর্যায়ের অপর নাম বলা যেতে পারে 'মহাজাগতিক পর্যায়' বা কসমিক স্তর। এই সময় মানুষের কোনো আত্মসচেতনবোধ ছিল না। সবকিছুই তখন সে প্রবৃত্তির টানে, প্রতিবর্ত ক্রিয়ার আকর্ষণে বিকর্ষণে করতো। আশা, আকাঙ্খা, ভাব, অনুভূতি, উদ্দেশ্য, পরিণতি, কার্যকারিতা ইত্যাদি সম্বন্ধে তার বোধ বা চেতনা ছিল নামমাত্র। তবুও আদিম মনে কতকগুলি কাজ করার নেশা অবশ্যই ছিল। তবে সজ্ঞান ইচ্ছা বললে যা বোঝায় তার লেশমাত্র ছিল না। এজন্য কোনো তাগিদ সে অনুভব করতো না। দূরদৃষ্টি ও কল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার কোনো সজ্ঞান ইচ্ছাশক্তি তার মধ্যে তখন জাগেনি। সেইজন্য মানব সমাজের আদিম পর্যায় ঘন রহস্যাবৃত রয়ে গেছে।

কিন্তু বিবর্তনের ধারায় মানুষের মধ্যে ক্রমশ এসেছে আত্মসচেতনবোধ। এই বোধ যতই সুসংগঠিত ও ঘনীভূত হয়েছে ততই সে এক একটি ধাপ এগিয়ে যেতে লাগলো ক্রমপরিণতির দিকে। পরিশেষে সে সমাজ, সভ্যতা, শিক্ষাদীক্ষা, সংস্কৃতির আদি অঙ্কুর বীজ গড়ে তুলেছে তার আত্মসচেতনবোধ প্রসারতা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে। এইভাবে বিবর্তিত হয়ে মানুষ পরবর্তী যে স্তরে এসেছে, তাকেই আমরা চিহ্নিত করে থাকি 'মানবিক স্তর' হিসেবে।

আদিম স্তর থেকে মানবিক স্তরে পৌঁছুনোর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় প্রগতিশীলতার সূচনা। এই প্রগতিশীলতা যতই চরম পর্যায়ের দিকে অগ্রসর হয়েছে, ততই মানুষ তার অর্জিত অভিজ্ঞতাগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য বা আঁকড়ে ধরার জন্য নানা স্থায়ী মাধ্যমের আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে। আদিম পর্যায় থেকে মানবিক পর্যায়ে উত্তরণের সন্ধিক্ষণে যেটুকু প্রগতির চিহ্ন আভাসিত হয়েছিল, তা ছিল নিতান্তই অসংগঠিত এক পরিবর্তনের সূচনা বা পূর্বাভাস মাত্র।

কিন্তু, মানবিক পর্যায়ে এসে মানুষ প্রগতিকে ইচ্ছাকৃতভাবে ও সজ্ঞানভাবে হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করে নেয়। এই পর্যায়ে তার সজ্ঞান ইচ্ছাশক্তির মধ্যে দেখা গেছে অপরিসীম নিষ্ঠা, ধৈর্য, যত্ন, আত্মবিশ্বাস, যুক্তির উদগ্র নেশা। কখনো এইসব খুব স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পেয়েছে আবার কখনো নানা দুর্লঙ্ঘ্য বাধায় প্রতিহত হয়ে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জটিল থেকে জটিলতার পথে ঘুরপাক খেয়ে এগিয়ে গেছে। এই ক্রম পরিণতিতে অবশ্যই কোনো ছেদ নেই, বিরাম নেই।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হোলো, মানবিক স্তরে এসে মানুষ নিজেই বিবর্তিত হয়ে গেছে। যদিও সে আদিম প্রবৃত্তিব ঊর্ধে উঠতে পারেনি, তবুও প্রতিনিয়ত চেষ্টা চলেছে প্রগতিশীলতার পথে আদিম প্রবৃত্তিকে নানাভাবে পরিশুদ্ধ করে এগিয়ে যাওয়ার। এইজন্য সে সর্বদাই সুনির্দিষ্ট উপায়ে শক্তি সঞ্চয়ের জন্য চেষ্টা চালিয়েছে। এইভাবে সে চেষ্টা করে চলেছে বিবর্তনের ধারায় 'মানবিক স্তর' থেকে 'মানসিক' বা 'নৈতিক' স্তরে পেঁছুনোর জন্য। এই গতি-প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে কোনো কোনো দ্রষ্টা ঋষি মনে করেন, মানুষ একদিন তার নানা গুণপনাব সমন্বয়ে 'অতি মানসিক' পর্যায়ে গিয়ে পেঁছুবে এবং এর ফলে পৃথিবীর মাটিতে প্রতিষ্ঠিত হবে এক স্বর্গীয় পরিপূর্ণতা।

কিন্তু যতদিন তা না হচ্ছে, ততদিন মানুষ চেষ্টা করে যাবে তার আদিম প্রবৃত্তিসমূহের উদ্‌গতি সাধনের জন্য। এই কাজের জন্য সে খুঁজে ফিরেছে নানা মাধ্যম, যাব মধ্য দিয়ে সে তার রুচি ও ভাবপ্রবণতাকে এক ঘনীভূত মানবিক পর্যায়ে ধরে রাখতে পারে। এই অভিজ্ঞতা সে বহন করে নিয়ে চলেছে পূর্বসূরীর কাছ থেকে পেয়ে এবং তাকে আরো সমৃদ্ধ করে উত্তর পুরুষের জন্য। এই কাজ করতে গিয়েই মানব ইতিহাসে দেখা দিয়েছে নানারকমের উল্লেখযোগ্য সংগঠিত মাধ্যম যেমন, গৃহ, সামাজিক, ধর্মীয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি।

হাক্‌সলির মতে মানব সমাজের এই অগ্রগতির ফলে মানুষ ক্রমশ আদিম স্তরকে দূরে ফেলে দিয়ে এগিয়ে চলেছে। প্রবৃত্তিকে জয় করে সে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এই এগিয়ে যাওয়ার মূলে শক্তিদান করেছে নানাধরনের সংগঠিত চিন্তাভাবনা ও প্রতিষ্ঠান। মানুষের এই প্রগতিকে শক্তিদান করার পথে শিক্ষাপদ্ধতির অবদান অনস্বীকার্য। শিক্ষা পদ্ধতিই গতিদান করেছে প্রগতিশীলতাকে।

বাগ্‌লের মন্তব্য স্মরণ করে বলা যায়, যদি আমরা এই মহান শিক্ষাপদ্ধতির ধারা দু তিন পুরুষ স্তব্ধ করে দিই, তাহলে দেখা যাবে মানুষ আবার ফিরে গেছে তার আদিম স্তরে।

তবে আমরা এইটুকু নিশ্চয় বলতে পারি, ইতিহাসের গতি সামনের দিকেই মেলা আছে—ঘড়ির কাঁটা উল্টো দিকে ঘোরানোর কোনো কাজ মানবজাতি কোনো দিন আর গ্রহণ করবে না। কেননা, মানুষ জেনেছে, এই এগিয়ে যাওয়াটাই তার মুক্তির প্রাণমন্ত্র, এই তার অনিবার্য ঐতিহাসিক নিয়তি।

আদিম স্তর থেকেই দেখা গেছে এই প্রবণতা, কিভাবে মানুষ তার অর্জিত অভিজ্ঞতাকে ভবিষ্যৎ বংশধরের কাছে সুসংগঠিত উপায়ে পৌঁছে দিতে পারে। এই কাজটি সমাধা করার জন্য সে প্রতিনিয়ত খুঁজে ফিরেছে নানা সংগঠিত মাধ্যম। লক্ষ্যহীন ও পরিকল্পনাহীনভাবে সে একদিন অন্ধ অনুভূতির আবেগে পথ চলছিল কিন্তু কী এক অনির্দেশ্য প্রেরণায় সে অনিবার্যভাবে খুঁজে পায় তার অতি নিকটতম পরিবেশকে। সে খুঁজে পেয়েছে তার গৃহ, পরিজন, স্বজন, গোষ্ঠী, সমাজজীবন ও নানারকমের আচার ব্যবহার। সে তার অর্জিত সমস্ত রকমের অভিজ্ঞতাকে দিতে চেয়েছে স্থায়ী রূপ স্থায়ী আসন।

এই ধরনের অনুসরণ স্পৃহা থেকে সে পেয়েছে সভ্যতার নতুন নতুন সম্পদের সন্ধান। সে আবিষ্কার করেছে নতুন নতুন তত্ত্ব। অপরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছে তার নিজস্ব অর্জিত অভিজ্ঞতাকে। সে খুঁজে পেয়েছে নিজের লব্ধ অভিজ্ঞতার সঙ্গে অপরের অভিজ্ঞতার সাদৃশ্য ও ঐক্য। শেষ পর্যন্ত সে এগিয়ে এসেছে সেইসব অভিজ্ঞতার ফসলকে সুষ্ঠুভাবে স্থায়ীভাবে সংগঠিত ও সুনিয়ন্ত্রিতভাবে ধরে রাখার জন্য মাধ্যম খুঁজে পেতে। আদিম স্তরে তার অনুপ্রেরণা ছিল খুবই সঙ্কীর্ণ এবং একপেশে। কিন্তু, অভিজ্ঞতা যতই অর্জিত হয়েছে, ততই তার গণ্ডী ব্যাপক হতে হতে বিরাটত্বের পরিমণ্ডলে বহুবিস্তৃত হয়ে গেছে। এইভাবে সে তার তত্ত্ব ও অভিজ্ঞতাকে পরিব্যাপ্ত করে দিয়ে নিদারুণ তৃপ্তির আস্বাদ লাভ করেছে। আদিম অভিজ্ঞতা বা প্রবণতার অপ্রয়োজনীয় শাঁস বর্জন করে সম্পূর্ণ এক বৈশিষ্ট্যের পথে, মর্যাদার পথে, স্বাতন্ত্র্য নিয়ে সে এগিয়ে গেছে প্রগতির দিকেই। এই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় মানুষ নিজেই বিবর্তিত হয়ে গেছে অনেকখানি এবং এর

ফলে সে সংগঠিতভাবে তার আহৃত অভিজ্ঞতাকে বিস্তৃত করে দিয়েছে মানবজাতির কৃষ্টি ও সংস্কৃতির মধ্যে।

সংগঠিতভাবে ইস্কুল তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জন্ম নেবার বহুপূর্বেই মানুষ তার নিজস্ব গৃহকেই পেয়েছিল প্রাথমিক ও মূল শিক্ষা নিকেতন হিসেবে। এক একটি পরিবার যে সমস্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করতো, সেই অভিজ্ঞতার ধারা বৈশিষ্ট্যের আকারে হস্তান্তরিত হোতো পরবর্তী বংশধরের কাছে। এইভাবে পারিবারিক আচার ব্যবহার অভিজ্ঞতা শিক্ষা সংস্কৃতির ফসল, পারিবারিক বৈশিষ্ট্য, দায়িত্ববোধ, বিচারবোধ প্রভৃতি গুণগুলি বংশ পরম্পরায় সংক্রমিত হয়ে প্রবাহিত হোতো। এই ধারা সুদূর অতীত কাল থেকে চলে এসেছে।

কিন্তু বিগত শতাব্দী থেকে পৃথিবীর বুকে দেখা দিয়েছে নানা সমাজ ও সভ্যতার জটিল গ্রন্থি। পরিবার ও গৃহকেন্দ্রিক মানবসভ্যতার ভিত্তিভূমি কেঁপে গেছে। যৌথ পরিবারের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির যুগ আর নেই—পরিবর্তে এসেছে গতিশীল অথচ আত্মসর্বস্ব ও বিচ্ছিন্ন এক ধরনের মানসিকতা। কিন্তু তবুও, মানুষের আসল প্রবণতা এইখানেই স্তব্ধ হয়ে যায়নি। মানুষ এই নিদারুণ জটিলতার ভেতর দিয়েই ক্রমশ সমাজমুখীন এবং বিশ্বমুখীন হয়ে উঠেছে। একদিকে অতল জলের আহ্বান, অন্যদিকে সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত তোলপাড় করার অনিবার্য আকর্ষণের মধ্য দিয়ে মানুষ এগিয়ে চলেছে আরো কোনো সংগঠিত অভিজ্ঞতাকে প্রজন্মের হাতে তুলে দেবার জন্য।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের জটিলতার যুগে পৃথিবী যেখানে নিদারুণভাবে এবং সুনিপুণভাবে সংকুচিত, নিজের ঘরে পা রাখার যেখানে মাটি নেই, বাইরে যেখানে মানুষ অবিরত বেখাপ্পা ও অসংলগ্ন, সেখানে সভ্যতার এক সংকটপূর্ণ যুগে সংগঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পরিবার কেন্দ্রিক জীবনভূমির অনেকখানি ফারাক অবশ্যই বাস্তব ঘটনা। অথচ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পারিবারিক যোগসূত্রের বন্ধন ছাড়া শিক্ষা কখনো সম্পূর্ণ হতে পারে না। জন ডিউই প্রমুখ শিক্ষাবিদেরা সেইজন্য বারবার বিদ্যালয়ের সঙ্গে গৃহগত পরিবেশের হৃদ্যতামূলক সম্পর্ক স্থাপনের উপর জোর দিয়েছেন।

## ॥ ২ ॥

## গৃহের ভূমিকা

শিক্ষার্থীর শিক্ষার ব্যাপারে গৃহ সবচেয়ে ক্রিয়াশীল শক্তি, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায়, সংস্কৃতি সম্পন্ন গৃহের সন্তান সন্ততিদের মানসিক গড়ন চলন বলনে বেশ একটা স্বাতন্ত্র্য ধরনের লক্ষিত হয়। গণতান্ত্রিক যুগে এটা লক্ষণীয় যে, যেখানে পূর্বপুরুষের কোনো সংস্কৃতি নেই, এক পুরুষের শিক্ষা আরম্ভ মাত্র, সেখানে শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিত কিছু থাকে না বলে তারা শিক্ষা বিজ্ঞানের ভাষায় "কাঁচামাল" হিসেবে গণ্য হয়।

শিক্ষার পরিবেশের ব্যাপারে গৃহ সবচেয়ে নিকট ও প্রত্যক্ষ পরিবেশের কাজ করে। গৃহের প্রভাব শিক্ষার্থীর শরীর, মন ও ভাবাদর্শ গঠনে সবচেয়ে প্রাথমিক ও অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে বলেই গণতান্ত্রিক যুগে জনসাধারণের নাগরিকত্বের শিক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচিত হতে বাধ্য। গৃহ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সকল শিক্ষাবিদেরাই সমর্থন করে এসেছেন।

তবে বর্তমান যুগ ভীষণ কর্মব্যস্ততার যুগ হওয়ায় মানুষের জীবনধারা এতই বহুমুখী ও জটিল হয়ে গেছে যার ফলে শিক্ষার্থীর পক্ষে আদর্শ গৃহ পরিবেশের সুযোগ সুবিধা পাওয়া খুবই দুষ্কর জিনিস হয়ে গেছে। শিক্ষার গণতন্ত্রীকরণের সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যাপারটি আরো জটিল হয়ে গেছে অর্থনৈতিক কারণে। বর্তমান যুগে শিশুর প্রাথমিক পরিবেশ হিসেবে গৃহকে প্রাথমিক বুনিয়াদ গঠনের প্রারম্ভিক সোপান হিসেবে পাওয়া অনেক ক্ষেত্রেই দুঃসাধ্য ব্যাপার। তাই, গৃহেই শিক্ষার্থীর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হলে ভালো হয় একথা বলার মধ্যে অনেক ঝুঁকিও আছে। অনেক কর্মব্যস্ত অভিভাবকদের বাধ্য হয়ে শিশু সন্তানদের রাখতে হয় নার্সারি কিণ্ডারগার্টেনে।

রুশো, লক, পেষ্টালজী, ফ্রোয়েবেল, মন্তেসরী, মিল প্রমুখ শিক্ষাবিদেরা গৃহগত পরিবেশের তাৎপর্য স্বীকার করেও মনে করেছেন যে, গৃহই একমাত্র শিক্ষার প্রথম সোপান একথা মেনে নেওয়া যায় না। এঁরা সেইজন্য শিশুকেই শিক্ষার প্রথম উপাদান হিসেবে বেছে নিয়েছেন। শিশুর প্রথম মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিভূমির উপর শিক্ষার ইমারত গঠনের জন্য এঁরা নানা যুক্তিপূর্ণ নির্দেশ দান করেছেন, যার অনেককিছু সমর্থনযোগ্য আবার অনেককিছু সমর্থন যোগ্য নয়।

তবে এঁদের শিক্ষানীতি থেকে সার কথা যা আমরা পাই, সেই অনুযায়ী বলা যায়, শিশুর শিক্ষা মূলত হবে পরিবেশকেন্দ্রিক, পুস্তককেন্দ্রিক নয়। এই পরিবেশ মানে তার গৃহ, সমাজ, ইস্কুল ইত্যাদি পরিবেষ্টনীর সামগ্রিক ফলাফলকেই বোঝায়।

বিদ্যালয়ই এযুগের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য, স্বাভাবিক, স্বচ্ছন্দ ও সুন্দর পরিবেশ হিসেবে গণ্য হতে পারে। বিদ্যালয়ের আবেষ্টনীতে একটা ঘরোয়া পরিমণ্ডল সৃষ্টি করার তাগিদেই ফ্রোয়েবেল, মন্তেসরী প্রমুখ শিক্ষাবিদেরা কিণ্ডারগার্টেন পরিকল্পনার কথা বলেছেন। আমাদের দেশে কিণ্ডারগার্টেন জাতীয় ঘরোয়া পরিমণ্ডলের ইস্কুল কিছু কিছু শিল্পসমৃদ্ধ শহরে স্থাপিত হলেও দেশের ব্যাপক ক্ষেত্রে এর কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেই। আমাদের দেশে জনগণস্তরে গৃহই তার হাজার রকমের ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও শিক্ষার্থীর প্রাথমিক স্তরের সবচেয়ে নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য এবং ক্রিয়াশীল শক্তি হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে।

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা পর্যন্ত পর্যায়ে অধিকাংশ শিক্ষার্থীর যোগাযোগ থাকে গৃহের সঙ্গেই প্রত্যক্ষভাবে। বিদ্যালয়ের পরিবেশের উপর সমধিক গুরুত্ব আসায় অনেক বিদ্যালয়কে ঘরোয়া আবেষ্টনীর মুখমণ্ডল দেওয়ার জন্য চেষ্টা চলেছে। প্রকৃতপক্ষে বিদ্যালয় শুধু ঘরোয়া পরিমণ্ডলের প্রতিচ্ছবি হবে তা নয়, তাকে হতে হবে অনেকখানি সমাজেরই কৃত্রিম প্রতিফলন। পাসিনানের উক্তি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন—'বিদ্যালয় অবশ্যই হবে কৃত্রিম সমাজের মতো। তবে এই অর্থে যে, এর মধ্যে বাইরের সমাজের প্রকৃত প্রতিফলন ঘটবে অর্থাৎ যা-কিছু শ্রেষ্ঠ এবং প্রাণবন্ত তারই প্রতিফলন পড়বে এখানে।' বিদ্যালয়ের মধ্যে সমাজের কৃত্রিম প্রতিফলন মানে আসলে স্বাভাবিকভাবে সমাজেরই নানা কর্মবৃত্তিরই প্রকাশনা। এখানে কৃত্রিম মানে যান্ত্রিক ধরনের ব্যাপার নয়। মহাত্মা গান্ধী মনে করেছিলেন, শিক্ষার ব্যাপারটি বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরের আবদ্ধ ব্যাপার নয়, বরং অনেকখানি আরো বাইরের ব্যাপার।

শিক্ষায় গৃহগত পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে আরো কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি। শিক্ষাবিদ্ রেমণ্ট বলেছিলেন, শিশুর জীবনে প্রথম ছয় বৎসর গৃহের প্রভাবই তাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করে। সেইজন্য তিনি বলেছিলেন যে, এই সময়কালটুকুতে শিশুকে দিতে হবে গৃহের মতোন স্বাভাবিক

ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ পরিবেশ। এর ভেতর সে স্বাধীনভাবে অবাধ আনন্দের মধ্য দিয়ে লালিত পালিত হলে ভালো হয়। প্রাক্ প্রাথমিক পর্যায়ে গৃহের মতন স্বাভাবিক পরিবেশ গড়ে তোলার কথা তিনি বলেছেন এইজন্যেই। প্রাথমিক পর্যায়েও এই ধারা অব্যাহত রাখার প্রয়োজনীয়তা তিনি স্বীকার করেছেন। সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক নানা জটিলতার জন্য আমরা আমাদের দেশে শিক্ষার্থীর বুনিয়াদ গঠনে গৃহের মতোন স্বাভাবিক ও সুন্দর পরিবেশ বিদ্যালয়ে দিতে পারি না বলেই শিশুর **"পারিবারিক গৃহই"** শেষ পর্যন্ত তার লীলা নিকেতন বা আবাসস্থলের কাজ করে থাকে। আমাদের দেশে জনগণস্তরে প্রত্যেক গৃহ যাতে সুন্দর, সুখকর এবং স্বাস্থ্যপ্রদ হতে পারে সেজন্য অর্থনৈতিক কর্মসূচীর সঙ্গে গণশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা খুবই জরুরি। প্রত্যেক পরিবার যদি এক একটা স্বয়ং নির্ধারিত স্ব-নির্ভর বিদ্যানিকেতন হয়ে উঠতে পারে, তার চেয়ে গৌরব ও শ্লাঘার বিষয় আর কিছু থাকতে পারে না।

মনোবিজ্ঞানী অ্যাড্‌লার বলেছিলেন, শিক্ষার্থী তার জীবনের প্রথম তিনটি বছরে যতরকমের আচার আচরণের মৌল পদ্ধতি রপ্ত করে নেয়—এই জিনিসটি হয়ে যায় তার জীবনের প্যাটার্ণ গড়ে তোলার প্রাথমিক দিক। পরবর্তীকালে এইসব আচার আচরণের ধাঁচের পরিবর্তন বা সংশোধন করা কঠিন হয়। প্রকৃতপক্ষে সে পরবর্তী জীবনে প্রথম জীবনের ভাবভাবনা আচার ব্যবহারের মৌল ধাঁচে নিজের অভিজ্ঞতা আহরণ করে নেয়। প্রথম জীবনের স্মৃতি ও ধারণা এতই বদ্ধমূল হয়ে যায় যে সে আর তাকে মুছে ফেলতে পারে না।

আমাদের দেশ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনেকখানি পশ্চাৎপদ অথচ উন্নয়নশীল। শিশুদের প্রাথমিক বুনিয়াদ গড়ে তোলার ব্যাপারে আমাদের জনচেতনা ও রাষ্ট্রচেতনা অনেকখানি উদাসীন। শিশু শিক্ষার্থীর চাহিদা ও প্রয়োজন এবং তাদের মনস্তাত্ত্বিক ক্ষুধা অনুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনে আমরা এখনো বিমুখ। এইসব কারণে গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের প্রাথমিক পর্বে প্রাক্-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার সঙ্গে শিক্ষার্থীর গৃহগত পরিবেশের উপযুক্ত সংযোগ সাধনে অনেকবেশি গুরুত্ব দেওয়া দরকার আছে।

শিক্ষার্থীর দেহগঠন, মানসিক ক্ষুধার পরিতৃপ্তি, সমাজসম্মত মনগঠন প্রভৃতি কাজে অভিভাবকদের ব্যক্তিগত যত্নের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ।

এই সময়কাল শিক্ষার্থীর পক্ষে খুবই নরম পর্যায়ের। এই সময়েই তার মধ্যে ভালোবাসা-দয়াদাক্ষিণ্য স্নেহপ্রীতি প্রভৃতি সুকুমার গুণাবলী তথা হৃদয়বৃত্তির উন্মেষ হয়ে থাকে। অথচ, তারা যদি এ সময়ে প্রতি পদে পদে রূঢ় প্রত্যাখ্যান ও কঠোর ব্যবহার পায়, কদর্য পরিবেশের মধ্যে হাবুডাবু খায়, তাহলে তারা যে-সব মৌল পদ্ধতিতে গ্রথিত হয়ে যায় তা আর পরবর্তীকালে সংশোধন করা কঠিন হয়ে পড়ে। অথচ যত রকমের দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক সম্পদ আছে তা শিক্ষার্থীর মধ্যে সযত্নে সঞ্চারিত করার উপযুক্ত কাল তার এই শৈশবকাল। শিশু যেন এই উন্মেষ পর্বে একান্তই এক চারাগাছ। যত্ন পরিচর্যা যেমন নেওয়া হবে তেমনি হবে তার বৃদ্ধি ও উৎকর্ষ। যদি তাদের অবহেলা করা হয়, অস্বাস্থ্যকর শারীরিক ও মানসিক পরিমণ্ডলে যদি তাদের অবস্থান হয়, তাহলে তাদের উন্মেষসাধনে বিকৃতি দেখা দিতে বাধ্য। ফলে, দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক কদর্য মানসিকতার অধিকারী হয়ে পড়ে অবশ্যম্ভাবীভাবে।

রেমণ্ট বলেছেন দুইজন শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে একই ধরনের সুযোগ সুবিধা পেয়েও পৃথক ধরনের গৃহগত পরিবেশের জন্য কথাবার্তায় চালচলনে আচারে অভ্যাসে নৈতিক ও মানসিক দিক দিয়ে পৃথক ধরনের হয়ে যায়। সুতরাং, গৃহের পরিবেশ শিক্ষার্থীর চরিত্রের ওপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে ফেলে। বিদ্যালয়ের উন্নতর পরিবেশের সাহায্য পেয়েও গৃহগত পরিবেশের অর্জিত গুণাবলী থেকে মুক্ত হওয়া কঠিন হয়। অনেক সময় দেখা গেছে, শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ের ভাবধারা বহন করে নিয়ে এসেছে গৃহে। অনেক সময় এমনও দেখা যায় গৃহ ও বিদ্যালয়ের পরিবেশের পার্থক্য শিক্ষার্থীর মধ্যে সুস্থ ও স্বাভাবিক প্রভাবের পরিবর্তে তার মধ্যে এনে দিয়েছে পরিবেশের প্রতি উপযোগিতা করার অক্ষমতা এবং একধরনের মানসিক অসংলগ্নতা ও বিকৃতি। খাপ খাইয়ে নেবার উপযোজন ক্ষমতার অভাব থেকে এই বিকলন।

মায়ের কোলে শিশু মানুষ হয় প্রথমেই। তাই, মায়ের প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়ে তার ব্যক্তিত্বের উপরে। সরলতা, নির্বোধ্যতা, পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতির মতো সুন্দর সুন্দর উপাদানগুলি শিশুর মনে শৈশবেই খুব সুন্দরভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। এইসব সুকুমার বৃত্তিগুলি ফুটিয়ে তোলার জন্য যদি খুব দরদী মনোভাব দেখানো হয় এবং সেই মতো সুযোগ সুবিধা ও পথ নির্দেশের ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ জীবনও খুব সুন্দরভাবে গড়ে উঠতে পারে।

যে সমাজে পরস্পর বিরোধী ভাবধারারই বেশি আকর্ষণ-বিকর্ষণ কেন্দ্র, সেই সমাজের মধ্যে শিশুর মনে সংগ্রামশীলতার বীজ এমনভাবে উপ্ত করে দিতে হয় যার ফলে সে ভবিষ্যৎ জীবনে সংগ্রাম করে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার মতো মানসিক আদল পেতে পারে। পরস্পর বিরোধী ভাবধারার মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণীয়, কোন্‌টি বর্জনীয়· বুঝবার জন্য যেমন ধরনের শক্তি সামর্থের প্রয়োজন, এইবকম একটা মানসিক প্রস্তুতি শৈশবকাল থেকে যদি নিতে পারে, তাহলে পরবর্তীকালে হতাশা ও মানসিক যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পাবার মতোন ক্ষমতা সে নিজেব মধ্যে গড়ে তুলতে পারে অনেকখানি।

শিশু-সন্তানের উপর মা অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। মা যেন একাই একটা 'ইনস্‌টিটিউশন'। কিন্তু, আবার যদি দেখা যায়, মায়ের মধ্যেই গুণাবলীব অভাব, স্নেহ, মায়া, দয়া ভালোবাসা, করুণা, দাক্ষিণ্য ইত্যাদি সংগুণের ক্ষেত্রে মায়ের মধ্যে একটা খাকৃতি যদি দেখা যায়, তাহলে শিশু-সন্তান সেইসব মহৎ গুণাবলী থেকে বঞ্চিত হয়ে যেতে পারে। হাজার হোক মা তো আদিম এবং প্রথম শিক্ষক, হাজার গণ্ডা শিক্ষকের চেয়ে তাঁর প্রভাব অনেক বেশি জীবন্ত ও ক্রিয়াশীল। কথায় আছে, যে হাত দোলনা দোলায়, সেই হাতই পৃথিবীকে শাসন করে। মায়ের প্রভাব জগতের কত মনীষীর জীবনে অসীম প্রভাব বিস্তার করেছে তার শেষ নেই। মায়ের প্রভাব ছাড়াও, শিশু শিক্ষার্থীর মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে তার নিকটতম সঙ্গী, বন্ধুবান্ধব ও পরিবেশ। ভালো-মন্দ যা-কিছু সবই তার স্বভাবেব অংশ হয়ে যায়। এই স্বভাব একবার মুদ্রিত হয়ে গেলে সে রং যেন আর মোছে না। শিশু তার স্বভাবধর্ম অনুযায়ী সংবেদনশীলন ও অনুকরণ প্রিয়। কথাবার্তায়, চলনে বলনে সে ভালো মন্দ গুণাবলী অতি সহজেই অনুকরণ করে থাকে। শিশুর নিকটতম পরিবেশ এমন সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে সুন্দর হবে যা থেকে সে যেন ফলপ্রসূ উপাদান আহরণ করতে পারে। এজন্য মা বাবা অভিভাবকদেরও একটা শিক্ষা থাকা দরকার। একটি আবাসিক বা নার্সারী বিদ্যালয়ের চেয়ে আদর্শ পরিবার অনেকবেশি শিক্ষার উপযুক্ত স্থান।

শিক্ষার সর্বপ্রকার বাঁধাধরা সুযোগ আমরা গৃহের আবেষ্টনীতে দিতে পারিনা বলেই প্রয়োজন হয় সংগঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের। বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, প্রাক্‌প্রাথমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের চেয়ে শিক্ষিকার

প্রভাব অনেকবেশি ফলপ্রদ হয়। শিশুকে সত্যিকার উচ্ছল, উজ্জ্বল ও প্রাণীন ব্যক্তিত্বের অধিকারী করে গড়ে তুলতে হলে তার শারীরিক-মানসিক-আত্মিক চাহিদার দিকে অনেক বেশী দরদী মন নিয়ে সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হতে হয়। দেখতে হয়, শিশুর স্নায়ুর উপর যেন অযথা কোনো জোরজবরদস্তি যেন না হয়। শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত প্রচেষ্টা যাতে উৎসাহিত হতে পারে, সেজন্য দরকার সতর্ক পথনির্দেশ। তার স্বাধীনতা যাতে নিশ্চিত জীবনের সার্থকতার দিকে সদর্থকভাবে যেতে পারে সেজন্য পর্যবেক্ষণ ও পথনির্দেশদানের মধ্যে বিজ্ঞানসম্মত ভাবভাবনা থাকা দরকার। এই কাজে অবশ্যই শিক্ষিকারা অনেক বেশি সংবেদনশীল ও যত্নশীল। খুব বেশি রকমের খুঁটিনাটি বিষয়ে পর্যবেক্ষণের অসাধারণ ক্ষমতা এবং স্নেহ মায়া মমতা দরদ প্রভৃতি সূক্ষ্ম গুণাবলীর সার্থকতম প্রকাশে শিক্ষিকাদের ভূমিকার তুলনা নেই।

রুশো বলেছিলেন, প্রকৃতির হাত থেকে যা-কিছু আসে তা অতি নিষ্কলুষ সুন্দর এবং পবিত্র। কিন্তু, মানুষের হাতে সমাজেব হাতে পড়ে তা কলুষিত হতে বেশি সময় লাগে না। শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ও প্রাণোচ্ছল উপাদানের প্রয়োজনীযতা সব চেয়ে বেশি। শিশুকে তুলনা করা যায় সে যেন বইয়ের একটি পাতা আর শিক্ষিকা যেন বইয়ের প্রত্যেক পাতার যত্ন নেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। রুশো তাঁর 'এমিল'-কে মানুষ করতে চেয়েছিলেন তার প্রবণতার দিকে লক্ষ্য রেখেই। রুশোর শিক্ষানীতি ভাবের শিক্ষানীতি। তিনি শিশুর স্বাভাবিক প্রবণতা, প্রবৃত্তি ও ভাবধারা, কর্মশক্তি ইত্যাদির স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল প্রকাশকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তাঁর মতে মানুষ তার জন্মমুহূর্ত থেকেই নাগরিক অধিকারের দাবীদার। তিনি চেয়েছিলেন ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার আইনের মতো শিশুর অধিকারের জন্য বিধিবদ্ধ আইনের প্রবর্তন। তাঁর নীতি অনুযায়ী শিশুব চাহিদামাফিক বিকাশসাধনের সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা দানের অধিকার হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট সমাজতান্ত্রিক নীতি।

বর্তমান যুগ শিশু শতাব্দীর যুগ। এই যুগে শিশুরা যাতে সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ ও উৎসাহ-উদ্দীপনায় শিক্ষা পেতে পারে সেজন্য প্রয়োজন অনুচ্ছল সামাজিক শর্ত। সমাজকেই গ্রহণ করতে হবে সেই দায়িত্ব।

অনেক কিছু জানা, বলা বা চিন্তা করানো শেখানোর চেয়ে কতকগুলি প্রয়োজনীয় মূল্যবান সাধারণ নিয়ম শেখানোর জন্য তাদের তৈরি করা উচিত। শিক্ষার কলাকৌশলকে বিন্যাস করতে হবে সেইভাবে। মনে রাখতে হবে, শিশুর শৈশবকাল তার যুক্তিবোধ গড়ে ওঠার প্রাথমিক সোপান। তার ইন্দ্রিয়বোধকে এমনভাবে কাজে লাগাতে হবে যা তার স্বভাবধর্মের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে চলে।

রুশো এইভাবে শিক্ষার নীতি নির্ধারণ করে সর্বশেষে একটি মোদ্দা কথা বলেছেন খুব সুন্দরভাবে। শিশুরা আসলে অভ্যাস করবে একটি মাত্র অভ্যাস তা হচ্ছে কোন অভ্যাসই নয়। শিশুর মনকে তিনি নির্লিপ্ত, নিরাসক্ত, উৎসুক ও কৌতুকপ্রিয় করে তুলতে চেয়েছিলেন। কোনো বাঁধাধরা কৃত্রিম অভ্যাসের দাস হিসেবে তাকে গড়ে তোলার তিনি একান্তই বিরোধী। তাঁর মতে, শিশু অনবরত শিক্ষাপ্রদ অভিজ্ঞতা গ্রহণ করুক প্রকৃতির কাছ থেকে, মানুষের কাছ থেকে, বস্তুর কাছ থেকে। কিন্তু এইসব উপাদানের ভেতর থেকে পরিষ্কার একটা ধ্যানধারণা, অভ্যাস বা বাঁধাধরা যুক্তি গ্রহণ করার মতো সময় তার হয়নি। অতএব চিরকালীন অভ্যাসের দাস হতে তাকে দেওয়া যায় না। সে খোলা চোখে খোলা মনে দুনিয়াকে দেখুক, চিনুক, জানুক।

রবীন্দ্রনাথও এই ধরনের শিক্ষাদর্শের কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, তিনি শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসেবে মানসিক স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন, যে মানসিক স্বাধীনতা কেবলমাত্র স্বাধীন স্বতঃবৃত্ততার পথ দিয়েই অর্জন করা যায়। পূর্ণতম স্বাধীনতা যা পূর্ণতম সম্পর্কের সুষমায় অধিষ্ঠান করে থাকে তাকে আমরা এই পৃথিবীতে জানতে পারি না, অনুভব করতে পারি। সেইজন্য তিনি তাঁর শিক্ষায়তনের মধ্যে স্বাধীনতার অপরিহার্য, মৌল এবং অসামান্য দিককেই মূল্য দিয়ে গেছেন। বলেছেন, স্বাধীনতার তিনটি দিক, মনের স্বাধীনতা, হৃদয়ের স্বাধীনতা আর ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা। নিছক জ্ঞানার্জন নয়, 'হওয়া'র মধ্যেই আছে মানুষের জীবনের প্রকৃত সার্থকতা। রুশোও তাই চেয়েছেন এবং সেইজন্য শিশু শিক্ষার্থীকে তিনি মনের স্বাধীনতা, হৃদয়ের স্বাধীনতা ও

ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা দিয়ে তাকে তার নিগূঢ় সত্তার পরিণতির দিকে প্রস্তুত করতে চেয়েছেন।[১৪]

## ॥ ৩ ॥

## বিদ্যালয়ের ভূমিকা

গ্রীক শব্দ 'সখোল' থেকে ইস্কুল কথাটির উৎপত্তি হয়েছে বলে পণ্ডিতদের ধারণা। অবসর সময়ে আনন্দ উপভোগ করার জন্য অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে তাকে ঘিরে একধরনের আলোচনা সভা হোতো। এই অঙ্কুরবীজ থেকে একদিন সংগঠিতভাবে ইস্কুলের উৎপত্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রাচীনকালে ভারতের ঋষিরাও শিক্ষার্থীদের দিয়ে সমিধ সংগ্রহ করে তপোবনে অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে ঘৃতাহুতি দিয়ে মন্ত্র আবৃত্তি করেছিলেন—'ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি'। গুরুকে ঘিরে একদল শিক্ষার্থী যে ধরনের জীবন-যাপন করতেন তা ছিল আসলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার সাধনা। অধ্যয়নই ছিল সেদিন তপস্যা।

পৃথিবীতে অতি আদিমকালে একদল বিস্ময়কব মানুষের মধ্যে দেখা দিয়েছিল শিক্ষার আলোকশিখা। বিবর্তনের পর্যায়ে গড়ে উঠেছে সংগঠিত সমাজ ও যৌথ প্রতিষ্ঠান। মানুষ আদিকালে নৈসর্গিক, ব্যক্তিগত ও সমাজগত অনেক সমস্যার মুখোমুখি হয়ে তা সমাধানের জন্য পথ হাতড়িয়েছিল। অনেক সময় সেইসব সমস্যার সমাধানের পথ কিছু না কিছু খুঁজে পেয়ে শেষ পর্যন্ত অলৌকিক তত্ত্বের কাছে তার একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছিল। আসলে আদিকালের শিক্ষায় ছিল ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়ে অপরের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে একটা কিছু তত্ত্বের আলোকে সবকিছু সমাধানের জন্য হাপিত্যেস করা। ঘটনাক্রমে অনেক জিনিস তারা জানতে চেয়েছিল। সেগুলি জানা ও আদান-প্রদান করার ব্যাপার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল প্রাসঙ্গিক আলাপ-আলোচনার বস্তু। জীবনের

১৪। ষ্টীফেনসন বলেছিলেন—গৃহ মানে সেই প্রিয়তম আবাস-ভূমি যেখানে চিরপরিচিত মুখগুলি দেখতে পাওয়া যায়। গৃহ তাই শিশুর পক্ষে অতি প্রিয় আনন্দের লীলা নিকেতন। পাইনের মতে, গৃহ, অতি প্রিয় জিনিস, তার চেয়ে সুখের জায়গা আর নেই। গৃহের প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা স্বীকার করে নিয়েই মন্তেসরী ও ফ্রোয়েবেলের কিণ্ডারগার্টেন পরিকল্পনা। বিদ্যালয়কেও আমরা যতবেশী ঘরোয়া পরিমণ্ডল করে গড়ে তুলতে পারি ততই মঙ্গল। এর অর্থ এই নয়, শিক্ষার্থীদের ঘরকুনো বানানো।

স্তরে যখন কোনো জটিলতা দেখা দেয়নি, তখন এইভাবে অলিখিত প্রাসঙ্গিক আলাপচারিতার মধ্য দিয়েই সেদিন সংগঠিত শিক্ষা ও ধর্ম প্রতিষ্ঠানের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল।

অলৌকিক তত্ত্বের আলোকে সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে জন্ম দিয়েছিল ধর্মগত বিশ্বাসের ভাব ও ভাবনা এবং শেষপর্যন্ত ধর্মীয় অনুশাসনের ভিত্তিতে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান জাতীয় সংগঠনকে। ভাবীকালের জন্য অভিজ্ঞতাকে বজায় রাখার জন্য আশ্রয় নিয়েছিল নানা ধরনের আশ্চর্য প্রতীকের এবং আচার ব্যবহার অনুশাসনের। এইসব প্রচেষ্টার নীট ফল এই ছিল, আদিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ছিল প্রায় সমার্থক। ধর্মীয় মাধ্যমই ছিল অভিজ্ঞতা সঞ্চারণের সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম। ক্রমশ ধর্ম একটা বিশেষ ধরনের আদল নিয়ে এতই ক্রিয়াশীল ও সুসংগঠিত হয়ে উঠেছিল যে, এর মধ্য দিয়েই মানুষের সবকিছু প্রচেষ্টা নিয়ন্ত্রিত হতে লাগলো। পৌরাণিক ইতিবৃত্ত সহ পরবর্তীকালের ইতিহাসের ধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এইসব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান শেষ পর্যন্ত এতই প্রভাবশালী, প্রাণবন্ত ও ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছিল যার ফলে শিক্ষার সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক একেবারে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল। ভারতে হিন্দুযুগেই হোক আর পাশ্চাত্য দেশে মধ্য যুগেই হোক, প্রকৃতপক্ষে মন্দির বা গীর্জার প্রভাব এতই সুদূরপ্রসারী দেখা গেছে যে, শিক্ষার ক্ষেত্রে এর দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব দারুণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অন্য কোনো প্রভাব এই ক্ষেত্রে তেমন কার্যকরী হতে পারেনি। আধুনিককালে রাষ্ট্রীয় আদর্শই প্রধান হয়ে উঠেছে। ধর্মীয় কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণের উপর রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও নির্দেশ অনেক বেশি দেখা দিয়েছে আধুনিক যুগে। ফলে, শিক্ষার ক্ষেত্রে ধর্মের নিরঙ্কুশ প্রভাব এখন ক্ষীয়মান। প্রাচীনকালের শিক্ষায় দেখা গেছে, জীবনের সর্বস্তরেই ধর্মের একচ্ছত্র প্রভাব প্রতিপত্তি। পৌরাণিক ও মধ্যযুগে তাই দেখা যায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর ধর্মীয় আদর্শের নিদারুণ প্রভাব। আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের যুগে ধর্মীয় আদর্শ ক্ষীয়মান হয়ে গিয়ে রাষ্ট্রীয় আদর্শ অনেকবেশি ক্রিয়াশীল হয়েছে তবুও কোনো কোনো দেশে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণকেও প্রভাবান্বিত করে যাচ্ছে ধর্মীয় আদর্শ।

আধুনিক যুগে শিক্ষার অন্যতম সুসংগঠিত প্রতিষ্ঠান হোলো বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয় বর্তমান যুগে নিছক পারিবারিক বা ব্যক্তিগত বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান না হয়ে একেবারে সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং রাষ্ট্রীয়

আদর্শের নিয়ন্ত্রণে বা নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত হলেও তার প্রভাব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এর উপর এসে পড়েছে।

আধুনিক বিদ্যালয়ের যুগ-লক্ষণ চিহ্নিত করে তার গতিপ্রকৃতি নির্দেশ করতে গিয়ে বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্ পার্সিনান বলেছেন, বিদ্যালয় যথার্থ অর্থেই সমাজের অনুকরণ। এর মাধ্যমে বাইরের জগতের যতোরকমের সমস্যা ও ভাবনা আছে তা জানতে পারা যায় এবং তার সমাধানের পথ পাওয়া যায়। বিদ্যালয়ের মাধ্যমে জাগতিক সমস্যার নিয়ম, নীতি ও কলাকৌশল অবহিত হয়ে শিক্ষার্থী আয়ও করতে পারে এমন এক শক্তি, যা দিয়ে সে সমাজজীবনে বসবাস করা বা বেঁচে থাকার তাগিতে প্রাণ প্রেরণা পেতে পারে। মানুষের যা সর্বোৎকৃষ্ট ভাব ও আদর্শ আছে, বিদ্যালয়ের মধ্যেই তা প্রকাশিত হবে। পার্সিনান এইভাবে দেখিয়েছেন যে, প্রকৃত বিদ্যালয় এক অর্থে একধরনের কৃত্রিম সমাজ। এই কৃত্রিম সমাজে বাইরের জগতের যাবতীয় সমস্যা প্রতিফলিত হবে। এর মধ্য দিয়ে সমাজের যা-কিছু শ্রেষ্ঠ উপাদান আছে তা ফুটে উঠবে। যা-কিছু প্রাণবন্ত আছে তাকেই প্রকাশ করবে এই বিদ্যালয়।

অধ্যাপক জন ডিউই পার্সিনানের মতো বিদ্যালয়কে সমাজেরই অঙ্গ বা সমাজের প্রতিচ্ছবি হিসেবে গণ্য করেছেন। তিনিও দেখিয়েছেন, বিদ্যালয় আর সমাজ কখনো পরস্পর বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়, একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পৃক্ত। সমাজের যা-কিছু সম্পদ বা ভাবধারা তাই প্রতিফলিত হবে বিদ্যালয়ের মধ্যে। এইভাবে বিদ্যালয় ও সমাজের বহিরঙ্গের পার্থক্য সঙ্কুচিত হয়ে বিদ্যালয় ও সমাজ হয়ে উঠবে একাত্ম। তিনি দেখিয়েছেন, বর্তমান যুগে বিদ্যালয় নিজেদের পরিবার, সমাজ রাষ্ট্র ও বিশ্বের নানা মতাদর্শ ও ভাবধারার মূলতত্ত্বকে এমনভাবে গ্রহণ করেছে, যার ফলে বিদ্যালয় প্রকৃতপক্ষে মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের সুনির্বাচিত ও সুসংগঠিত কর্মপীঠ ও তীর্থক্ষেত্র হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে।[১৫]

১৫। বিদ্যালয় ও গৃহের মধ্যে ব্যবধান যতদিন বজায় থাকবে ততদিন পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের সাধনা বাধাপ্রাপ্ত হতে বাধ্য। সেই অসুবিধার কথা বিবেচনা করে বর্তমান যুগের বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের যৌথ ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা বারেবারে ঘোষণা করা হয়। শিক্ষাবিদ্ ও অভিভাবকদের খবরদারী নয়, পরস্পরের আন্তরিক সহযোগিতাই শিক্ষার কাজকে ফলপ্রসূ করতে পারে। শিক্ষার্থীর সুবিধে অসুবিধের দিকে তার চাহিদা ও প্রতিশ্রুতির দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখার দায়িত্ব শিক্ষক ও অভিভাবক উভয়েরই। উভয়কেই শিক্ষার

আদর্শ বিদ্যালয়ের কাজ হবে শিক্ষার্থীর মনে বুদ্ধিদীপ্ত অত্যুজ্জ্বল আদর্শ গেঁথে দেওয়া। এই কাজ এমন সার্থকভাবে করতে হবে যার ফলে সে যেন পরবর্তী জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রেও সেই আদর্শ বহন করে নিয়ে যেতে পারে। সেই অনুযায়ী মৌলিক কাঠামো গঠন করে জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে অত্যুজ্জ্বল আদর্শের প্রতিনিধি হতে পারে। এই দিকটি লক্ষ্য রেখেই পার্সিনান শিক্ষার নীতি নির্দেশ করে বলেছেন—"বিদ্যালয় জীবনে যে আদর্শ, ভাবধারা, মূল্যবোধ, শৃঙ্খলা ইত্যাদি শিক্ষা নেবে, তাকেই যেন শিক্ষার্থী তার ব্যবহার ও অভ্যাসের মধ্যে ধরে রাখতে জানবে স্বাভাবিকভাবে।" এই প্রসঙ্গে হর্ণীর মন্তব্য স্মরণযোগ্য। তিনি বলেছেন—'শিক্ষা আসলে শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে সজ্ঞানভাবে সমৃদ্ধ ব্যক্তিরই উন্নত ধরনের উপযোজনা এই শক্তি সে ব্যবহার করবে তার বুদ্ধিগত, ভাবগত ও ঐচ্ছিক অভিজ্ঞতার ভেতর।'

বিদ্যালয়ের উপযোগিতার কথা শিক্ষাবিদ্‌রা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেও শিক্ষার্থীর জীবনে গৃহগত প্রভাবের কথা আদৌ অস্বীকার করেন নি। বিদ্যালয় জীবনে অনেক কিছু আয়ত্ত করেও গৃহগত পরিবেশের প্রভাবে শিক্ষার্থী অনেককিছু হারিয়ে ফেলতে পারে আবার পরিবেশের গুণে সেইসব বিদ্যালয় অর্জিত গুণের সম্প্রসারণশীলতা লাভ করতে পারে। অনেক আবাসিক বিদ্যালয় গড়ে উঠলেও দেখা গেছে, শিক্ষার্থীর মন থেকে গৃহগত পরিবেশে অর্জিত মূল্যবোধ কিছুতেই মুছে যায় না। এইসব কারণে বিশেষ যত্ন নিয়ে দেখতে হবে যাতে বিদ্যালয়, গৃহ এবং বৃহত্তর সমাজের পরিবেশের অর্জিত মূল্যবোধ শিক্ষার্থীর মনে যথার্থভাবে গ্রথিত হয়। সদর্থক দিকটির উপর সেইজন্য নজর দিতে হয় বেশি করে।

সমস্যা সমাধানের জন্য সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে দিতে হবে। বিদ্যালয়ে স্থান সংকুলান হয় না, অন্যদিকে শিক্ষার্থীর সংখ্যাধিক্য ভীড়, ব্যক্তিগত মনোযোগ দেবার সুযোগ-সুবিধে কম থাকায় অনেক সময় শিক্ষার্থীদের প্রকৃত চাহিদা ও তার সমস্যাগুলি অনুধাবন করা যায় না। অথচ এই ত্রুটি থাকলে শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে এক দারুণ ফাঁক থেকে যায়। সামাজিকভাবে বা যৌথভাবে যেসব কাজ হয়, সেগুলি ব্যক্তিপর্যায়ে কিরকম প্রতিবেদন সৃষ্টি করছে তা তলিয়ে দেখে সেইদিকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া দরকার আছে। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে, আমাদের দেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থায়, শিক্ষার্থীর দিকে ব্যক্তিগত নজর দেওয়া সম্ভব হয় না। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর আনুপাতিক হারও আমাদের দেশে যথাযথ মানের নয়। এইজন্য এই আনুপাতিক হার নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। ছোটো ছোটো গোষ্ঠীর উপর শিক্ষকের আনুপাতিক বরাদ্দ শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত যত্ন নেবার পক্ষে অনেকখানি উপযুক্ত হতে পারে।

একথা অনস্বীকার্য যে শিক্ষাথার ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক সম্পদ বা মানসিকতা গড়ে তোলার কাজে বিত্থালয়ের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। ব্যক্তিগত ভাবসম্পদের বিকাশ সাধনের জন্য বিত্থালয়ের শিক্ষাদানের মধ্যে এমন মাধ্যম সৃষ্টি করতে হবে যার যথার্থ চর্চার ফলে শিক্ষার্থী উপকৃত হতে পারে। সমাজের যৌথ প্রচেষ্টার ফলে অর্জিত অভিজ্ঞতাকে সুসংগঠিতভাবে বাঁচিয়ে রাখতে পারে বিত্থালয়। সাধারণত এই দুরূহ কাজটি করে থাকে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আদিমকালে মানুষের ভাবধারা ও কৃষ্টির আদান-প্রদানের যখন কোনো নির্দিষ্ট মাধ্যম ছিল না, সে সময় সে পরোক্ষভাবে ভাবধারার আদানপ্রদান করে শিক্ষার কৌশলগুলি পরবর্তী বংশধরদের হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হোতো। কিন্তু, সমাজ যখন ক্রমশ এগিয়ে গেল, সুসংগঠিত হোলো, তখন দেখা দিল সুসংগঠিত শিক্ষার মাধ্যম। বিত্থালয় কালক্রমে সেই প্রত্যক্ষ মাধ্যমের ভূমিকায় অগ্রণী হয়েছে।

ধর্ম ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্রমশ সমাজ ও যুগের চাহিদা অনুযায়ী স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে। ধীরে ধীরে স্বীকৃত হয়েছে যে, বিত্থালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই একমাত্র উপযুক্ত মাধ্যম যার ভেতর দিয়ে মানুষের ব্যক্তিত্ব সংগঠিত করার সার্বজনীন ক্ষেত্র পাওয়া যায়। ধর্ম প্রতিষ্ঠান ক্রমশ সঙ্কীর্ণ ও একপেশে হয়ে গিয়ে যুগের প্রয়োজনে বাতিল বলে গণ্য হচ্ছে। মানুষের সামাজিক মূল্যবোধ বাঁচিয়ে রাখার জন্যে ধর্ম-নিরপেক্ষ সার্বজনীন মাধ্যম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে বিত্থালয়। কিন্তু, ইতিমধ্যে রাষ্ট্রীয় আদর্শ ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করায় বিত্থালয়ের আদর্শের পশ্চাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রীয় প্রভাব বিস্তার লাভ করেছে। এইভাবে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিত্থালয় বর্তমান যুগে মানুষের অভিজ্ঞতা আহরণ, সংরক্ষণ ও সংক্রমণের ভূমিকায় মূল্যবোধসহ গৃহ, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গিয়ে একধরনের সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

॥ ৪ ॥

## ধর্ম, রাষ্ট্র ও সমাজের ভূমিকা

সব দেশেই দেখা গেছে, রাষ্ট্র নামক বস্তুটি আত্মপ্রকাশ করার বহুপূর্বেই ধর্ম-প্রতিষ্ঠানই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অনুশাসনই শিক্ষার নীতি হিসেবে গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু বিবর্তনের পথে এই-সব ধর্মীয় আওতায় যেসব মঠ বিদ্যালয় আকারে গড়ে উঠেছিল, সেগুলির ঝোঁক ছিল অতীন্দ্রিয়বাদ বা রহস্যানুভূতির দিকেই। বুদ্ধিগত ভাবভাবনা অস্বীকৃত থাকায় রহস্যের অলৌকিকতাই সেখানে ছিল ধ্যানজ্ঞান। এই কারণে আরেক ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেখা দিল যেখানে বুদ্ধিগত জ্ঞানচর্চাই ধর্মীয় দৃষ্টিতে বেশি গুরুত্ব পেতে পারে। কিন্তু এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানও শেষপর্যন্ত স্থায়ী হতে পারেনি। বুদ্ধিগত চর্চার অত্যন্ত অস্বাভাবিক বাড়াবাড়ির ফলে ভাবাদর্শ ও সূক্ষ্ম অনুভূতিবোধ গৌণ হয়ে গিয়েছিল। এই ধরনের পটভূমিকায় আধুনিক শিক্ষার ঝোঁক দেখা দিয়েছে মানুষের সার্বজনীন দেহ-মন-আত্মার বিকাশ সাধনের আদর্শে। রাষ্ট্রশক্তিই প্রধান সামাজিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে নানা দেশে এবং এর ফলে শিক্ষাব ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এসে দেখা দিয়েছে রাষ্ট্রীয় আদর্শের প্রভাব। শিক্ষা ব্যাপারটি ধর্ম-নিরপেক্ষ ও রাষ্ট্র-নিরপেক্ষ সামাজিক ব্যাপার বলে গণ্য হওয়ার আধুনিক প্রবণতা অনেক দেশে বর্তমান। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও শিক্ষার আদর্শ ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। ভারতবর্ষে শিক্ষার ক্ষেত্রে ধর্ম ও রাষ্ট্রের গুরুত্বসহ ধর্ম-নিরপেক্ষ ও রাষ্ট্র-নিরপেক্ষ শিক্ষার আদর্শ এক বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে জড়িয়ে মড়িয়ে আছে।

বর্তমান যুগে সাধারণভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর ধর্মীয় আদর্শের প্রভাব যথেষ্ট মাত্রায় কমে গেছে। তবুও চার্চের নিয়ন্ত্রণে কিছু বিদ্যালয় বিভিন্ন দেশেই চালু আছে। ভারতবর্ষেও সংবিধানের মধ্যেই ধর্মীয় স্বাধীনতার রক্ষাকবচের সুযোগে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ছত্রছায়ায় অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু আছে বিশেষ অধিকার বলে।

সাধারণভাবে আমরা কালের বিবর্তনে ধর্ম-নিরপেক্ষ শিক্ষার দিকেই এগিয়ে আছি। জীবনের সর্বস্তরে ধর্ম-নিরপেক্ষ সমাজ মানসিকতার দিকেই আমাদের

ঝোঁক ও স্বীকৃতি লক্ষণীয়। ধর্মীয় আওতা থেকে সমস্ত ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে মুক্ত করে যুগোপযোগী ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র-নিরপেক্ষ জাতীয় ভাবাদর্শের শিক্ষার দিকে এগিয়ে যাওয়ার গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক প্রবণতা আমাদের দেশে অবশ্যই লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

অনেকে ধর্ম-নিরপেক্ষ শিক্ষাকে নীতি ও মূল্যবোধহীন এক ধরনের শিক্ষা বলে অভিহিত করেন। অথচ ধর্ম-নিরপেক্ষ শিক্ষা মানে নীতি ও অধ্যাত্মবোধের উচ্চ-আদর্শ বিবর্জিত শিক্ষা নয়, এই সাধারণ সত্যটুকু সকলের মনে রাখা দরকার। ধর্ম-নিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়, এই কথাটিই সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে ডঃ রাধাকৃষ্ণণ বলেছিলেনঃ ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীন ব্যাপার নয়। মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেনঃ একজন মানুষের ব্যক্তিত্ব যখন চরম আধ্যাত্মিক সম্ভাবনায় বিকশিত হয়ে উঠে, তখন তা জীবনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সুন্দর জিনিস হয়ে দাঁড়ায়। আর এইটেই তো যেন ভগবানের মহত্তম কাজেরই অভিব্যক্তি। যে কোনো সমাজব্যবস্থায় মূল্যবোধহীন শিক্ষার কোনো মূল্য নেই, এই কথাটি তো সর্বজন স্বীকৃত ব্যাপার। মূল্যবোধের উদ্ভব ও সম্প্রসারণশীলতা নির্ভর করে সমাজের মৌল কাঠামোর পুণর্বিন্যাসের উপর। মূল্যবোধ ও নৈতিকতাকে জনগণস্তরেই সঞ্জীবিত করতে গেলে জনগণের মৌলিক চাহিদা, যুগোপযোগী জীবনধারার অত্যাবশ্যক প্রয়োজন মেটানো সর্বাগ্রে অবশ্যই প্রয়োজন।

মহাত্মা গান্ধী যে ধরনের নৈতিকতাবোধ ও আধ্যাত্মবোধের শিক্ষার কথা বলেছিলেন এবং যে শিক্ষাকে তিনি ধর্মীয় শিক্ষা বলতেও সংকোচবোধ করেননি, আসলে সে শিক্ষার নীতিতে আছে সার্বজনীন একটি আবেদন। কিন্তু সেই নীতির কার্যকরী দিকটি নির্ভর করে সমাজব্যবস্থার মৌল পরিবর্তনের উপরেই, যে-জিনিসটি না হওয়ায় শিক্ষার ক্ষেত্রে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের ব্যাপারটি সর্বব্যাপী হতে পারেনি। এই ত্রুটি থেকেই আমাদের দেশের শিক্ষাধারায় মানসিক অবক্ষয়ের উৎপত্তি। আসল রোগটি সনাক্ত করে তার প্রতিবিধানের জন্য কোনো সার্থক উদ্যোগ হয়নি বলেই শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য এসে গ্রাস করেছে আমাদের মানসিকতাকে। আসলে শিক্ষা জিনিসটিতে চাই মস্তিষ্কের চর্চার সঙ্গে হাতের চর্চা ও হৃদয়ের চর্চা। মস্তিষ্ক, হাত ও হৃদয়ের মিলিত সাধনায় খাকৃতি থাকার জন্যে শিক্ষার মূল্যবোধ মূল্যহীন হয়ে পড়েছে।

যুগধর্ম অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসতে হবে নতুন যুগের নতুন

নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে। ধর্মনিরপেক্ষতা ও মানবতাবাদের ধর্মকে নতুন যুগের মানসিকতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে দিয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে জগৎ ও জীবনের তাৎপর্যকে শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে। যা-কিছু অনড়, অসত্য, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, মানসিক, বিভেদ ও বৈষম্যের সহায়ক তা বর্জন করে নীতিবোধ ও আধ্যাত্মিকতাকে বিজ্ঞানধর্মী বিচার বিবেচনায শিক্ষার ক্ষেত্রে মর্যাদা দিতে হবে।

ইতিহাসের পেছন দিকে তাকিয়ে বলা যায়, এককালে প্রাচীন গ্রীসে একধরনের সামাজিক সংঘ থেকে বিদ্যালযের উৎপত্তি হয়েছিল। কালের বিবর্তনে ও অনিবার্য চাহিদায সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ হিসেবে বিদ্যালয়কে গ্রহণ করার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে বর্তমান যুগে। এখন জোর দেওয়া হচ্ছে, বিদ্যালয় সমাজ জীবনের বাস্তব সমস্যা প্রতিফলিত কববে। সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিতও দিতে পারে একমাত্র বিদ্যালয়ই।

জন ডিউই বলেছিলেন—'শিক্ষাই সামাজিক জীবনের অব্যাহত ধারা বজায় রাখার উপায়, ব্যাপক অর্থে।' তিনি বলেছেন, শিক্ষাই শুধু জীবনের প্রস্তুতি নয়, শিক্ষাই জীবন। বিদ্যালয় সামাজিক ও ব্যক্তি আদর্শেরই উপযুক্ত সমন্বয় ক্ষেত্র। এখানে ব্যক্তি গোষ্ঠী সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে বারংবার উদ্দীপনা লাভ করে নানা বিচিত্র ধরনেব অভিজ্ঞতা অর্জন করে থাকে। জন ডিউয়ের মতে বিদ্যালয় মানুষের জীবনেব বিভিন্ন দিকের অভিব্যক্তিকেই পরিস্ফুট করে তোলে। জীবনের নানা উপাদানকে বিকশিত করে তোলাই তার কাজ। এই কাজ বিদ্যালয় না করতে পারলে বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। তাকে তো শুধুমাত্র সামাজিক জীবনের প্রস্তুতি পর্বের ব্যাপার হিসেবে গণ্য করা যায় না। আসলে বিদ্যালয় এমন এক ক্ষেত্র যেখানে 'জ্ঞানকেন্দ্রিক' ও কর্মকেন্দ্রিক' সাধনা চলবে। জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয় সাধনার কথা আমাদের স্বামী বিবেকানন্দও বলে গেছেন। জন ডিউই জোর দিয়েছেন বিদ্যালয়ের বিভিন্ন গোষ্ঠীর যৌথ প্রচেষ্টা ও জীবনযাত্রা প্রণালীব উপরেও। তিনি দেখিয়েছেন, পারস্পরিক অভিজ্ঞতার আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে নতুন নতুন অভিজ্ঞতার পথ আরো খুলে দিতে হবে। তিনি দেখিয়েছেন, সামাজিক বা যৌথ কাজকর্মের মধ্য দিয়ে মানুষের ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হয় আরো ভালোভাবে। তিনি সেজন্য সমাজের ভেতরে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পরিবেশ গড়ে তোলার কথা বলেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সহযোগিতা ও ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সামাজিক

প্রগতি সম্ভব। এইভাবে নতুন নতুন সৃজনী প্রতিভা ও নতুন নতুন আবিষ্কারের পথ খুলে দিতে হবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেছেন। মহাত্মা গান্ধী আরো দৃঢ়ভাবে এবং স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন—'মানুষের ব্যক্তিত্ব সর্বোত্তম আধ্যাত্মিক সম্ভাবনা নিয়ে গড়ে উঠলে তাকেই বলা যেতে পারে স্রষ্টার শ্রেষ্ঠতম কাজ সম্পাদিত হয়েছে।' তিনি দেখিয়েছিলেন, সমাজের মাধ্যমেই এই মহত্তম কাজটি সম্পন্ন হতে পারে।

ডঃ রাধাকৃষ্ণণের মতেও আমাদের প্রকৃত নাগরিত্ব হোলো স্বর্গীয় ভাব-ভাবনার রাজ্যেই। প্রকৃত নাগরিকত্ববোধ আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের সার্থক পরিণতিতেই প্রকাশ পায়। এই আধ্যাত্মিকতাকে তিনি নিছক ধর্মকেন্দ্রিক মঠ-মসজিদ-গীর্জার ব্যাপার বলে মনে করেননি, বরং ভেবেছিলেন আধ্যাত্মিকতা একটা মানসিক শক্তি। এ জিনিস মন্ত্রতন্ত্র বা নিছক ধর্মীয় অনুভূতির ব্যাপার নয়। আসলে তা আমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত এক উচ্চ ভাবাদর্শ। এই ভাবাদর্শ আমাদের চিন্তাধারাকে স্বচ্ছ করে, দূরদৃষ্টির ক্ষমতা এনে দেয়, জীবনকে প্রকৃত জীবনবোধের উদ্দেশ্যমুখিতায় অভিষিক্ত করে। এই দিক দিয়ে বিদ্যালয়ই হচ্ছে একমাত্র সংগঠিত ও সুনির্বাচিত রূপ। এরই মধ্য দিয়েই সমাজের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত। ব্যক্তি এরই সান্নিধ্যে তার দৈহিক, মানসিক, আত্মিক শক্তির উদ্‌বোধনের জন্য প্রকৃত উদ্দীপনা আহরণ করতে পারে। সামাজিক রাজনৈতিক পরিবেষ্টনীতে এরই মাধ্যমে ব্যক্তি পেতে পারে নতুন মূল্যবোধ। সত্যিকার সুনাগরিক ও মানুষ গড়ে ওঠার মধ্য দিয়ে এরই মাধ্যমে ব্যক্তির পক্ষে আহরণ করা সম্ভব গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক ও মানবিক মূল্যবোধ।

রাধাকৃষ্ণণ দেখিয়েছিলেন শিক্ষাই মানুষকে স্বাধীন মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। তাঁর মতে, শিক্ষার লক্ষ্য ব্যক্তির মুক্তি সাধনা। এই মুক্তি তার চিন্তায়, শ্রদ্ধায়, স্বপ্নে ও ধ্যানে মূর্তমান হতে পারে। বিদ্যালয় এমন এক মাধ্যম যার ভেতর দিয়ে শিক্ষার্থী সমাজের সামগ্রিক সত্তার ভেতর থেকে পেতে পারে জীবনবোধের উদ্দীপনা ও উপাদান। জন ডিউই-ও এই কারণে দেখিয়েছিলেন ব্যক্তির মনই সামাজিক জীবনের কার্যকরী হাতিয়ার। তিনি দেখিয়েছিলেন, ব্যক্তিমন সামাজিক প্রেরণা থেকেই মূল্যবোধ আহরণ করবে, এইটেই শিক্ষার

নীতি। সমাজকে পরিবর্তন করার অবিরত সাধনায় এই ব্যক্তি মনকেই ক্রিয়াশীল হতে হবে। বিদ্যালয়ের মাধ্যমে সামাজিক দায়িত্ব পালন করে বিদ্যালয় জীবনের গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়ে গড়ে উঠবে প্রত্যেক শিক্ষার্থী।

আধুনিক সমাজ জীবনে বিদ্যালয়ের অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, জীবনের পূর্ণতা সাধনের জন্য সৃজনীশক্তির অজস্রধারায় মানুষ ও প্রকৃতি গড়ে তুলবে এক ঐক্যবোধ বা আত্মীয়তা। এই জিনিস সম্ভব হতে পারে সুসংগঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। তিনি বলেছেন—'শিশুকে স্বাধীনতা দাও, তাহার অন্তরের সৃষ্টিকর্তাকে শৃঙ্খলিত করিও না। শিশুর সম্মুখে নানারূপ উপাদান আনিয়া দাও। শিশু নিজে তাহা ভাঙুক গড়ুক।' তিনি বলেছেন, যেকোনো সুবিন্যস্ত শিক্ষার তন্ত্র ও প্রণালীর মধ্যে তিনটি সত্তাকে স্বীকার করে নিতে হবে। এক, 'প্রাকৃতিক' দুই, 'সমাজিক' তিন, 'আধ্যাত্মিক'। তাঁর মতে, পূর্ণতার পথে এগোতে গেলে চাই আদিম মনের মতো পবিত্র ও সবুজ প্রাণ, মনের দিক থেকে আধুনিক ও সুসভ্য দৃষ্টিভঙ্গি। প্রকৃতির মতো স্বাভাবিক, মানুষের মতো মানবিক না হলে চলে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্তরাত্মায় এই মনোভাব ফুটিয়ে তুলতে হয়। কারণ, এর প্রকৃত উদ্দেশ্য মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি করা, বাস্তব অস্তিত্বের মধ্যেই এর প্রকৃত পরিচয় নিহিত। তাঁর মতে, মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য হবে তিন রকমের। মনের স্বাধীনতা, হৃদয়ের স্বাধীনতা এবং ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা। এই তিন রকমের মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য বা স্বাধীনতা চাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্তরাত্মায়। এ জিনিস শুধু মাত্র জ্ঞানচর্চার মধ্য দিয়ে সম্ভব নয় সত্তার পরিপূর্ণতা লাভের মধ্য দিয়েই এই জিনিস পেতে হবে। শিক্ষাকে স্বাভাবিক, স্বাস্থ্যপ্রদ ও স্বচ্ছন্দ করে তোলার জন্যে তিনি চেয়েছেন পরিবেশের সঙ্গে মানুষের এক জৈবিক অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। প্রকৃতির সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে, মানুষের সমাজের সঙ্গে, আদর্শের সঙ্গে এক মহামিলনের মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক ধারাকে জীবন্ত ও প্রবহমান করে তোলার ক্ষেত্র হিসেবে চেয়েছেন শিক্ষায়তনকে। সংস্কৃতিকে তিনি দেখেছেন এক চলমান, প্রবাহমান শক্তি হিসেবে। ব্যক্তি ও সমাজজীবনের পরিপূর্ণ আনন্দময় প্রবণতার মধ্য দিয়ে, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় নতুন মন নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টির মধ্য দিয়ে, অখণ্ড জীবনদর্শন ও পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব গঠনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাবার শিক্ষাসাধনাই হোলো রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাসাধনা।

## ॥ ৫ ॥

# শিক্ষার বিশেষ ভূমিকা

শিক্ষার সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সামাজিক আদর্শের সঙ্গে ব্যক্তি আদর্শের সংঘাত নয়, সামাজিক আদর্শের মধ্য দিয়েই ব্যক্তি আদর্শ গড়ে তোলার কথা শিক্ষা সমাজবিজ্ঞানীরা বলে থাকেন।

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের মধ্যেই মানুষকে বাস করতে হয়। এইজন্য চাই এমন ব্যক্তিত্ববোধ যা সামাজিক আদর্শের পরিপন্থী নয়। শিক্ষার সার্থকতা নির্ভর করে পরিপূর্ণ সমাজমণ্ডিত ব্যক্তিসত্তার উপরে। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য অনিবার্য ভাবে সেই সুস্থ ও অনুকূল সামাজিক শর্ত এবং সামাজিক পরিবেষ্টনী।[১৫]

শিক্ষার অপরিহার্য একটি মাধ্যম মানুষের সমাজ। শিক্ষার্থীর মনে নাগরিকত্বের গুণাবলী অর্জনের কাজে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠান এই কাজে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাহন। সমাজই মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠনে সাহায্য করে বেশি করে। ব্যক্তিত্ব নিয়ন্ত্রণে ও প্রভাব বিস্তারে তার প্রভাব অসামান্য। সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমাজচেতনার কাজে এক বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে থাকে। এছাড়া, শিক্ষার

---

১৫। পার্সিনান এই দিকটি লক্ষ্য রেখেই বলেছিলেন, শিক্ষাপ্রচেষ্টাকে এমনভাবে সুনির্দিষ্ট করতে হবে যার দ্বারা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে বিকশিত হওয়ার অনুকূল সুযোগ বা শর্তপূরণ সম্ভব হতে পারে। মন্‌রো ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক দেখিয়ে শিক্ষার সার্থকতা প্রতিপন্ন করার জন্য বলেছিলেন, আধুনিক যুগে শিক্ষার তাৎপর্য ও সার্থকতা নির্ভর করে একটি জিনিসের উপর, তা হোলো ব্যক্তির মধ্যে সমাজের সম্পর্ক স্থাপনের পদ্ধতির উপর। ভারতের পঞ্চবার্ষিক প্রথম পরিকল্পনার রিপোর্টে এই তাৎপর্যের কথা অনুধাবণ করে বলা হয়েছিল, গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করছে সমবায়মূলক সহযোগিতার নীতির উপরেই। শৃঙ্খলাপরায়ণ নাগরিক ও সমাজজীবনের প্রত্যেক কাজে ব্যক্তিমানুষের বুদ্ধিগতভাবে সজ্ঞানভাবে অংশগ্রহণ, এই পন্থায় এগিয়ে যাওয়ার সর্বোৎকৃষ্ট বাহন হোলো শিক্ষায়তন, এই কথাই সেদিন বলা হয়েছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে, সমাজের মৌল বিন্যাস ও চাহিদার দিকে পরিকল্পনার ত্রুটি থেকে যাওয়ায় শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয় উদ্দেশ্য পূরণ অনেকখানি ব্যাহত হয়ে গেছে। বৈষম্যভরা প্রতিযোগিতামূলক সমাজব্যবস্থায় সমবায়মূলক সহযোগিতার নীতি উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া ব্যাপারের মতো অনেকখানি ব্যর্থ হয়ে গেছে। এই নির্মম অবস্থাটি বাস্তব সত্য হিসেবে স্বীকার করে নেওয়াই ভালো।

মাধ্যমেই সমাজচেতনা গড়ে তোলা যায় বলে সমাজের প্রয়োজনীয়তা এক অপরিহার্য ব্যাপার। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমাজের বাস্তব আত্মিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে এবং নৈতিক দায়িত্ব সুসংগঠিত করার ভেতর দিয়ে সত্যিকার সুশৃঙ্খল ব্যক্তি নাগরিক গড়ে তোলা সম্ভব হয়।

জন ডিউই বারবার বলেছেন, শিক্ষা আসলে মানুষের অভিজ্ঞতা পুণর্গঠনেরই উপায়। অর্জনের মধ্য দিয়ে যতই মানুষের অভিজ্ঞতা বেড়ে ওঠে ততই সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে মানুষের জ্ঞান। ততই সামাজিক মূল্যবোধ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এইভাবে মানুষ তার নিজের শক্তির উপর বিশ্বাস ও নিয়ন্ত্রণ আনতে পারে। সেইজন্য তিনি বলেছেন, জীবনের জন্য নয়, অর্থাৎ প্রয়োজনমাফিক ব্যাপার নয়, জীবনের ভেতরেই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অংশ গ্রহণ এবং অভিজ্ঞতার বারংবার পুণর্গঠনের মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতার আরো নবীকরণই শিক্ষার মূল কথা। তিনি দেখিয়েছেন বর্তমান জীবনের ভেতর দিয়েই মানুষ তার নিজের জীবনকে গড়ে তোলে। ভবিষ্যৎ জীবনের ভাবনা নিয়ে কেউ এগোয় না। সেইজন্য তাঁর মতে, শিক্ষার ভেতর দিয়ে যদি আমরা বর্তমানকে জয় করে নিতে পারি এবং আমাদের বর্তমান সময় যদি সার্থক বর্তমান হিসেবে মূর্ত হতে পারে, তাহলে তা নিরাপদ ভবিষ্যতেরই স্বাভাবিক প্রস্তুতি হিসেবে গণ্য হতে পারে। সমাজ যদি তার নানা কর্মসূচীর প্রসারতার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীকে তার বর্তমান ও ভবিষ্যতের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার অবশ্যম্ভাবী শর্ত পূরণ করে দায়িত্বের সঙ্গে, তাহলে শিক্ষার্থীর ক্ষমতার বিকাশ অবশ্যই সম্ভব হবে আশাতীতভাবে সার্থকরূপে। সে নিশ্চয় বর্তমান অবস্থা থেকে ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়াতে পারবে উপযুক্ত ক্ষমতা নিয়ে। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জন ডিউই শিক্ষার সংজ্ঞা নির্দেশ করে বলেছেন—শিক্ষা মানেই পরিপূর্ণ জীবন-দর্শন। শিক্ষার অর্থই হোলো জীবনের সামাজিক নিরবচ্ছিন্ন ধারাকে প্রকাশ করে তোলা। প্রকৃত শিক্ষা যদি মানুষের শরীর, মন ও চরিত্র গড়ে তোলে তবে সে শিক্ষাকে তো নিছক জীবনের প্রস্তুতি বলে ভাবা যায় না। সে যে আরো অতিরিক্ত একটা-কিছু। জীবনেরই তা অভিব্যক্তি। সেইজন্য বলা যায় শিক্ষা মানুষকে দিতে পারে পরিপূর্ণ জীবন দর্শনের দর্পন। এই জীবন-দর্শন গড়ে ওঠে মানুষের সঙ্গে মানুষের, মানুষের সঙ্গে সমাজের, সমাজের সঙ্গে প্রকৃতির, মানুষের সঙ্গে উন্নততর ভাবাদর্শের সান্নিধ্যে, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়, মিলনে ও অভিঘাতে।

কার্ল ম্যানহেম নামে প্রসিদ্ধ সমাজতত্ত্ববিদ্ তাঁর 'যুগের চিকিৎসা' গ্রন্থে মানুষের সারা জীবন ব্যাপী শিক্ষা সাধনার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন: মানুষের শিক্ষা সারা জীবন ধরে চলতে বাধ্য। বিদ্যালয়ের লক্ষ্য সেজন্যই শুধু ছক-বাঁধা জ্ঞান দান করা নয়। তার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীকে জীবনেরই তাগিদেই আরো দক্ষ করে তোলার চেষ্টা করা।' প্রকৃতপক্ষে মানুষ সারা জীবন ধরেই শিক্ষা গ্রহণ করে, এর কোন ছেদ নেই। বিদ্যালয়ের লক্ষ্য হবে জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে জীবনকে আরো যোগ্যতর করে এগিয়ে যাওয়ার শিক্ষা দেওয়া। জন ডিউই-ও বলেছেন, শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হবে শিক্ষার্থীকে জীবননীতি অনুসরণ করতে দেওয়া এবং এইজন্য তিনি জোর দিয়েছেন সমবায় ও পারস্পরিক সহযোগিতামূলক মনোভাবের উপর।

শিক্ষা একটি সামাজিক প্রক্রিয়া হিসেবে গণ্য হতে বাধ্য। সমাজের একটি বিশেষ আদর্শের প্রয়োজন। সেই আদর্শ ব্যক্তির স্বাধীন ভাবধারা ও কর্মপ্রণালীকে স্বীকার করে নেবে। সমাজের প্রতি ব্যক্তির দায়দায়িত্ব, ব্যক্তির প্রতি সমাজের দায়দায়িত্ব উভয়কেই গুরুত্ব দিয়ে স্বীকার করতে হয়। সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক আদর্শের শিক্ষার মর্মকথা হোলো তাই। গণতন্ত্র জিনিসটা আসলে একটি ভাবাদর্শের জিনিস। এর নীতিতে আছে সহযোগিতার কথা, যুগ্মভাবে বাঁচার কথা এবং সেইমতো জীবনধারাকে আয়ত্ত করার কথা। যুগ্ম অভিজ্ঞতার ফল সমাজের সকলেই ভাগ করে নেয়।

বর্তমানে পৃথিবীতে সর্বত্রই কোনো-না-কোনভাবে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি স্বীকৃতি লাভ করেছে। গণতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় রূপ নিয়ে বিশ্বব্যাপী নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চলছে—কোন্ রূপটি চূড়ান্তভাবে সত্য তা এখনো সর্ববাদী সম্মত না হলেও এইটে এখন সর্বত্র স্বীকৃত সত্য যে, শিক্ষার ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক নীতি মানে সকলের ক্ষমতা ও মেধা অনুসারে সমান সুযোগের নীতি গ্রহণ করা। গণতান্ত্রিক-সমাজতান্ত্রিক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে যথার্থভাবে উন্মোচিত করার জন্য উপযুক্ত সামাজিক পরিবেশের শর্ত পালন করা। ব্যক্তির প্রতিভা ও ক্ষমতার বিকাশ সাধনে পরিবেশ সর্বপ্রকার অনুকূল সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করবে, এইটেই এই নীতির কাম্য। গণতন্ত্র এমন এক সামাজিক মাধ্যম সৃষ্টি করবে যার সাহায্য নিয়ে ব্যক্তি তার সর্বোচ্চ পর্যায়ের জীবনধারা বিকশিত করতে সুযোগ পাবে। প্রত্যেক ব্যক্তির কল্যাণের কাজে গণতান্ত্রিক আদর্শ যুক্ত হবে।

কল্যাণমূলক কাজে যৌথভাবে অংশ নেবে প্রত্যেক ব্যক্তি। বার্কারের ভাষায়—'একই রকমের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে একই রকমের নির্দিষ্ট উপায়ে'। গণতান্ত্রিক নীতির মোদ্দা কথা তাই। তিনি গণতান্ত্রিক শিক্ষার সার্থকতা প্রতিপন্ন করতে গিয়ে বলেছেন—বিদ্যালয় শুধুমাত্র গণতান্ত্রিক সমাজ হবে তা নয়, বৃহত্তর সমাজের জন্য কাজ করতে গিয়ে তাকে গড়ে তুলতে হবে শিক্ষার্থীদের—যে শিক্ষার্থীরা একই রকমের ইচ্ছাশক্তির প্রকাশনায়ও রূপায়ণে নানা ধরনের প্রণালীও ব্যবহার করতে শিখবে। গণতন্ত্রের একটা নৈতিক ও আদর্শগত দিক আছে। প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে সমাজ কিছু-না-কিছু প্রত্যাশা দাবী করে। এইসব কারণে 'সমাজমণ্ডিত ব্যক্তি' গঠনের আদর্শই প্রকৃত গণতান্ত্রিক নীতি হিসেবে পৃথিবীর সর্বত্র সোচ্চার হয়েছে। এই নীতিতে সকলকেই কিভাবে সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষা দেওয়া যায় সেই ভাবনা দেখা দিয়েছে।

## প্রশ্নাবলী

১। পাঠ্যসূচী নির্ধারণের পশ্চাতে কোনো দার্শনিক যুক্তি আছে কি?

২। পাঠ্যসূচী নির্ণয়ের সমাজতাত্ত্বিক দিকটি সবচেয়ে মূল্যবান—এ কথা সর্বাংশে সত্য কি না?

৩। মনোবিজ্ঞানের কোন্ কোন্ নীতি শিক্ষাসূচী নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সত্যই পথপ্রদর্শক?

৪। সহ-পাঠ্যসূচী বলতে কি বোঝায়?

৫। বিশ্রামমুখীন শিক্ষা ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার কোন আদর্শগত পার্থক্য আছে কি না?

৬। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিভিন্নস্তরে পাঠ্যসূচী নির্ণয়ের জন্য বহুমুখী দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন আছে কি না?

৭। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাসূচীর মধ্যে কোনো মৌলিক পার্থক্য থাকা উচিত কি না?

৮। বৃত্তিমূলক শিক্ষা কিভাবে মাধ্যমিক পর্যায়ে দেওয়া যায়?

৯। মাধ্যমিক শিক্ষার পথনির্দেশের কোনো ভূমিকা প্রয়োজন কিনা?

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

# ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও সমাজকেন্দ্রিক শিক্ষার আদর্শ

# ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও সমাজকেন্দ্রিক শিক্ষার আদর্শ

## ॥ ১ ॥

## ব্যক্তি ও সমাজ মানসের বিকাশসূত্র

শিক্ষায় ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও সমাজকেন্দ্রিক ভাবধারার দুটি বিচ্ছিন্ন প্রভাব বিভিন্ন যুগে লক্ষ্য করা গেছে। শিক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এই জিনিসটি সকলের চোখে পড়ে।

প্লেটোর কাছে ব্যক্তিত্বের গৌরব বড়ো ছিল না। তাই, তিনি সমাজকে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য শ্রেণীতে ভাগ কবে দেখিয়েছিলেন মানুষের মানসিক বৈচিত্র্যের বিভিন্ন প্রকাশকে। ফলে তাঁর পক্ষে সামাজিক প্রগতির ক্ষেত্রে ব্যক্তির বৈচিত্র্যকে স্বীকার করা সম্ভব হয়নি—কারণ, তিনি যে সামাজিক শ্রেণী ভাগ করেছিলেন তা নিতান্তই যান্ত্রিক এক ধরনের বিশ্লেষণ। অথচ গ্রীক দেশে সামাজিক আদর্শের সঙ্গে ব্যক্তি আদর্শের সুষ্ঠু সমন্বয়ের ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠেছিল সে সময়ে।

স্পার্টাতে তো ব্যক্তি আদর্শ একেবারে গৌণ হয়ে গিয়ে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আদর্শ অত্যন্ত উগ্রভাবে প্রাধান্য লাভ করেছিল। রাষ্ট্রযন্ত্রের অমোঘ নির্দেশে অবাঞ্ছিত নাগরিকদের সমূলে উৎপাদন করা ছিল স্পার্টার নিয়ম-নীতি।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে আবার দেখা দিয়েছিল ব্যক্তিত্বের আদর্শকে জয়ী হোতে। কিন্তু ক্রমে এই ধারণা স্বীকৃতি পায়, একমাত্র স্বাধীন মানুষই সামাজিক প্রগতির মুখপাত্র হোতে পারে। রুশোর শিক্ষানীতিতে আমরা দেখতে পাই 'সামাজিক চুক্তির' কথা। তিনি অনুভব করেছিলেন ব্যক্তির সম্পূর্ণ ও সুসমণ্ডিত বিকাশের জন্য প্রয়োজন সামাজিক শর্তের। তিনি বলেছিলেন, মানুষ জন্মেছে স্বাধীন হয়ে কিন্তু প্রতি পদে পদে সে গিরোতে বাঁধা। এই গিরো আসলে সামাজিক গিরো। সমাজবদ্ধ মানুষই প্রগতির পদক্ষেপে ব্যক্তিত্বের গৌরবে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে। সেই ব্যক্তিত্ব অবশ্যই সমাজমণ্ডিত ব্যক্তিত্ব। দায় দায়িত্বহীন বল্গাহীন স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তিত্বের কোনো সামাজিক উপযোগিতা নেই।

পরবর্তীকালে জার্মানীর চিন্তাধারায় দেখা গেছে, শিক্ষাকে তাঁরা নাগরিক অধিকার হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। কিন্তু, দুর্ভাগ্যের কথা এই যে, সেখানে

মানবিক গুণ প্রাধান্য না পেয়ে গুরুত্ব পেয়েছিল জাতীয়তাবাদের আদর্শ। নেপোলিয়নের বিজয়ের পর জার্মানী শিক্ষাকে গ্রহণ করেছিল রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের হাতিয়ার হিসেবে। ব্যক্তিকেন্দ্রিক আদর্শ পেছনে পড়ে গিয়েছিল। রাষ্ট্রকে শিক্ষার পরিণতি লাভের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। নির্দিষ্ট রাষ্ট্রীয় অনুশাসনের আওতায় ব্যক্তিকেন্দ্রিক আদর্শ বিসর্জন দেওয়া হয়েছিল। এই রকম অবস্থায় হেগেলের মধ্যে জন্ম নিয়েছিল 'প্রতিষ্ঠানগত আদর্শবাদ'। তিনি ব্যক্তির স্বতন্ত্র সত্তাকে স্বীকার না করে ব্যক্তিত্বকে সমকালীন প্রতিষ্ঠানের আদর্শের সঙ্গে একাত্ম করে এক ধরনের মতবাদ নিয়ে এসেছিলেন। এরপরে জার্মানীতে সর্বপ্রথম প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু চরম রাষ্ট্রীয় আদর্শের অভিব্যক্তির ফলে শেষ পর্যন্ত জার্মান জাতি ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। ইতিহাস এই সাক্ষ্যই বহন করে এসেছে।

আদিম সমাজে দেখা গেছে ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করার তাগিদ। এক সময় পাশ্চাত্য দেশে খৃষ্টীয় মতবাদের প্রভাবে ব্যক্তিত্বের মূল্য স্বীকৃত হয়েছিল। কিন্তু আধুনিক যুগে শিক্ষার এই লক্ষ্য অন্যদিকে প্রসারিত হয়ে গেছে। আধুনিক যুগের শিক্ষাকে 'শিশুকেন্দ্রিক' শিক্ষা হিসেবে অভিহিত করা হয়। সেই সঙ্গে বলা হয়, শিক্ষার্থীর সামাজিক প্রবণতার কথা। আধুনিক শিক্ষার নীতিতে ব্যক্তিত্ব গঠনের নীতি স্বীকার করে নিয়ে জোর দেওয়া হয় সমাজমণ্ডিত ব্যক্তিত্ব গঠনের উপরে। জন ডিউই, রুশো, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ শিক্ষাবিদেরা শিক্ষার এই গণতান্ত্রিক তাৎপর্য স্বীকার করে নিয়েছেন। জন ডিউই-র ভাষায় 'যে সমাজ একই ভিত্তিতে সমাজের সকলের মঙ্গলের জন্য সকলের অংশ গ্রহণকে বড়ো করে দেখে, যে সমাজ তার বিচিত্র প্রতিষ্ঠান ও সহযোগিতামূলক কার্যধারার মধ্য দিয়ে জীবনধারার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় একটা সুষ্ঠু উপযোগী অবস্থাকে স্বীকার করে নেয়, সেই সমাজকেই বলা যেতে পারে গণতান্ত্রিক সমাজ। এই সমাজ সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এমন ব্যবস্থা গড়ে তোলে যেখানে ব্যক্তির উপর নজর এড়িয়ে যায় না বরং সুশৃঙ্খলভাবে সামাজিক প্রগতির জন্য এক মানসিক অভ্যাস গড়ে ওঠে।'

আধুনিক যুগে এই আদর্শই স্বীকৃতি লাভ করেছে যে, শিক্ষার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিত্ববাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের চাই সুষ্ঠু সমন্বয়। গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক

আদর্শে ব্যক্তি ও সমাজ পৃথক অস্তিত্বে অবস্থান করে না। বরং ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও তার সামাজিক সত্তা সামাজিক সম্পর্কের এক সম্বন্ধসূত্রে গ্রথিত হয়ে যায় কোনোরকম কৃত্রিমভাবে নয়, স্বাভাবিক ভাবে। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, চাহিদা ও প্রবণতার দিকে নজর অবশ্যই দিতে হবে, সেই সঙ্গে সেই ব্যক্তিত্বকে সামাজিক সত্তায় রূপান্তরিত করে তুলতে হবে সজ্ঞানভাবে পরিকল্পনায় এবং নির্জ্ঞানভাবে পশ্চাৎপট বা পরিপ্রেক্ষিত সৃষ্টি করে। পার্সিনান তাঁর শিক্ষানীতিতে প্রায় একই নিঃশ্বাস নিয়ে যখন বলেন—'শিক্ষাকে ব্যক্তিত্বমণ্ডিত করো' এবং 'শিক্ষাকে সমাজমণ্ডিত করো', তখন আসলে তিনি কোনো পরস্পর বিরোধী কথা বলেন না। একটি আরেকটির পরিপূরক, এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই তাঁর শিক্ষানীতি সমুচ্চারিত। তিনি দেখিয়েছেন, সামাজিক আচার আচরণ ব্যবহারের মধ্যে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য অবশ্যই লক্ষ্য করা যায়। সবচেয়ে প্রতিভাধর ব্যক্তিত্বের মধ্যেও সামাজিক মন ক্রিয়াশীল। ব্যক্তিত্ব প্রকৃতপক্ষে একমাত্র সামাজিক অবস্থার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠতে পারে। পার্সিনান বলেছেন, 'ব্যক্তিত্ব কেবলমাত্র সামাজিক পরিবেশের মধ্য দিয়ে সুষ্ঠুভাবে গড়ে উঠতে পারে, একই রকমের কর্মসূচী ও অনুরুক্তিমূলক কাজকর্মের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিত্বের সামাজিক প্রকাশ সম্ভব হয়।' ফলে দেখা যায়, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠার ব্যাপারে বৈচিত্র্য ও স্বাধীনতাকে তিনি অস্বীকার করেন নি। বরং তিনি বলেছেন, প্রত্যেকেই তার সময় ও অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী গড়ে উঠবে। একটা বৈশিষ্ট্য বা স্বাতন্ত্র্য নিয়ে সে আত্মপ্রকাশ করবে। ব্যক্তির এই বৈচিত্র্যকে স্বীকার করে নিয়ে সামাজিক কল্যাণের আদর্শকে বড়ো করে দেখেছেন তিনি। সকলেই যাতে সামাজিক সমান সুযোগ ও আদর্শের ভিতর দিয়ে গড়ে ওঠে সেই রকম একটা মানদণ্ড তিনি নির্ধারণ করতে চেয়েছেন। পার্সিনানের এই সুচিন্তিত অভিমতের সঙ্গে জন ডিউই-র মতামতের প্রকৃত পার্থক্য নেই বললেও চলে। জন ডিউই-ও আসলে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও সামাজিক সত্তাকে এক পরিপূর্ণ আত্মিক সম্পর্কের ভেতর দিয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন। সামাজিক ব্যবস্থাপনার আদর্শগত অবস্থার মধ্য দিয়ে এবং অনুকূল সমাজ প্রেরণার সাহায্য নিয়ে ব্যক্তির চাহিদা ও দক্ষতা পূরণের জন্য শিক্ষার নীতি নির্ধারণে ভিন্ন সামাজিক আবেষ্টনীতে থেকেও পার্সিনান ও জন ডিউই মোটামুটি একই অবস্থানেই বিরাজ করেছেন।

শিক্ষা কি, সমাজ কি, সমাজ বিকাশ লাভ করে কোন্ সূত্রকে কেন্দ্র করে

অথবা সামাজিক চিন্তাধারা নিয়ন্ত্রিত হয় কোন্ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে, এইসব প্রশ্ন সত্যই খুব জটিল। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সমাজ বিবর্তনের ধারা অনুভব করে দেখলে দেখা যায়, মানব সভ্যতা তার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে একই বিশ্বের পতাকাতলে গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক আদর্শের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। দেশকাল পাত্র ভেদে তার জাতীয় রং যেরকম হোক না কেন, পুরাতনকে ভেঙে আমরা এক নতুন সভ্যতার দিকেই অগ্রসর হচ্ছি এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। অবশ্য পুরোনো অভিজ্ঞতার উপরেই মানুষের নতুন অভিজ্ঞতার ভিত্তি। তবুও, যুগের অনিবার্য তাগিদে আমরা সবকিছুর মধ্যেই সন্ধান করতে চাই মৌলিক বিকাশ ধারার নিয়মকে। এর ফলে আমাদের সুদীর্ঘকালের অনেক বিশ্বাস ও মূল্যবোধ পরীক্ষিত হচ্ছে নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক যুক্তির কাছে। এর অনিবার্য প্রভাবে আমাদের সমাজ, রাষ্ট্র, শিক্ষা প্রভৃতি ব্যবস্থার মধ্যে অনেক কিছু মৌলিক পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে বা আভাসিত হচ্ছে। আমরা ক্রমশ বুঝতে পারছি যে, সমাজ অগ্রগতির চাহিদায় পুরাতন ব্যবস্থা আমাদের সামাজিক চাহিদা পূরণে সক্ষম নয়। নতুন যুগের নতুন শিক্ষার ভিত্তিভূমি অবশ্যই হবে বিজ্ঞানসম্মত ও গণতান্ত্রিক-সমাজতান্ত্রিক আদর্শের। এই নীতি মেনে নিয়ে বিকাশের ধারা ও প্রগতিকে স্বীকার করে অনেক দূর এগিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে হবে।

শিক্ষাকে অবশ্যই আধুনিক যুগের উপযোগী হতে হবে। শিক্ষা অবশ্যই হবে প্রগতির হাতিয়ার। সভ্যতার উৎক্রমণের এক তোরণ দ্বার। উত্তরণের দিকেই সে প্রসারিত হবে। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি এমন হবে যা বাস্তব অবস্থার সঙ্গে খাপ খায়। সমাজ জীবনের বাস্তব অস্তিত্বের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠবে প্রগতিশীল ও উন্নয়নশীল মনন ধারা, যা সতত আরো উত্তরণের দিকেই অবারিত হবে। জন ডিউই যখন বলেন, বিদ্যালয় সমাজেরই দর্পণ, সমাজেরই প্রতিচ্ছবি, সমাজের সবকিছু সদর্থক দিক বিদ্যালয়ের কর্মধারায় প্রতিভাত হবে, তখন সে যুক্তি অস্বীকার করা যায় না। তবে একথাও আমাদের মনে রাখতে হবে সমাজ শুধু সমকালীন সময়ের সমাজের প্রতিচ্ছবি হবে না, তাকে হতে হবে ভাবী সমাজের এক দিগন্তকারী প্রতীক। ভাবী সমাজের নতুন নতুন প্রতিমূর্তির সম্ভাব্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার পীঠস্থান হবে বিদ্যালয়। এইভাবেই সমাজের সঙ্গে বিদ্যালয়ের গভীর সম্পর্ক স্থাপন করাই হবে প্রকৃত শিক্ষানীতি। গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থা

বড়োই সঙ্কীর্ণ ও অকেজো, নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার সেখানে সুযোগ বা সম্ভাবনা নেই। আমরা আমাদের দেশে শিক্ষার প্রকৃত কোনো জাতীয় নীতি গ্রহণ না করে ইংরেজ প্রবর্তিত ধারার ভেতরেই কিছু সংযোজন বা সংশোধন করে যা করে চলেছি তা এক রকমের রং পালিশ করা কৃত্রিম মুন্সিয়ানা। এর ফলে, শিক্ষার মধ্য দিয়ে আমাদের জাতীয় বিনিয়োগ সামান্যই ফল প্রদান করেছে। শিক্ষার সামাজিক উদ্দেশ্য পূরণ হচ্ছে না। সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা ক্রমশ জটিল হয়ে যাচ্ছে অথচ শিক্ষার সঙ্গে দেশের জনগণের সার্বিক যোগাযোগ উপযুক্ত পরিকল্পনার মাধ্যমে গড়ে উঠছে না। **যে শিক্ষা জীবনধর্মী নয়, জীবিকাধর্মী নয়, বাস্তব জীবনের চাহিদা পূরণে অকেজো এবং অবাস্তব, পরীক্ষা-নিরীক্ষার ধার ধারে না যে শিক্ষাব্যবস্থা, সেই শিক্ষার পরিণতি দুর্ভাগ্যজনক হতে বাধ্য।** অথচ সমাজের সঙ্গে শিক্ষার নিগূঢ় সম্পর্ক স্থাপনের শিক্ষানীতিই প্রকৃত শিক্ষা নীতি। জন ডিউই বলেছিলেন—অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে শিক্ষাবিদের মূল সমস্যা হবে বর্তমান অভিজ্ঞতার ফলপ্রদ শিক্ষণীয় দিক নির্বাচন করে তাকেই পরবর্তী অভিজ্ঞতার কাজে সৃষ্টিশীল করে তোলা। তাঁর মতে অভিজ্ঞতার অব্যাহত ধারাই হোলো শিক্ষাপ্রদ অভিজ্ঞতার দর্শন। শিক্ষা মানেই বিকাশ, তা ভেতর থেকে এবং অভিজ্ঞতার সাহায্যে অভিজ্ঞতা আহরণের জন্য। এই নীতি মেনে নিয়ে শিক্ষাকে গতিশীল, জীবনধর্মী, অভিজ্ঞতা-কেন্দ্রিক, বাস্তব সমাজ সম্মত ও গণতান্ত্রিক হিসেবে গড়ে তোলাই বর্তমান যুগের প্রকৃত আর্তি।

## ॥ ২ ॥

## সামাজিক বিকাশের তাৎপর্য

সমাজের প্রতিপালন ও সংরক্ষণের জন্য শিক্ষার মধ্য দিয়ে সামাজিক বিকাশ চালিয়ে যেতে হয়। সমাজের নানারকমের কার্যাবলীর মান নির্ধারণ করার ক্ষমতা আছে শিক্ষাব্যবস্থার। যে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা হয়নি, তারা শিক্ষার মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জনের পথ খুঁজে পায় বলে তাদের জন্য এক বিশেষ ধরনের সুনির্দিষ্ট ও সুনির্বাচিত পরিবেশ গড়ে তুলতে হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে। পরিবেশ এমনভাবে গড়ে তুলতে হয় যার সাহায্যে শিক্ষার্থী তার নিজস্ব প্রবণতা ও চাহিদা অনুযায়ী সজীব ও প্রাণবন্ত উদ্দীপনা আহরণ করে এগিয়ে যেতে পারে।

সামাজিক পরিবেশ বিদ্যালয়ের মধ্যে গড়ে তুলতে হয়। প্রচলিত সমাজের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে নিগূঢ় যোগাযোগ রাখতে হয়, যার ভেতর দিয়েই শিক্ষার্থী খুঁজে পাবে তার নিজস্ব প্রকাশের সম্ভাবনাকে। একথা অনস্বীকার্য, প্রত্যক্ষ মেলামেশা ও জ্ঞানের আদান প্রদানের ভেতর দিয়ে এবং পরিবেশের প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ প্রভাবের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী গড়ে উঠতে পারে। সামাজিক পরিবেশের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী অপরের অভিজ্ঞতার অনুসরণ করে এবং নিজের অভিজ্ঞতাকে পরিমার্জিত করার সুযোগ পায়। যুগ্মভাবে যেসব কার্যধারায় সে অংশগ্রহণ করে তার ভেতর থেকে সে যাতে সদর্থক উপাদানগুলির গভীর তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার হয়।

পরিবেশের প্রভাব শিক্ষার্থীর নির্জ্ঞান মনকে এমনভাবে প্রভাবান্বিত করে যার জন্য সে নিজেকে নানারকমের ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিজের একটি বিশেষত্ব খুঁজে পায়। এইসব কারণে শিক্ষাবিদেরা সামাজিক অভিজ্ঞতা আদান প্রদানের জন্য এক বিশেষ ধরনের পরিবেশ গড়ে তোলার কথা বলে এসেছেন। এই বিশেষ ধরনের পরিবেশের কাজকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করে দেখা হয়। প্রথমতঃ, মানুষের মন যেভাবে গড়ে উঠে, সেই অনুযায়ী পরিবেশকে সদর্থক ও উপযোগী করে গড়ে তোলা দরকার হয়। দ্বিতীয়তঃ, যেসব প্রচলিত বিশ্বাস, ধ্যানধারণা, আচার আচরণ অব্যাহত ধারায় চলে এসেছে সেগুলিকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে যুক্তিধর্মী উপায়ে গ্রহণ করে তাকে পরিশুদ্ধ ও মার্জিত করে এগিয়ে যেতে হয়। তৃতীয়তঃ, পরিবেশ অবশ্যই হবে ব্যাপক, সুনির্দিষ্ট ও সুবিস্তৃত। সেখান থেকে বিবিধ বৈচিত্র্যমূলক উদ্দীপনা গ্রহণের অনুকূল সুযোগ সুবিধা থাকবে ব্যাপকভাবে। এইসব কারণে জন ডিউই প্রমুখ শিক্ষাবিদ্‌গণ পরিবেশের "নির্জ্ঞান প্রভাবের" উপর খুবই গুরুত্ব আরোপ করেন। সমাজতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষাদর্শনের পরিমণ্ডলটি এমনভাবে গড়ে তোলার কথা বলা হয়, যা কোনো বাইরের থেকে আরোপিত ব্যাপার নয়। সামাজিক অবস্থানের ভেতর সদর্থক চিন্তারাজিকে এমনভাবে বহুবিস্তৃত ও বহু-বৈচিত্র্যমূলকভাবে স্থাপিত করা হয়, যার ফলে শিক্ষার্থী প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে স্বাভাবিক, সুস্থ ও নিরাপদ বিকাশের দিকে স্বতই এগিয়ে যেতে পারে।

॥ ৩ ॥

## সামাজিক মন ও তার নিয়ন্ত্রণ

শিক্ষার্থীর মধ্যে যে প্রবণতা, অনুরাগ, চাহিদা ও দক্ষতা আছে তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সামাজিক অবস্থানের ভেতরেই একটি গতিশীল প্রেরণা সঞ্চার করতে হবে। নতুবা চিরাচরিত বা গতানুগতিক ধারায় শিক্ষার কাজ হলে তা শিক্ষার্থীর শরীর, মন, আত্মাকে কোনোভাবে উদ্দীপিত করতে পারে না। গতিধর্মীতাই প্রাণের প্রকাশ, প্রাণের স্বভাব।

কিন্তু সমাজব্যবস্থার দোষে মানুষের এই স্বাভাবিক প্রাণধর্ম নানাভাবে বিকৃত বা কলুষিত হয়ে যায়। এই কারণে শিক্ষাবিদেরা শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি নির্ধারিত গতিপথ নির্দেশ করে দিতে চান। হয়তো এই নির্ধারিত নির্দেশের জন্য কিছু নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ মানেই স্বাভাবিক বিকাশের ক্ষেত্রে বাধা বোঝায় না বা স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ বোঝায় না। বরং বল্গাহীন স্বাধীনতা উচ্ছৃঙ্খলতার নামান্তর হয়। শিক্ষার সমগ্র ব্যবস্থার মধ্যেই একটি শৃঙ্খলাধর্মী নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা আছে। স্বাভাবিক প্রবণতা, উৎসাহ উদ্দীপনা ও অনুরাগকে সদর্থক পথে পরিচালিত করার জন্য এবং সমাজসম্মত উন্নত পথে উত্তরণের জন্য সমাজ দৃষ্টিভঙ্গির দার্শনিক ভিত্তিভূমিতে এবং সমাজের বাস্তব কার্যকারিতার মধ্যে এক ধরনের নিয়ন্ত্রণ অবশ্যই প্রয়োজন আছে। রাষ্ট্র সরাসরি কোনো বিশেষ দর্শনের উপর ভিত্তি করে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের দাওয়াই দিলেই তা কোনো 'ইনড্‌কট্রিনেশন' হবে তা নয়। রাষ্ট্রের সামাজিক উদ্দেশ্য ও বাস্তব কর্মসূচী যদি গণতান্ত্রিক, সমাজসম্মত, বিজ্ঞানধর্মী ও প্রগতিবাদী হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে হলেও সব সময় নিন্দনীয় নয়। কিন্তু রাষ্ট্রীয় দর্শনের মধ্যে আদর্শ ও কার্যক্রমে যদি ফারাক থাকে তাহলে তা বিপত্তির কারণ হতে পারে। যে কোনো গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক আদর্শের সমাজে লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থীর সামাজিক প্রবণতা ও কর্মধারাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যার ফলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সে তার ভাবধারা ও বুদ্ধিগত দিকটি আরো স্বচ্ছ সুন্দর বা মূর্ত করে গড়ে তুলতে পারে।

শিক্ষার ভেতর দিয়ে অন্তর্নিহিত নিয়ন্ত্রণ এমনভাবে গড়ে উঠবে যার ফলে শিক্ষার্থীর মন যুগ্মপ্রচেষ্টা ও যুগ্ম ফললাভের দিকেই ধাবিত হবে অথচ নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করারও সুযোগ থাকবে। শিক্ষার্থীর 'সামাজিক জ্ঞান'ই আসল জিনিস। ব্যক্তিত্বের ঔজ্জ্বল্য কাম্য কিন্তু ব্যক্তিত্বের স্বেচ্ছাচারিতা বা উন্মার্গগামিতা নয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই উপযুক্ত মাধ্যম যার ভেতর দিয়ে 'সামাজিক জ্ঞান' আহরণ করে সমাজমণ্ডিত ব্যক্তি হিসেবে গড়ে ওঠা যায়। 'সামাজিক মন' গড়ে ওঠার ব্যাপারটিই জোর দিয়েছেন বর্তমান যুগের শিক্ষাবিদেরা, যাঁরাই গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক শিক্ষার কথা বলেছেন। সামাজিক মনই সমাজ মন নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি। শিক্ষার মধ্য দিয়েই এই নিয়ন্ত্রণ গড়ে তুলতে হয়, যুগ্ম প্রচেষ্টায় ও যুগ্ম সহযোগিতায়।

## ॥ ৪ ॥

## শিক্ষার বিস্তৃতি ও দূরগামিতা

গোটা শিক্ষার ব্যাপারই কখনো সংকীর্ণ অর্থে পরিচালিত হতে পারে না। শিক্ষার ব্যাপকতা বা বিস্তৃতি চাই সর্বস্তরেই। এমন সব বিষয় শিক্ষণীয় উপাদান হবে যা শুধু নিছক প্রয়োজন মেটানোর ব্যাপার নয়। নিতান্ত প্রয়োজনমাফিক শিক্ষা তো সংকীর্ণ, একপেশে ও সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য। শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা ব্যাপক, উদার ও সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি থাকবে। সেইজন্য যদি বলি, শিক্ষা কোনো বিশেষ ধর্মীয় উদ্দেশ্যের ব্যাপার সিদ্ধ করে বা রুজি রোজগারের জন্যই শিক্ষার সবকিছু শিক্ষণীয় উপাদান, তাহলে সেই দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই সংকীর্ণ ও একপেশে হতে বাধ্য।

বর্তমান যুগের সমাজে সামাজিক চাহিদা দারুণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে সন্দেহ নেই। শিক্ষার্থী নিজেকে বাইরের জগতের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে চলবার জন্য বিশেষ ধরনের মানসিক গুণাবলী অর্জন করতে বাধ্য। এই কাজ করতে গিয়ে তাকে যেসব সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে আসতে হয় তা শিক্ষাদার্শনিকরা মূলত চারটি পর্যায়ে ভাগ করে দেখেছেন। সেই সম্পর্কগুলি হোলো এই— প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, মানুষের সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক এবং নীতি ও আদর্শের সঙ্গে সম্পর্ক। প্রকৃত প্রস্তাবে এই চার

প্রকার সম্পর্কই একধরনের সামাজিক সম্পর্ক বলা যেতে পারে। এইসব সম্পর্কের ক্ষেত্র সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য।

এই যে বিশ্বপ্রকৃতি তার অফুরন্ত বিস্ময় ও শক্তির ভাণ্ডার নিয়ে আমাদের সামনে প্রতিভাত, এর রহস্য অবশ্যই অনুধাবন করতে হয় মানুষকে। এক একজন একরকমের প্রতিভা, দক্ষতা ও ক্ষমতা নিয়ে এই প্রকৃতিকে অনুধাবন করার জন্য এগিয়ে যেতে পারে। মানুষ এই সীমাহীন প্রকৃতির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তাকে শুধু জানতে চায় তা নয়, তাকে নিজের করায়ত্তের মধ্যে এনে শেষ পর্যন্ত জয়ী হতে চায় প্রকৃতির উপরেও। হয়তো প্রকৃতির অনুকরণে এক দ্বিতীয় প্রকৃতি সৃষ্টি করার ভেতরে তার এক সৃজনাত্মক উল্লাস আছে। দ্বিতীয়তঃ, মানুষ চায় সমাজের অব্যাহত অভিজ্ঞতার ধারার সঙ্গে নিজের নিগূঢ় পরিচয়। সেই পরিচয়সূত্রে সে সৃষ্টি করতে চায় আরো নতুন নতুন অভিজ্ঞতার পরিমণ্ডল। ব্যক্তিত্ব ও সমাজ ধর্মের সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে সমন্বয় সাধন করে মানুষ ক্রমশ একটি প্রগতিশীল সমাজ ভাবনার দিকে ছুটে চলেছে। তৃতীয়তঃ, মানুষের সঙ্গে মানুষের একটা গভীর মানবধর্মী সম্পর্ক রয়েছে, যা দেশকাল পাত্র ভেদের উর্ধে এক মানবসত্তাকে নির্দেশ করে। মানুষ এই সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে হয়ে ওঠে মানবতাবাদী। চতুর্থতঃ, আরেকটি সম্পর্ক আছে যা মানুষের মধ্যে একটি শক্তি হিসেবেই নিহিত। মানুষ চায় তার জীবনের সীমাবদ্ধ আয়তনের উর্ধে এক অদৃশ্য শক্তির প্রেরণা। মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে একধরনের নির্জ্ঞান মননের অনুভূতি। সমস্ত কিছু কার্যধারার পেছনে সে অনুভব করতে চায় একধরনের অর্থদ্যোতক সঙ্কেত, যার মর্ম অনুধাবন করে তাকেই ধ্যানজ্ঞান ভেবে নিয়ে এগিয়ে যেতে চায়। একে আদর্শ বা নীতি বা উদ্দেশ্যের প্রেরণাও বলা যেতে পারে। এইভাবে চার ধরনের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে শিক্ষার একটি ব্যাপক ও বিস্তৃত মানসভূমিতেই শিক্ষার্থীকে স্থাপন করতে হয়। প্রয়োজনমাফিক শিক্ষা বলতে যা বোঝায়, সে জিনিস কখনো শিক্ষার শেষ কথা হতে পারে না।

বর্তমান যুগে সামাজিক চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজন মাফিক শিক্ষার দিকে নজর দিতে হচ্ছে। নানারকম বৃত্তিমূলক শিক্ষার মধ্য দিয়ে বা কলাবিদ্যা, বিজ্ঞানবিদ্যা, সংস্কৃতি চর্চা, ব্যবসাবাণিজ্য, প্রযুক্তি প্রভৃতির মধ্য দিয়ে একধরনের বিশেষ রকমের দক্ষতা অর্জনের দিকে শিক্ষাকে নজর দিতে হচ্ছে। কিন্তু তবুও বলা যেতে পারে, এই জাতীয় শিক্ষা সংকীর্ণ পর্যায়ের শিক্ষা, আপাত-লক্ষ্য

হিসেবে বিশেষজ্ঞ তৈরি বা প্রয়োজন মাফিক শিক্ষণই এর কাজ। অথচ শিক্ষার একটি দূর লক্ষ্য আছে। শরীর-আত্মা-মননের উন্মেষসাধনই সেই শিক্ষার শ্রেষ্ঠ আদর্শ। এই দূর লক্ষ্য সাধনায় শিক্ষার কর্মসূচীতে চাই শরীর চর্চা, নানারকমের আমোদপ্রমোদ, নাচগান কুস্তাকুস্তালি প্রভৃতি। সেই সঙ্গে মানসিক তথা বুদ্ধিগত চর্চার মতো উপাদান, তা সাহিত্য হোক, বিজ্ঞানে হোক, কারিগরী বিষয়ে হোক, কৃষি, ব্যবসা প্রভৃতি বিষয়ে হোক এবং এইসব ছাড়াও আরো প্রয়োজন আত্মার উৎকর্ষ সাধনের জন্য নীতি, দর্শন, ধর্ম প্রভৃতি স্বখ ভাবাদর্শের অনুশীলন।

বর্তমান যুগ নিঃসন্দেহে বিশেষজ্ঞের যুগ। ফলে, এক একজন শিক্ষার্থীকে এক একটি বিশেষ বিষয় নিয়ে জ্ঞানার্জনের পথে এগিয়ে যেতে হয়। কিন্তু, তা সত্ত্বেও শিক্ষার্থীকে একটি বিশেষ পর্যায় পর্যন্ত সংস্কৃতিপূর্ণ জ্ঞানের ঐক্যপূর্ণ মানসভূমিতে স্নাত হতে হবে। এই ধরনের সম্পর্কের ভেতর দিয়ে শিক্ষার্থীকে একটি প্রাথমিক বুনিয়াদ অর্জন করতে হবে, যার পরে বিশেষজ্ঞের শিক্ষা শুরু হতে পারে। সংস্কৃতিপূর্ণ শিক্ষার ব্যাপক ধারায় এমন কিছু সার্বিক মানবধর্মী উপাদান জানতে হবে যা যেকোনো শিক্ষার্থীরই জীবনের মূল ভিত্তি হতে পারে। শিক্ষাবিদেরা সেইজন্য শিক্ষার ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গিতে মূল্যবোধের একটি সাধারণ প্রাণকেন্দ্রের সার্বিক ঐক্যপূর্ণ বিন্যাসের উপর সঠিকভাবে জোর দিতে বলেছেন।

শিক্ষানীতিতে চেষ্টিতবাদ বা ফ্যাকালটি থিওরী নামে একটি মতবাদ এই কথা বলে, আমাদের মধ্যে যে অনুভূতি প্রবণতা, ইচ্ছাশক্তি, বিচারশক্তি, স্মৃতিশক্তি ইত্যাদি কর্মবৃত্তি আছে সেগুলির পৃথক পৃথক চর্চা প্রয়োজন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই ধরনের মতবাদ সংকীর্ণ ও একপেশে জ্ঞানার্জনের ভিত্তির কথাই বলে। সেইজন্য এই মত গ্রহণ যোগ্য হতে পারে না। সামগ্রিক জ্ঞানার্জনের নীতিই প্রকৃত শিক্ষানীতি—সমগ্র মানুষের সত্তা গড়ে ওঠার শিক্ষাই প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষাদর্শনের মূলনীতি। এরই উপর ভিত্তি করেই শিক্ষার মধ্য দিয়ে সামগ্রিক মানুষটির বহুমুখী কর্মবৃত্তির প্রকাশ প্রয়োজন। এইজন্য প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ন্যূনতম মূল্যবোধের সার্বিক ঐক্যবিন্দুতে গড়ে তুলতে হবে, যা হবে শিক্ষার বুনিয়াদ। এই জিনিসটি কখনো চেষ্টিতবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বা বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গিতে সম্ভব নয়। এজন্য চাই সংশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি। শিক্ষাদর্শনেরই তা এক অসামান্য অবদান। জ্ঞানবিজ্ঞানের যুগে বহুমুখী জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা বেড়ে গেছে

সন্দেহ নেই। কিন্তু, তা সত্ত্বেও জ্ঞানবিজ্ঞানের নানা সূত্র থেকে কিছু সাধারণ সূত্র সম্পর্কে মৌলিক ধ্যানধারণা গড়ে তুলতে হবে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মধ্যে।

এই দৃষ্টিভঙ্গির বাস্তবসম্মত রূপ দেখা যায় কিছু কিছু সমাজতান্ত্রিক দেশে, যেখানে শিক্ষার সর্বনিম্ন কর্মসূচীতে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও মানবসংস্কৃতির মহান অভিজ্ঞতাকে বাস্তব ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীর মনের মধ্যে গেঁথে দেওয়া হয়। একটি বিশেষ স্তর পর্যন্ত মৌলিকভাবে শিক্ষার্থীকে গড়ে তোলা হয়। তারপর তাকে জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে বিশেষধরনের পথে নিয়ে যাওয়া হয়। শিক্ষার নানা ধরনের সুনির্দিষ্ট পর্ববিভাগ অবশ্য সব দেশেই আছে। আমাদের দেশেও প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কলেজীয়, বিশ্ববিদ্যালয়ীয়, বৃত্তিমূলী প্রভৃতি নানা স্তর আছে। একটি স্তরের সঙ্গে আরেকটি স্তর কখনো বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না। এক স্তরের সঙ্গে আরেক স্তরের শিক্ষার সংহতিপূর্ণ বিন্যাস প্রয়োজন। প্রকৃত শিক্ষা কোনো বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা জিনিসটাই মানুষের জীবনব্যাপী সাধনা। কোন নির্দিষ্ট ছকে বা বাঁধাধরা কাঠামোর মধ্যে তাকে বেঁধে দেওয়া কঠিন। তবুও শিক্ষাব্যবস্থার ভেতর একটা প্যাটার্ণ বা ছক থাকে, যা সব দেশেই আছে।

তবুও শিক্ষার অব্যাহত ধারা বজায় রাখার জন্য শিক্ষার জন্য সমগ্র জীবনব্যাপী সাধনার কর্মসূচী চাই। মানুষের শিক্ষার বা অভিজ্ঞতা অর্জনের কোন বিরাম নেই, ছেদ নেই। তাই, রুটিন মাফিক তথা ফরম্যাল শিক্ষাসূচী শেষ হলেও অব্যাহত ধারায় শিক্ষার সাধনাকে ব্যাপক ও বিস্তৃতভাবে গ্রহণ করার জন্য যেকোনো দেশেরই পক্ষে অব্যাহত শিক্ষার কর্মসূচী গ্রহণ করতে হয় সুবিন্যস্তভাবে। একথা মনে রাখা দরকার যে, মানুষ কোনো না কোনো নতুন ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা আহরণ করে বাস্তব অবস্থার ভেতর দিয়ে। শিক্ষাসূচী সমাপ্ত করার পরেও তার সেই কাজ অব্যাহত রাখার প্রয়োজনীয়তা ফুরোয়নি। পুরাতন অভিজ্ঞতার আলোকে নতুন নতুন অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন করে অভিজ্ঞতাকে আরো ফলপ্রসূ ও শিক্ষণীয় করে তোলার একটি নৈতিক দায়িত্ব আছে শিক্ষার্থীদের। মানব অভিজ্ঞতার ধারাকে গতিশীল ও অব্যাহত রাখার তাগিদ কেউ উপেক্ষা করতে পারে না। এ দিক দিয়ে শিক্ষা জিনিসটাই একটি সক্রিয় ও গতিশীল পদ্ধতি বিশেষ।

শিক্ষার্থী যেসব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে তা সে আগামী দিনের অনভিজ্ঞ শিক্ষার্থীদের জন্য রেখে যায়। এই ভাবেই সমাজের ফলপ্রদ অভিজ্ঞতার

ধারা অব্যাহত হয়ে চলে এসেছে যুগ যুগান্ত কাল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো সংগঠিত মাধ্যমের ভেতর দিয়েই এইভাবে মানুষ তার সামাজিক কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে স্থায়িত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে আরো নতুন নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের পথে।

শিক্ষাব কাজ শুধু এই অভিজ্ঞতার ধারাকে বাঁচিয়ে রাখা নয়, তাকে সজীব ও প্রাণবন্ত করে গতিশীল করারও একটি সজ্ঞান প্রয়াস থাকে। এইভাবে পরিবেষ্টনী নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে এবং একটি সুনির্দিষ্ট পথে এগিয়ে যাওয়ার গতিশীলতা অর্জন করে। শিক্ষার মধ্য দিয়ে যেসব সামাজিক অভিজ্ঞতা স্থিতিস্থাপকতা লাভ করে, সেগুলির মধ্য দিয়ে আমরা সমাজের মৌলিক মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে পারি।

যুগের পরিবর্তন ও নানারকমের জটিল সমস্যা ও ঘটনাবর্তের আবেষ্টনীর মধ্যেও মৌলিক মূল্যবোধ সনাক্ত করে নিতে কোনো অসুবিধা হয় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্-এর যে আদর্শ প্রাচীন ভারতবর্ষে বা গ্রীসদেশে সমুচ্চারিত ছিল, যুগাদর্শের নানা টানা পোড়নেও সেই আদর্শের মৌলিক মূল্যবোধ কখনো পরিবর্তিত হয়ে যায়নি। বরং বিচিত্ররূপে ও প্রকাশে তার বিস্তৃতি সম্ভব হয়েছে। কিভাবে এইসব মৌলিক মূল্যবোধ অর্জন করা যাবে, তার পদ্ধতি বা উপায় পরিবর্তিত হতে পারে যুগাদর্শ অনুযায়ী। কিন্তু, তা সত্বেও মৌলিক মূল্যবোধের একটি সার্বজনীন স্থিতিস্থাপকতা থেকে যায় যা শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির চেতনায় মহামূল্যবান সম্পদ।

ব্যাপক অর্থে, শিক্ষা এই মহামূল্যবান সম্পদেরই ধারক ও বাহক। শিক্ষার ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী আরো বলা যায়, শিক্ষা শুধু মানুষকে তার পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার শক্তি যোগায় তা নয়, শিক্ষা মানুষকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশেব অন্যতম উপাদান হিসাবেই বাঁচিয়ে রাখতে চায়। ব্যক্তি ও সমাজের পরিপূর্ণ সম্পর্ক ও সঙ্গতির ভেতর দিয়ে সমাজ ও সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। মানুষ এইভাবে সমাজ ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ ও গতিশীল করে তোলার কাজে সক্রিয় ও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

শিক্ষা ব্যাপক অর্থে মানুষের চরিত্রকে গড়ে তোলে, একথাও বলা যায়। চরিত্র অর্থে এখানে মানুষের সামগ্রিক সত্তারই পরিপূর্ণ বিকাশকেই বোঝায়। একদিক থেকে চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব সমার্থক বলা যেতে পারে। নৈতিক বা আদর্শগত বা উদ্দেশ্যগত প্রেরণায় মানুষ যখন অনেককিছু সৎ, সদর্থক ও মানবিক

কার্যকরী গুণের অধিকারী হয়, তখন তার মধ্যে আমরা সুসংগঠিত সুশৃঙ্খল ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের সমাহার দেখতে পাই।

স্বামী বিবেকানন্দ যখন বলেছিলেন—আমি চাই মানুষ গড়ার শিক্ষা, আমি চাই মানুষ গড়াব ধর্ম, তখন মানুষের মধ্যে এই চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ সঙ্গতির কথাই তিনি বলেছিলেন। বর্তমানে গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক ভাবভাবনা ও উদ্দেশ্যমুখীনতার যুগে শিক্ষার ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গির তাৎপর্য অসীম গুরুত্ব অর্জন করেছে। গণতন্ত্র জিনিসটা হালকাভাবে আমরা অনেক সময় মনে করি একটা বিশেষ কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা।

প্রকৃত গণতন্ত্র জিনিসটা তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। গণতন্ত্রকে বলা যেতে পারে মানুষের সমষ্টিগত অভিজ্ঞতার দ্বারা অর্জিত এক ধরনের জীবন পদ্ধতি। সমাজের বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভাবাদর্শের মধ্যে চাই একটি পরিচ্ছন্ন, সুনির্দিষ্ট ও স্বাভাবিক জীবন পদ্ধতি, যার ভিত্তিমূলে থাকবে সমষ্টিগত অভিজ্ঞতায় অর্জিত মানব সংস্কৃতি ও কৃষ্টির মহামূল্যবান সম্পদরাজি। সামাজিক সংযোগ ও অভিজ্ঞতার আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে জীবন ধারার মধ্যে প্রয়োজন এক গভীর ঐক্যবোধ, যা মানবজাতির একান্তই নিজস্ব সম্পদ।

এমন শিক্ষা প্রয়োজন যা ব্যক্তিকে করে তোলে সমাজ সচেতন এবং সেই সঙ্গে প্রগতিশীল সামাজিক ধারার একটি অনিবার্য উপাদান হিসেবে তাকে রূপান্তরিত করে। সুশিক্ষিত নাগরিকত্বের মৌল আদর্শকে চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের আদর্শের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে ব্যক্তির সামাজিক প্রবৃত্তিকে পরিচালিত করতে হবে মানব কৃষ্টি ও সংস্কৃতির অব্যাহত, গতিশীল এবং সক্রিয় ধারায় এমনভাবে যার ফলে ব্যক্তিমন ও সমাজমন একাত্ম হয়ে যায়।

## প্রশ্নাবলী

১। শিক্ষা সম্পর্কে ধ্যানধারণার অন্ত নেই অথচ কোনো এক সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করতেই হয়—কি সেই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য?

২। শিক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য কোনখানে? শিক্ষককেই বা কেন মানুষ গড়ার কারিগর বলা হয়? একথা কি সত্যি. আধুনিক শিক্ষার প্রয়োজন শিক্ষক—শিক্ষার্থী—পাঠ্যবস্তু?

৩। শিক্ষার সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তি কি? শিক্ষার জন্য কোনো সামাজিক দূর লক্ষ্যের প্রয়োজনীয়তা আছে কি?

৪। শিক্ষার কর্মকেন্দ্রিক নীতি বিভিন্ন শিক্ষা-পদ্ধতির উল্লেখ করে বিশ্লেষণ করো।

৫। আধুনিক পরীক্ষা-পদ্ধতির জন্য যেসব চিন্তাভাবনা হয়েছে তার ভালো-মন্দ দিক সম্পর্কে নীতিগত বিশ্লেষণ দেখাও।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

# শিক্ষা ও সমাজ দর্শনের অভিব্যক্তি

# শিক্ষা ও সমাজদর্শনের অভিব্যক্তি

## ॥ ১ ॥

## ব্যক্তি ও সমাজতান্ত্রিক শিক্ষার আদর্শ প্রসঙ্গে অনিবার্যভাবে এসে পড়ে শিক্ষার বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর কথা

শিক্ষায় দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির সারবত্তা অনস্বীকার্য। শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে ধ্যান ধারণা না থাকলে শিক্ষার কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। শিক্ষককে এইজন্য অবশ্যম্ভাবীভাবে সত্যিকারের শিক্ষাদর্শনের আশ্রয় নিতে হয়। দার্শনিক পরিজ্ঞান না থাকলে শিক্ষার লক্ষ্য ও কার্যধারা নির্ণয় করা যায় না। দর্শনের সঙ্গে শিক্ষার একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে যা অস্বীকার করার উপায় নেই।

উপযুক্ত শিক্ষাদর্শনই আমাদের দিতে পারে এমন এক দার্শনিক স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি, যার সাহায্যে আমরা লক্ষ্য ও ধারণা সম্পর্কে নিখুঁত পরিচয় পেতে পারি। শিক্ষার উদ্দেশ্য ও পরিণতি সম্পর্কে সঠিক ধ্যানধারণা এবং সেইমতো অভিজ্ঞতার পথে জ্ঞানার্জনের পথে পদক্ষেপ নেওয়া শিক্ষার ক্ষেত্রে মহামূল্যবান ব্যাপার। এই প্রসঙ্গে আমরা জেন্টাইলের বিখ্যাত উক্তি স্মরণ করতে পারি। তিনি বলেছিলেন—শিক্ষার প্রকৃত পরিচয় অনুধাবন করতে হলে আমাদের অবশ্যই জানতে হবে দৃষ্টিভঙ্গির নিখুঁত তথা অবিকল প্রতিরূপকে।

যুগে যুগে বিভিন্ন দেশের শিক্ষাবিদেরা শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কাযধারা সম্পর্কে নানারকম দৃষ্টিভঙ্গির অবতারণা করেছেন। কিন্তু, একটু বিশ্লেষণ করে দেখলে দেখা যায়, তাঁরা সাময়িকভাবে যুগের দাবী অনুযায়ী কিছু বিক্ষিপ্ত মতামত প্রকাশ করলেও তাঁদের চিন্তাধারার ভেতর একটি সার্বজনীন ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

সাময়িক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে অনেক সময় শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে বলা হয়েছে যে, শিক্ষা মানে পরিপূর্ণ জীবনপ্রণালী আয়ত্ত করার কৌশল বা ব্যক্তিগত সংস্কৃতিচর্চা বা আভিধানিক জ্ঞান অর্জন বা ধর্মীয় লক্ষ্য পুরণ বা সৌন্দর্যচর্চা ও ব্যবহারিক প্রয়োজন বা বৃত্তিমুখী শিক্ষণ ইত্যাদি। কিন্তু, এইসব

লক্ষ্য কোনো গভীর তাৎপর্য প্রকাশ করে না। কেউ কেউ শিক্ষার নিকট লক্ষ্য নির্ধারণ করে দেখিয়েছেন যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষকে শিক্ষিত করে তোলা তথা শৃঙ্খলার অনুগামী করে তোলা, কেউ আবার শিক্ষার চরম লক্ষ্য নির্ধারণ করে দেখিয়েছেন যে, কৃত্রিম পরিবেশ গঠন করে শিক্ষার কাজ পরিচালনা করতে হবে। কিন্তু এইসব লক্ষ্য আমরা পরিপূর্ণ সত্য হিসেবে গ্রহণ করতে পারি না। তবে বিভিন্ন যুগের শিক্ষানায়কদের চিন্তাধারার ভেতর থেকে কিছু সত্য আমরা নিঃসন্দেহে আহরণ করতে পারি। সেই আলোকে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার একটি বিজ্ঞানসম্মত পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে পারি। সেইজন্য একটু বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ রয়ে গেছে।

শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে বিভিন্ন যুগে নানা পরস্পর বিরোধী মতামতও দেখা গেছে। কখনো সেগুলির সার্থকতা দেখা গেছে আবার কখনো সেগুলি ভ্রান্ত হিসেবে প্রতিপন্ন হয়েছে।

সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিতে শিক্ষার নানা লক্ষ্য থাকতে পারে কিন্তু ব্যাপক অর্থে শিক্ষার লক্ষ্য হবে গভীর তাৎপর্যবহ এবং সার্বজনীন। ব্যাপক অর্থে শিক্ষার লক্ষ্য হবে সুনির্দিষ্ট ও সুস্থির। মানুষের ব্যক্তিত্বকে সমাজমণ্ডিত করার কাজে একপ্রকার বিশেষ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিই হবে সত্যিকারের দিগ্‌দর্শন। এই প্রসঙ্গে এম. এল. জ্যাকস-এর মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন—আমাদের প্রথম দেখা উচিত সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত শিক্ষার লক্ষ্যকে। এই লক্ষ্য সম্পূর্ণতার পূর্ব শর্ত বিশেষ। সেইভাবে লক্ষ্যকে গ্রহণ করতে হবে যা সর্বজন গ্রাহ্য, সর্বজনবোধ্য এবং সর্বজন কর্তৃক উপাদেয়। এই বক্তব্য মনে রেখে বলা যায়, শিক্ষার লক্ষ্য এমনভাবে নির্দেশ করতে হবে যার দ্বারা শিক্ষার্থীরা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির সন্ধান পেতে পারে এবং সেই সঙ্গে ধৈর্য, বিশ্বাস ও চিত্তের প্রসারতা।

জন ডিউই বলেছিলেন, শিক্ষাকে এমন মূল বিষয় নিয়ে কাজ করতে হবে তা যেন শিক্ষার্থীকে সমকালীন সমাজ জীবনের দুরূহ জটিলতা অতিক্রম করতে সত্যিকার মানসিক ও নৈতিক অভ্যাস গঠনে সাহায্য করে। 'নৈতিক প্রজ্ঞা' বলতে যা বোঝায় তাই আয়ত্ত করা হবে শিক্ষার লক্ষ্য। এইভাবেই ধৈর্য, ন্যায়নীতি, বিশ্বাস, পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে ঐক্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত করা যেতে পারে। এইভাবেই সভ্যতার উত্তরণের পথে আশার আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠে। শিক্ষাদর্শনই এই দৃষ্টিভঙ্গি দান করে থাকে—তাই, প্রয়োজন এমন

এক ঐক্যপূর্ণ সাধারণ নিরিখ, যাকে ব্রুবেকার আখ্যায়িত করেছেন 'কমন ডিনোমিটার' হিসেবে। তার সাহায্যেই জগৎ ও জীবনের ক্ষেত্রে আমরা পথ চলার সত্যিকার দিগ্‌দর্শন খুঁজে পেতে পারি। শিক্ষার লক্ষ্য মানুষের জগৎ ও জীবনকে গভীরভাবে স্পর্শ করবে। শিক্ষার্থীর শিক্ষা এমনভাবে হবে যার ফলে সে সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূলনীতি আয়ত্ত করতে পারবে তার জীবনে। তার অভিজ্ঞতা আহরণের সুযোগ দিতে হবে এমনভাবে যাতে করে সে সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে ক্রমশ উত্তরণের মধ্য দিয়ে শরীর-মন-আত্মার পরিপূর্ণ ঐক্যের ফলপ্রদ অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে। শিক্ষা দর্শন এই দিক দিয়ে সত্যই এক মহান আদর্শেরই অভিব্যক্তি। আমাদের লক্ষ্য যাতে বিভ্রান্ত না হয়, সেজন্য প্রয়োজন পরিচ্ছন্ন, স্বচ্ছ ও বিজ্ঞান সম্মত দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি।

## ॥ ২ ॥

শিক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কোনো লক্ষ্যই চিরকাল স্থায়ী হয়নি। কখনো দেখা গেছে দুই বিপরীত আদর্শকে এক সঙ্গে মিলিয়ে দেবার প্রচেষ্টা কিন্তু তা ফলপ্রসূ হতে পারেনি। এই পরিস্থিতি স্মরণ রেখে পার্সিনান বলেছিলেন, যদি গ্রীক জীবনের আদর্শের সঙ্গে পিউরিটান সংস্কারের মিলন সম্ভব না হয় তাহলে তাদের ব্যবস্থাপনা থেকে উদ্ভূত শিক্ষার ধ্যানধারণার মধ্যে কোনো মিল খুঁজে পাওয়ার প্রচেষ্টা বৃথা পণ্ডশ্রমের সামিল। তবে আমাদের বক্তব্য এই, শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য কখনো নিছক সাময়িক প্রয়োজন সিদ্ধ করে না, তার লক্ষ্য সার্বজনীন এবং সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য। এইজন্য সত্যিকারের শিক্ষার লক্ষ্য এমনভাবে সুনির্বাচিত এবং সুনির্দিষ্ট হবে যা যে কোনো সামাজিক অবস্থা ও যুগের পরিপ্রেক্ষিতে কার্যকরী হতে পারে। লক্ষ্য এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যা সার্বজনীন মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। কোনো অর্ধসত্যের উপর ভিত্তি করে শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারিত হতে পারে না।

বিভিন্ন যুগের শিক্ষাদর্শ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মানুষের মূল্যবোধের আকাঙ্খা বিভিন্ন যুগেই বিভিন্নভাবে দেখা দিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার উপলব্ধিতে একটি মহাসত্য স্বীকৃত হয়েছে যাকে শাশ্বত বা চিরন্তন বলে কেউ কেউ আখ্যায়িত করেছেন। উপনিষদ, প্লেটো, খৃষ্টীয় মতবাদ প্রভৃতি দৃষ্টিভঙ্গির

মধ্যে স্বীকৃত হয়েছে মানুষ এই পৃথিবীতে এক স্বর্গীয় মহাদ্যুতিরই প্রকাশ কিন্তু আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেছে মানুষ তার সবকিছু শক্তি নিয়ে জয়ী হওয়ার জন্য এক উদগ্র নেশায় ভরপুর। প্রকৃতপক্ষে এইভাবে দেখা গেছে দুইটি মূল প্রবণতা, একটি শাশ্বত বা চিরন্তন মূল্যবোধের প্রতি আকর্ষণ, আর একটি যুগ মূল্যবোধের আর্তি। বর্তমান যুগে আমাদের সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে প্রতি মুহূর্তে আসছে নানা ঘাত প্রতিঘাত, সংঘর্ষ ও ভাঙচুর অথচ যদি সত্যিকার স্থায়ী সুখী ও নিরাপদ সমাজই মানুষেরই কাম্য হয়, তাহলে শিক্ষার একটি সঙ্গতিপূর্ণ সুস্থির লক্ষ্য বিন্দু গ্রহণ করে এগিয়ে যেতে হবে এই দুই মহাদর্শের মিলন ঘটিয়ে। একমাত্র শিক্ষার সার্বজনীন লক্ষ্য নির্ধারণ ও কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে এই দুই মহাদর্শের মধ্যে আমরা মিলন সংসাধিত করতে পারি। এজন্য চাই আমাদের গভীর জীবনদর্শন। শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে ঐক্যবোধ ও সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি। কার্যকরী উপায় সম্পর্কে যুগের দাবীর প্রতি মমত্ববোধ ও পরিচ্ছন্ন চেতনা।

এই দৃষ্টিভঙ্গি সম্মুখে রেখে আমরা ভারতের শিক্ষা দর্শনের সঙ্গে পাশ্চাত্যের শিক্ষাদর্শনের গভীর ঐক্যের দিকটি খুঁটিয়ে বিবেচনা করে দেখতে পারি। উভয়ের অসঙ্গতি কোন্‌খানে সে সম্পর্কেও কিছু আলোকপাত করে একটি সার্বজনীন শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন ধ্যানধারণা লাভ করতে পারি।

## ॥ ৩ ॥

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে শিক্ষার এক মহান দীপশিখা প্রজ্জ্বলিত হয়ে এসেছে। তার প্রথম থেকেই লক্ষ্য ছিল, যে বিদ্যা আমাদের মুক্তি দেয়, সেই বিদ্যাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। এই বিদ্যা আমাদের দেয় আত্মজ্ঞান এবং পরিপূর্ণ মুক্তির নির্দেশ। অবিদ্যা মানেই অন্ধকার, অজ্ঞানতা এবং বন্ধন বা দাসত্ব। অবিদ্যার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাবার আর্তিই প্রকৃত বিদ্যা। এই মহান আদর্শ সম্মুখে রেখে ঋষিরা উচ্চারণ করেছিলেন—'বিদ্যাবিহীন চক্ষুঃ' 'যাবজ্জাবমধীতে বিপ্রঃ', 'বিদ্যা বন্ধুজনো বিদেশ গমনে', 'জ্ঞানং তৃতীয়ঃ মনুজস্য নেত্রং সমাততত্ত্বার্থবিলোক দক্ষম্‌' প্রভৃতি প্রবচন।

আত্মজ্ঞান লাভই ছিল প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। দর্শনের সঙ্গে জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের সূত্রেই সেদিন গ্রহণ করা হয়েছিল

শিক্ষাদর্শকে। সত্যকে অনুসন্ধান করার জন্য ঋষিরা প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন হোমের অনল। এই আদর্শই ভারতবর্ষ বহন করে এসেছে যুগে যুগে। ফলে দেখা যায়, কি প্রাচীন ভারতের হিন্দুদের মধ্যে, বা পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ও জৈনদের মধ্যে, শিক্ষার মূল ভাবাদর্শের মধ্যে দর্শন ও জীবনের এক নিগূঢ় সম্পর্ককেই বড়ো করে দেখা হয়েছে। নির্লিপ্তভাব অর্জন করাই শিক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ বলে গৃহীত হয়েছে—এই নির্লিপ্তভাব মানে নির্বিকার বিচ্ছিন্নতাবোধ নয়, এর অর্থ জগৎ ও জীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে বিশ্ববোধকে লাভ করা। ধ্যানে মননে, চিন্তনে, অভ্যাসে, আচরণে সর্বত্রই এই বোধ। ভারতের ধর্মকে পাশ্চাত্য 'রিলিজিয়নের' দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করা যায় না। এখানকার ধর্ম মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনকে জড়িয়ে এমন এক উচ্চ আদর্শে প্রোথিত যা সংগঠিত ধর্ম প্রতিষ্ঠানের আলোকে ব্যাখ্যা করা যায় না। মানুষের জীবনবোধ ও মূল্যবোধের সঙ্গে শিক্ষাকে নিবিড়ভাবে একাত্ম করে এখানে দেখা হয়েছে। মানুষের জীবন পরিকল্পনা, মূল্যবোধ, জ্ঞানবিজ্ঞানের নীতি ইত্যাদি সব কিছুই এখানে মৃত্যুকে জয় করবার সাধনার অন্তর্ভুক্ত। আদর্শ ছিল—'যে নাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্'। সমগ্র সৃষ্টির তাৎপর্যকে উপলব্ধির মধ্য দিয়ে জীবনবোধের গভীর ধ্যানধারণাই ছিল ভারতীয় শিক্ষা ও সাধনার শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য। এখানে মানুষের মন বস্তুকে নিছক বুদ্ধিগত ব্যাপার হিসেবে না দেখে তাকে আধ্যাত্মিক নীতি হিসেবে গ্রহণ করেছিল। বস্তুগত জ্ঞানের দ্বারা মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলা উদ্দেশ্য ছিল না। ধ্যানধারণার মধ্য দিয়ে মানুষের অন্তর প্রদেশের গভীর তলদেশে আত্মজ্ঞানের নিরিখ খুঁজে পাওয়ার জন্য ছিল এক অদম্য আকুতি। পরমের মধ্যে নিজের ক্ষুদ্রত্বের অবগাহন বা বিস্তৃতিই ছিল ব্যক্তি জীবনের পক্ষে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আদর্শ। প্রাচীন ভারতের এই ধরনের শিক্ষানীতির সারার্থ প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ করে ডঃ রাধাকুমুদ মুখার্জী দেখিয়েছেন যে, ভারতবর্ষে শিক্ষা অবশ্যই আত্ম-পরিপূর্ণতার আদর্শকে সাহায্য করে এসেছে। বস্তুগত জ্ঞানের তথ্য স্তূপ অর্জনকে সে প্রাধান্য দেয়নি। আলতেকর দেখিয়েছেন, শরীর, মন, বুদ্ধি ও আত্মা মিলিতভাবেই মানুষের সত্তাকে গঠন করে। এইদিক দিয়ে প্রাচীন ভারতবর্ষের শিক্ষার লক্ষ্য ও আদর্শ ছিল মহান আদর্শের যুগপৎ সুসমঞ্জস বিকাশ ঘটানো।

উপনিষদে বলা হয়েছিল, মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ উপায় প্রেয় ও শ্রেয়। কর্ম ও ধর্মের মধ্য দিয়ে প্রেয় লাভ করা ছিল মানুষের আকাঙ্খার বস্তু। গভীর ধ্যান ও আত্মজ্ঞানের মধ্য দিয়ে শ্রেয় বা পরম কল্যাণকে লাভ করা ছিল মানুষের প্রকৃত সাধনা। 'পরাবিদ্যা' সেই বিদ্যা যা আমাদের প্রকৃষ্ট প্রজ্ঞার দীপ্তি প্রজ্জ্বলিত করে। 'অপরাবিদ্যা' নিছক প্রয়োজনের বিদ্যা, ফলে তা আত্মজ্ঞানের গভীর প্রসারতা আনতে পারে না। আমি চিদ্, আমি আত্মা, এই ছিল প্রকৃত জ্ঞান বা প্রকৃত বিদ্যা। ভাগবত গীতায় কর্মের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণতা লাভের তথা দিব্যজ্ঞানের আলোক দীপ্তি অর্জনের নির্দেশ আছে। বৌদ্ধ শিক্ষায়ও দেখা যায় হিন্দু শিক্ষার মতো ব্রহ্মার্থ সাধনার তাৎপর্য। বুদ্ধের আদর্শ ছিল 'বোধির শিক্ষা। 'বোধিসত্ত্ব' আদর্শ মানুষকে চরম সত্তা ও পরম কল্যাণেরই নীতি নির্দেশ করেছে। ধম্মপদ বলেছিলেন—আন্তরিক ধ্যানধারণা থেকেই প্রজ্ঞার জন্ম, তার অভাবেই প্রজ্ঞার বিলুপ্তি। বুদ্ধের আদর্শ ছিল, শিক্ষার মধ্য দিয়েই মানুষ গভীর জ্ঞান অর্জন করে সার্থক হতে পারে। বুদ্ধ দেখিয়েছিলেন —মহাসমুদ্র আচমকা গভীর নয়, পর্যায়ক্রমে গভীর ও অতলান্ত। এই আলোকেই তিনি বলেছিলেন মানুষের জন্য উপযুক্ত সদর্থক শিক্ষা ও শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে চাই পর্যায়ক্রমিক শিক্ষাদান, পর্যায়ক্রমিক বাস্তব অনুশীলন এবং পর্যায়ক্রমিক উন্নতি। শিক্ষার লক্ষ্য হবে কিভাবে শিক্ষার্থীকে তার জীবনের মধ্যে অফুরন্ত বা অসীমের জন্য প্রাথমিকভাবে প্রস্তুত করা যায়। মানুষ ক্রমিক শিক্ষার মাধ্যমে ক্রমশ মৃত্যুর হাত থেকে সত্তার দিকে, অমৃতের দিকে এগিয়ে যায় পুনরায় সত্যিকারের জীবন লাভের জন্য। শিক্ষা সেই অর্থে মানুষকে একটি দ্বিতীয় জন্ম দেয়। কি ব্রাহ্মণ্য শিক্ষায়, কি বৌদ্ধ শিক্ষায় এই নীতি অনুসৃত হয়েছিল ভারতবর্ষে।

স্বামী বিবেকানন্দ দেখিয়েছিলেন মানুষের মন আসলে এক অফুরন্ত সম্পদের খনি। শিক্ষার মধ্য দিয়ে মানুষ নিজেকে আবিষ্কার করে তোলে এবং উন্মোচিত করে তোলে। প্রকৃত শিক্ষা মানুষের আত্মার অবিদ্যারূপী আবরণ উন্মোচন করে দেয়। কচি গাছকে যেমন পরিচর্যা করে বাড়িয়ে তোলা যায়, তেমনি শিশুকেও—কচি গাছ বা শিশু শেষ পর্যন্ত তার নিজের প্রকৃতি অনুযায়ীই বেড়ে ওঠে, তার বেশি সাহায্য তাকে করা যায় না। শিশুর মধ্যেই একরকম সুপ্ত শিক্ষক লুক্কায়িত হয়ে আছে, তার ভেতরেই আছে অফুরন্ত জ্ঞান ও শক্তির

ভাণ্ডার। একটু আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেবার মতো ইঙ্গিতই যথেষ্ট। তার সাহায্যেই সে তার নিজস্ব প্রকৃতি ও শক্তি অনুযায়ী গড়ে উঠবে। বাইরের শিক্ষক শিশুর অন্তরের শিক্ষককে জাগিয়ে দেবেন মাত্র। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনেও আমরা পাই শিক্ষার সাধনায় হৃদয়ের, মনের এবং ইচ্ছাশক্তির স্বাচ্ছন্দ্য বা স্বাধীনতার কথা। তিনিও দেখিয়েছেন, একমাত্র স্বাধীনতার পথেই মানুষের অন্তঃস্থিত বিরাট ব্যক্তিত্ব বা পুরুষকে জাগিয়ে দেওয়া সম্ভব। শিক্ষার লক্ষ্য তাই হবে সেই অফুরন্ত বিরাট অন্তঃস্থিত শক্তিকে জাগিয়ে দেওয়া। তাঁর মতে, সর্বোচ্চ শিক্ষার আদর্শ তথ্য স্তূপের কচকচানি নয়। প্রকৃত শিক্ষা মানুষের পরিপূর্ণ অস্তিত্বের সঙ্গে বা সত্তার সঙ্গেই হবে সঙ্গতিপূর্ণ। জীবন লীলার ক্ষেত্রে শিক্ষা জিনিসটি একটি স্থায়ী সাধনার ব্যাপার। এ যেন কোনো রোগের তাৎক্ষণিক চিকিৎসার মতো ব্যাপার নয়, আসলে তা মনের সজীবত্বকে স্বাভাবিক পথে বিকশিত করে তোলাই তার কাজ। জীবনকে সামগ্রিক সত্তার সঙ্গে গড়ে তোলা, শিক্ষাকে জীবনের উচ্ছল আনন্দের স্থায়ী অংশ হিসেবে গ্রহণ করা, মনের সজীবতার স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ সাধনে সাহায্য করা, সম্পূর্ণ জীবনের সঙ্গে শিক্ষার সংযোগ সাধন করা ইত্যাদি মূল্যবান নীতিগুলিই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনের সারকথা। আমাদের সর্বপ্রকার সত্তার সঙ্গে, পরিবেশের সঙ্গে জৈবিক নাড়ীর সংযোগ চেয়েছেন বলেই তাঁর কাছে শিক্ষা ও জীবন অভিন্ন। মহাত্মা গান্ধী শিক্ষার্থীর শরীর, মন ও আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশকে শিক্ষার অপরিহার্য বস্তু হিসেবে গ্রহণ করে শিক্ষার্থীর শ্রেষ্ঠ অংশকে উদ্বোধিত করার জন্য সৃষ্টিশীল কর্মভিত্তিক শিক্ষা ও হৃদয়ের শিক্ষার উপর জোর দিয়েছিলেন। শ্রীশ্রীঅরবিন্দ মনে করেছিলেন, প্রকৃত শিক্ষার বিষয়বস্তুতে আছে মানুষের মনকে বিচার করার ব্যাপার। মনের সবুজ স্বাভাবিকতার দিকেই তিনি নজর দিয়ে বলেছিলেন যে, মানুষের মন ঠিক কাঠকয়লা পাথরের মতো জিনিস নয়। সেইজন্য তিনি পুঁথিগত চর্চার উপর জোর না দিয়ে বলেছিলেন শিক্ষার কাজ জড়বস্তু পিণ্ডকে নিয়ে নয়, রক্তমাংসের শরীর মন নিয়ে তার কাজ কারবার। স্বর্গীয় পবিত্রতা লাভের আদর্শই সবচেয়ে বড়ো জিনিস—তাই প্রয়োজন মানুষের আত্মার যথার্থ ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত প্রকাশ। শিক্ষার প্রধান ভিত্তি মানুষের মনকে জানা, সে শিশু হোক, বয়ঃসন্ধির তরুণ হোক আর বয়স্ক হোক। প্রাণ নিয়ে শিক্ষার কাজ কারবার, সবুজ মন নিয়েই শিক্ষার যা-কিছু ব্যাপার।

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের শিক্ষাচিন্তায় আমরা দেখতে পাই শিক্ষাধর্ম সমন্বয়ের আদর্শ। তাঁর মতে, শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন জ্ঞানের মধ্যে গড়ে তুলবে সমন্বয়বোধ এবং এইভাবে জগৎ ও জীবনের নিখুঁত ও পরিচ্ছন্ন ধারণা নিয়ে, পরিপূর্ণ সংশ্লেষাত্মক মন গড়ে তুলে জগৎ ও জীবনের সবকিছু সমস্যার সমাধান করবে।

এইভাবে দেখা যায় ভারতের শিক্ষাদর্শনের ভিত্তিভূমিতে একটা আত্মজ্ঞান বা আত্মসিদ্ধি লাভের সাধনার কথা আছে। পুঁথিগত চর্চা ও বস্তুর নিছক সমাবেশ বা উপকরণের দিকে এই শিক্ষাদর্শনে বাস্তত জোর নেই। যুগাদর্শের দাবীতে ভারতের এই আধ্যাত্মবোধ ও পাশ্চাত্য জগতের অবদান হিসেবে বস্তুবাদ ও বিজ্ঞান চেতনাকে কিভাবে শিক্ষাদর্শের মধ্যে এক নিগূঢ় সম্পর্কে গ্রথিত করা যায়, সেই দিকে ভারতের আধুনিক শিক্ষা দার্শনিকদের চিন্তাভাবনা।

## ॥ ৪ ॥

সক্রেতিসের দৃষ্টিতে শিক্ষা ছিল বাইরের থেকে কোনো আরোপিত ব্যাপার নয়। তাঁর মতে, আমাদের অন্তর্নিহিত আত্মার অভ্যন্তরে সৌন্দর্য আরোপ করো, দেখবে বাইর ও অন্তরের মানুষ এক জায়গায় মিলে গেছে অনুপম সুন্দর হয়ে। প্লেটোর আদর্শ ছিল আত্মচক্ষুর উন্মীলন। তিনি বলেছেন—শিক্ষার উদ্দেশ্য সমগ্র আত্মাকে এমনভাবে নিবদ্ধ করা যার ফলে আত্মচক্ষু বা যুক্তি সঠিক পথে পরিচালিত হয়। শিক্ষা কোনো নতুন নীতির জন্ম দেয় না, যে নীতি স্থিত আছে তাকেই সে পথ দেখিয়ে দেয় এইমাত্র। অ্যারিস্ততল মহত্বের আদর্শ, কল্যাণের আদর্শ ও সুখশান্তির আদর্শকে বড়ো করে দেখেছিলেন।

পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রথম কেন্দ্রবিন্দু ছিল গ্রীসদেশ। সেখানকার মানুষ এক অপূর্ব সংস্কৃতিগত চেতনায় স্নাত হয়ে শিক্ষাদীক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চা করেছিলেন সে যুগে। ভারতীয় দার্শনিকদের মতো এঁদের দূরদৃষ্টিতে ছিল 'অনুভূতি' বা 'প্রজ্ঞা' বা 'বোধি'র কথাই। তবে এঁরা যুক্তিবাদ মানবতাবাদ ও নাগরিকত্ববোধের সমন্বয় সাধন করে শিক্ষার মধ্য দিয়ে মানুষের অন্তঃস্থিত ধর্মকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন এমনভাবে যার ফলে ব্যক্তি-ধর্ম ও প্রতিষ্ঠানগত-ধর্ম সেখানে এক অপূর্ব সমন্বয়ে গড়ে উঠতে পেরেছিল। জ্ঞানের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ, স্বাধীনতা, কল্যাণের আদর্শ, মানবতার আদর্শ, সমাজকল্যাণের আদর্শ

গ্রীক জীবনের এক বিশেষত্ব ছিল বলেই তাঁরা শিক্ষাকে মনে করেছিলেন প্রাথমিক এবং সবচেয়ে সুন্দরতম জিনিস হিসেবেই।

কিন্তু এই গ্রীক শিক্ষাদর্শের বিপরীতভূমি দেখা দিয়েছিল স্পার্টার শিক্ষাদর্শে। সেখানে আনুগত্যের নীতিই প্রধান হয়ে উঠেছিল। মানুষকে সাহসী করে তোলা, রাষ্ট্রযন্ত্রের অনুগত করে তোলা এবং ধৈর্যশীল হওয়ার শিক্ষা দেওয়া এমন এক চরম রূপ নিয়েছিল যার ফলে ব্যক্তি স্বাধীনতা চুরমার হয়ে গিয়ে সেখানে মানুষ পরিণত হয়েছিল যন্ত্রের ক্রীড়নক হিসেবে এবং জড়বস্তুর ক্রীতদাস রূপে।

মধ্যযুগে খৃষ্টীয় ভাবাদর্শে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মঠ গড়ে ওঠে। বাইবেলের নির্ধারিত পথে শিক্ষাদর্শ পরিচালিত হলেও শেষ পর্যন্ত পাদ্রীদের দৌরাত্ম্যের ফলে শিক্ষার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় প্রভাব শুরু হয়। একথা অনস্বীকার্য, খৃষ্টীয় আদর্শে শিক্ষার রূপায়ণে নানা বাধাবিপত্তি এলেও খৃষ্টীয় দর্শনের মধ্যে কিছু সারবত্তা রয়েছে যা অবহেলার বিষয় নয়। এই মতাদর্শে আছে ভগবান তাঁর নিজস্ব মূর্তিতে মানুষকে গড়ে তুলেছেন—তাই মানুষের মধ্যেই আছে ভগবানের গুণাবলী। প্লুতার্ক এক সময় বলেছিলেন—শিক্ষার মধ্য দিয়ে অভ্যাস, যুক্তি ও স্বভাব গড়ে তোলা যায়। কুইনতিলিয়নের মতে শক্তিলাভই শিক্ষার লক্ষ্য। ইলিয়ট চেয়েছিলেন মহৎ শিশু তার নিজের স্বাভাবিক ক্ষমতা অনুযায়ী পরিপূর্ণ শিক্ষা নেবে। লয়লার মতে, সেবা ও ভগবানের প্রীতি, মহত্ত্বের চর্চাই হবে শিক্ষার কাজ। মিলটন সম্পূর্ণ শিক্ষা বলতে বুঝেছিলেন এমন শিক্ষা যা মানুষকে যথার্থভাবে দক্ষতার সঙ্গে গৌরবের সঙ্গে সর্বপ্রকার কাজ করবার ক্ষমতা দেয়।

খৃষ্টীয় দর্শনের মূলনীতি অনুসরণ করে সেণ্ট অগাস্টাইন বলেছিলেন, যখন প্রশ্ন হোলো যে মানুষ সৎ, তখন আর দেখতে হয় না সে কি ধরনের বিশ্বাস বা ধ্যান ধারণা পোষণ করে। কেননা, আসল জিনিস হোলো তার প্রীতির আদর্শ। মানুষ ভগবানের এবং মানুষের সন্তান। তার মধ্যে যে মহত্ত্ব লুকিয়ে আছে তাকে উদ্‌ঘাটিত করাই আসল কাজ শিক্ষার। বিশ্বাস, আশা ও দয়াদাক্ষিণ্য, এই তিন নীতির উপর খৃষ্টানরা বেশি নির্ভর করেছিলেন। পরবর্তীকালে দেখা গেল, মানুষের মধ্যে ভগবানের একাত্মতা বড়ো করে দেখার প্রবণতা। এই আদর্শের সঙ্গে ভারতীয় বেদান্ত দর্শনের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

আধুনিক যুগে স্যার ফ্রেড ক্লার্ক, জ্যাকস্, রীড প্রমুখ শিক্ষা-দার্শনিকেরা খৃষ্টীয় শিক্ষা-দর্শনকে নিছক 'ক্রীড' বা মতবাদ হিসেবে না দেখে ধর্মের মর্মার্থকে শিক্ষার

অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করতে পরামর্শ দিয়ে বলেছেন যে, অনুধ্যানের মাধ্যমে মানুষ যেন নিজেকে ভগবানের সঙ্গে একাত্ম করে এক সৃষ্টিশীল ও দৃষ্টিশীল জীবনধারার অনুগামী হয়। এই ভাবধারার বিশেষত্ব লক্ষণীয়।

পাশ্চাত্য শিক্ষা-দার্শনিকদের চিন্তাধারার মধ্যে আমরা নানারকম বৈচিত্র্য-মূলক মতবাদের সন্ধান পাই।

কমেনিয়াস বলেছিলেন শিক্ষা আসলে মানুষের মধ্যে গড়ে তুলবে কিছু মহৎ গুণাবলী যেমন—নম্রতাবোধ, সমাজবোধ, ভদ্রতাবোধ ইত্যাদি।

লক চেয়েছিলেন সুস্থ দেহে সুস্থ মনের অধিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষণ।

হেগেল রাষ্ট্রগত আদর্শকে শিক্ষাগত জিনিস মনে করে সমকালীন প্রতিষ্ঠানের ভাবধারার সঙ্গে ব্যক্তির একাত্মতা নিবিড়ভাবে চেয়েছিলেন।

রুশো চেয়েছিলেন মানুষের ভাগাবিচারকেই সবচেয়ে উঁচুতে স্থান দিতে এবং এই নীতি অনুযায়ী তিনি চেয়েছিলেন মানুষ ব্যক্তিত্বে একক হলেও সামাজিক কাজকর্মের মধ্য দিয়ে সে হবে একাত্ম। এইজন্য তিনি মানুষের মনকে তথ্যস্তূপে ভারাক্রান্ত করার বিরোধী ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন মানুষ শিখে নিক জ্ঞান অর্জনের কলাকৌশল। নির্লিপ্তভাবে এবং স্বাভাবিকভাবে সবকিছু চেনা, দেখা, করার যে অভ্যাস, যা ঠিক অভ্যাসের নামান্তর নয়, আসলে মনের স্বাভাবিক কর্মবৃত্তি, তাকেই তিনি মূল্য দিয়েছেন সবচেয়ে বেশি করে।

মহামতি কাণ্ট চেয়েছিলেন মানুষের সর্বপ্রকার মহত্ত্বের উদ্‌বোধন। পেষ্টালজী দেখিয়েছিলেন কিভাবে শিক্ষার মধ্য দিয়ে মানুষের সর্বপ্রকার ক্ষমতা, অনুরাগ ও দক্ষতার স্বতঃস্ফূর্ত, স্বাভাবিক, প্রগতিশীল পর্যায়ক্রমিক সুসঙ্গত বিকাশ সাধন করা যায়।

হার্বার্ট শিক্ষার লক্ষ্যের সঙ্গে একাত্ম করে দেখেছিলেন চরিত্রগঠন তথা নৈতিকতার শিক্ষণকে। ফ্রোয়েবেল মনে করেছিলেন মানুষের অন্তঃস্থিত স্বর্গীয় প্রতিভার স্ফুরণই কাম্য এবং এইভাবে অন্তরকে বাইরে প্রকাশিত করা, বাইরকে অন্তরে সঞ্চালিত করে সুসঙ্গতি অর্জন করাই শিক্ষার কাজ।

শিক্ষাদর্শনের ভেতর বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার প্রবর্তন করে মহামতি বেকন বলেছিলেন, বিজ্ঞানের মধ্য দিয়ে মানুষকে নতুন পরিণতির জন্য গড়ে তোলাই হবে শিক্ষার আসল কাজ।

গ্রাণ্ডভিগ্‌ চেয়েছিলেন জনগণের অন্তরাত্মাকে প্রজ্জ্বলিত করার উদ্দীপিত শিক্ষাদর্শন। নিউম্যান চেয়েছিলেন মানুষকে সমাজের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে।

হার্বার্ট স্পেনসার বলেছিলেন শিক্ষার মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ জীবন যাপনের জন্য মানুষের যা-কিছু কর্মবৃত্তি আছে তাকে সর্বোচ্চ সুযোগ দিয়ে কাজে ব্যবহারের উপযোগী করে গড়ে তোলার কথা।

এমার্সন দেখেছিলেন জীবনের উদ্দেশ্যের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক—তাই, তিনি চেয়েছিলেন কিভাবে মানুষ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে, নীতিবোধের সঙ্গে স্বর্গীয় সত্তার সঙ্গে একাত্ম হতে পারে।

জন ডিউই অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে শিক্ষাদর্শনকে যুগোপযোগী, বিজ্ঞান-ধর্মী, অভিচেতা-কেন্দ্রিক করতে গিয়ে বলেছিলেন, শিক্ষার অপর নাম অভিজ্ঞতার পুণর্গঠন। মানুষের মৌলিক স্বভাব গঠনের উপর তাঁর বিশ্বাস। সেইজন্য তিনি বুদ্ধিগত ও ভাবগত প্রবণতাকে প্রকৃতি ও সমাজের দিকে পরিচালিত করার নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন, শিক্ষাই আসলে জীবন, শিক্ষার ধারা সারা জীবন-ব্যাপী এক অব্যাহত ব্যাপার, শিক্ষায়তনের কাজ হবে কিছু তাৎক্ষণিক জ্ঞানের আদানপ্রদান নয়, ববং জীবন থেকেই কিভাবে যোগ্যতার সঙ্গে সবকিছু শেখা যায় তারই ব্যাপার।

জন ডিউই-র ভাষ্যকার হর্ণী বলেছিলেন, শিক্ষা এক ধরনের সর্বোচ্চ উপযোজনার ক্ষমতা এনে দেয় যার সাহায্যে একজন সজ্ঞান প্রাণী তার বুদ্ধিগত, ভাবগত ও ঐচ্ছিক অভিজ্ঞতাকে আরো শারীরিক ও মানসিক কর্মক্ষমতা বা যোগ্যতা নিয়ে মোকাবিলা করতে পারে।

বার্ট্রাণ্ড রাসেলের মতে শিক্ষার কাজ চরিত্র ও জ্ঞানকে গড়ে তোলা এবং আদর্শ চরিত্র বলতে বোঝায় সজীবতা, সাহস, অনুভূতি প্রবণতা ও বুদ্ধির সমাহার। হোয়াইটহেড্‌ শিক্ষার মধ্য দিয়ে জীবন্ত অভিজ্ঞতা গড়ে তোলার পক্ষপাতী—তাঁর মতে, এই অভিজ্ঞতার ভিত্তি হবে ভাবমূলক। আলডুস হাক্সলি নৈতিক ও বুদ্ধিগত শিক্ষার তাৎপর্যকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

এইভাবে দেখা যায়, পাশ্চাত্যের শিক্ষাবিদ্‌গণ শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গিতে অনেক মূল্যবান দিকদিগন্তের ইশারা করেছেন। কি প্রাচ্যে, কি পাশ্চাত্যে, এইভাবে শিক্ষা-দার্শনিকেরা

মানুষকেই গুরুত্ব দিয়েছেন বেশি এবং সেইজন্য সম্পূর্ণ মানুষটির উদ্‌বোধনের জন্য পথনির্দেশ করেছেন যার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অসাধারণ।

॥ ৫ ॥

তত্ত্বগত দিক দিয়ে দেখা যায়, শিক্ষা-দার্শনিকেরা শিক্ষার ক্ষেত্রে বহুমুখী দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির অবতারণা করেছেন। এর ফলে আমরা শিক্ষার ক্ষেত্রে আদর্শবাদ, প্রয়োগবাদ, স্বভাববাদ, বস্তুবাদ, গতিশীল মানবতাবাদ, গণতান্ত্রিক মতবাদ প্রভৃতি নানা দৃষ্টিভঙ্গির সন্ধান পাই। এইসব মতবাদের অভ্যন্তরে অনেক সারবত্তা আছে যা উপেক্ষণীয় নয় বরং একটি সার্বজনীন মূল্যবোধের মাপকাঠিতে এইসব মতবাদের সারবত্তাকে যাচাই করে তা থেকে শিক্ষণীয় উপাদান গ্রহণ করা সম্ভব।[১৫]

মানুষকে আধ্যাত্মিক দ্যুতির প্রকাশ হিসেবে দেখা আদর্শবাদী শিক্ষা-দার্শনিকদের একটি মহান কাজ। আদর্শবাদী দর্শনে আধ্যাত্মিক মূল্যকে শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয় রূপে চিন্তা করা হয়েছে। মানুষের কাছে আধ্যাত্মিক পরিবেশের গুরুত্ব প্রাকৃতিক পবিবেশের চেয়েও বেশি, এই ধারণা এখানে পোষণ করা হয়। আমাদের জীবনকে অনন্তের মধ্যে ব্যাপ্ত করে তোলা এবং বিশ্বজনীন আত্মার সঙ্গে জীবনকে সংযুক্ত করার যে মহত্ত্ব, সেই অনুধ্যানই এই দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির মুখ্য কথা। কিভাবে শিক্ষার মধ্য দিয়ে জীবনের মধ্যে আধ্যাত্ম সংযোগ সাধন করা যায় এবং মানুষের ব্যক্তিত্বের সারসত্তা, জীবনের মূল্যবোধ, ঐশ্বর্য ও সম্পদকে কিভাবে মেনে নেওয়া যায় সে বিষয়েই আধ্যাত্মবাদী আদর্শবাদী শিক্ষা-দার্শনিকগণ চিন্তা-ভাবনা করে দেখেছেন। এই মতাদর্শ অনুযায়ী বলা যায়, শিক্ষার লক্ষ্য হোলো আত্মার সম্পদ বা ঐশ্বর্যকে অনুভব করতে শেখা। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী পাশ্চাত্য দেশের সক্রেতিস, প্লেটো, কান্ট, রুশো; ফ্রোয়েবেল, পেষ্টালজী, হার্বার্ট প্রমুখ শিক্ষাবিদেরা এবং প্রাচ্য দেশের স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীশ্রীঅরবিন্দ, রাধাকৃষ্ণণ, কনফুসিয়াস, হোনেন প্রমুখ শিক্ষা-দার্শনিকেরা শিক্ষার ভেতর আধ্যাত্মিক মূল্যবোধকেই শ্রেয় ও প্রেয় হিসেবে জ্ঞান করে আত্মবীক্ষাকেই জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব অর্জনের উপায় হিসেবে গণ্য করেছেন দেখা যায়। আত্মজ্ঞানের দিব্য আলোকে অনুভূতিসম্পন্ন মানুষকেই বলা হয়েছে প্রাজ্ঞ বা বিদ্বান হিসেবে। শিক্ষার ভেতর দিয়ে আমাদের মন, কল্পনা, সৌন্দর্যপ্রবণতা, জীবন ও অভিজ্ঞতার মধ্যে পরমের দ্যুতির প্রকাশনা ও সম্প্রসারণা মহামূল্যবান নৈতিক কাজ হিসেবে গণ্য হয়েছে এইসব শিক্ষাবিদ্‌দের চিন্তাধারায় এবং এই মতাদর্শ আদর্শবাদেরই প্রকাশ।

প্রয়োগবাদীরা অভিজ্ঞতার মূল্যকেই স্বীকার করেন। আদর্শবাদীদের মতো পরম বস্তুর প্রতি এঁদের কোনো মোহ নেই। মানবিক উদ্দেশ্যে অভিজ্ঞতার মূল্যকে স্বীকার করে নিয়ে এঁরা চান ব্যক্তিগত চাহিদা ও সামাজিক মূল্যবোধের মধ্যে এক পরিপূর্ণ সুসঙ্গতি। জেমস্ এই মত পোষণ করে বলেছিলেন, অভিজ্ঞতার কোনো মূল্য নেই যতক্ষণ না তা ব্যবহারিক প্রয়োজন সিদ্ধ করছে। পিয়ার্সের মতে, আমাদের বিশ্বাস বা ধ্যানধারণা এগুলি আসলে আমাদের ব্যবহারিক কাজকর্মের

ফল এবং এর মধ্য দিয়েই আমাদের চিন্তার গভীরতম অর্থ খুঁজে পেতে হবে। শিলার মনে করেছিলেন যুক্তিবাদ, কল্যাণমূলক আদর্শ, সৌন্দর্য প্রবণতা প্রভৃতি গুণাবলীর মধ্যে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব। প্রয়োগবাদীদের বিশেষত্ব হোলো এই যে, এঁরা বিজ্ঞানের সার্বজনীন মূল্যবোধ স্বীকার করেন না, কারণ এঁদের ধারণায় সবকিছুই পরিবর্তনশীল, গতিশীল, স্থিতি বা সার্বজনীনতা বলতে কিছুই নেই। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শিক্ষা দর্শনের ক্ষেত্রে এঁরা কোনো সুস্থির লক্ষ্য নির্ধারণের পক্ষপাতী নন। জন ডিউই একজন প্রয়োগবাদী দার্শনিক। তিনি দেখিয়েছেন, শিক্ষা জিনিসটাই একটি প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি বিশেষ। শিক্ষা যেহেতু সারা জীবনব্যাপী ব্যাপার, অব্যাহত তার গতিপ্রকৃতি ও ধারা. তাই, মানুষের শিক্ষা একটা পদ্ধতিকে অনুসরণ করে এগোয়। শিক্ষার তো শেষ নেই। সুতরাং উদ্দেশ্যমূলক কর্মবৃত্তিকে প্রাধান্য দিয়ে বাস্তব মূল্যবোধের উপর নির্ভর করে অনবরত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন করাই শিক্ষার আসল কাজ। প্রাচীন গ্রীক যুগে অ্যারিস্ততলের মধ্যেও এই ধরনের প্রয়োগবাদের সঙ্গে আদর্শবাদের একটি সমন্বয় দেখা দিয়েছিল। তিনি বুদ্ধির মহত্ত্ব ও কর্মের মহত্ত্বকে একটি ঐক্যপূর্ণ সূত্রে গ্রথিত করতে চেয়েছিলেন।

স্বভাববাদ মানুষের জীবনকে এক যান্ত্রিক নিয়মের জাঁতাকলে বাঁধতে চায়। পরম বস্তু বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব সে স্বীকার করে না। এই মতানুসারে জীবকে একটি যান্ত্রিক বিষয়ে ব্যাখ্যা করা হয় এবং প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী বিকাশের নীতিকে স্বীকার করা হয়। মানুষের সর্বোচ্চ মূল্যবোধ, সূক্ষ্ম ও মহত্ত্বপূর্ণ গুণাবলী এবং সামাজিক উদ্দেশ্যকে এই মতবাদ একেবারে নস্যাৎ করে দেয়। স্বভাববাদী দর্শনের ব্যর্থতা দেখিয়ে পার্সিনান বলেছিলেন, মানুষের স্বয়ংক্রিয় বিকাশ এবং কল্যানুভূতি এই দুটি জিনিসকে একসঙ্গে স্বীকার করা যায় না। মানুষ শুধু পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে যান্ত্রিক নিয়মে খাপ খাওয়ায় তা সত্য নয়। মানুষের আরেকটি ক্ষমতা আছে, তা হোলো পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত এবং পরিবর্তিত করবার ক্ষমতা। এই যুক্তি অনুসারে বলা যায়, স্বভাববাদ নিতান্তই এক যান্ত্রিক বা কৃত্রিম দর্শন। মানুষের উদ্দেশ্যমুখীতা এই দর্শন স্বীকার করে না। ফলে, এই দর্শনের কোনো সার্থকতা আছে বলে মনে হয় না।

বস্তুবাদী দার্শনিকেরা প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করতে চান বিজ্ঞানের সাহায্যে। ঐতিহাসিক এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই মতবাদ বিচার করে দেখে বস্তুকে, ঘটনাকে, অবস্থানকে, পরিবেশকে। কার্লমার্কস্ বস্তুবাদী দর্শনের মর্ম ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, ভাব মানুষের মনে প্রতিফলিত হয়, বস্তু থেকে মনের উৎপত্তি, বুদ্ধিগত বা মানসিক পদ্ধতির সাহায্যে তা বস্তুগত পৃথিবীকেই প্রকাশ করে। মানুষ জ্ঞানবিজ্ঞানের সাহায্যে পৃথিবীকে পরিবর্তিত করতে এবং জাগতিক ঘটনাবলীকে আয়ত্তে আনতে পারে। বস্তুবাদী দর্শনের এই সারসত্তার উপর নির্ভর করে শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে বলা হয়, মানুষ সজ্ঞান প্রচেষ্টায় মানুষের কল্যাণের জন্য জ্ঞানবিজ্ঞানকে কাজে লাগাতে পারে এবং এইভাবে ব্যবহারিক ও বস্তুজীবনের মধ্যে সৃষ্টিশীল উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারে। এই মতাদর্শ মানুষের আধ্যাত্মিক সত্তা ও ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশ ও অন্যান্য মহত্তম বৈশিষ্ট্যগুলিকে স্বীকার করে নিয়ে মানুষের ব্যক্তিত্বকে সামাজিক ব্যক্তিত্বের উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করে তার উপযুক্ত শিক্ষণ ও পরিচর্যার উপর জোর দেয়।

গণতান্ত্রিক মতাদর্শে শিক্ষাকে একটি সামাজিক প্রক্রিয়া হিসেবে গ্রহণ করা হয়। সমাজের জন্য চাই একটি বিশেষ আদর্শ, বিশেষ ভাবধারা। এই আদর্শ ব্যক্তির স্বাধীন ভাবধারা ও কর্মবৃত্তিকে স্বীকার করে। সমাজের প্রতি ব্যক্তির দায়িত্বকেও পূর্ণ মর্যাদা দিতে চায়। জন ডিউই-র মতে গণতন্ত্র জিনিসটা একটা আদর্শের সামিল। যুগ্ম বসবাসের নীতিকেই তা প্রাধান্য দেয়। যুগ্ম অভিজ্ঞতার ফলকেই এখানে মর্যাদা দেওয়াই রীতি। বর্তমান যুগে দেখা যাচ্ছে, গণতন্ত্রই সারা পৃথিবী জুড়ে নানা মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছে।

গণতান্ত্রিক শিক্ষাদর্শের মূল নীতি হোলো সকলের ক্ষমতা ও অনুরাগ অনুযায়ী সমান সুযোগদানের নীতি গ্রহণ করা। এই শিক্ষাধারায় ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে যথার্থভাবে উন্মোচিত করার জন্য প্রয়োজন হয় উপযুক্ত সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির। গণতন্ত্র আসলে সৃষ্টি করে এক সমাজ মাধ্যম এবং এই সমাজ-মাধ্যমের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি-জীবনের সর্বোচ্চ স্তর অর্জন করা সম্ভব। এই ব্যবস্থাপনায় প্রত্যেক ব্যক্তি কল্যাণের পথে এগিয়ে যাবে এবং কল্যাণমূলক কার্যধারায় অংশ নেবে যৌথভাবে। বার্কার গণতান্ত্রিক শিক্ষার সার্থকতা দেখিয়ে বলেছেন, এই আদর্শে এক ঐক্যপূর্ণ পরিণতি এমনভাবে নির্ধারিত ও নিরূপিত হয় যার পদ্ধতিও ঐক্যপূর্ণ।

এই আদর্শ অনুযায়ী শিক্ষায়তন শুধু যে গণতান্ত্রিক সমাজ হয়ে উঠবে তা নয়, এর উদ্দেশ্য হবে বাইরের বৃহৎ সমাজকেও সেবা করা এবং সেই উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দিতে হবে এমন প্রণালী যা দিয়ে সে সমাজের ঐক্যপূর্ণ ইচ্ছা শক্তিকে চিহ্নিত করতে পারে এবং সেইভাবে তাকে প্রকাশ করতে পারে। গণতান্ত্রিক শিক্ষার একটি নৈতিক ও আদর্শগত দিক আছে এবং সেইজন্য এখানে প্রত্যেক ব্যক্তিরও সমাজের প্রতি কিছু না কিছু কর্তব্য আছে। এইভাবে গণতান্ত্রিক শিক্ষা-দর্শনে সমাজমণ্ডিত ব্যক্তিত্বের আদর্শকে শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

গ্রীক যুগে মহামতি অ্যারিস্ততল বলেছিলেন মানুষের চরম পরিণতি কখনো মানবিক হতে পারে না, তা হবে স্বর্গীয়। জ্ঞানের সঙ্গে চিরন্তন মূল্যবোধেরই সম্পর্ক। মানুষের ব্যবহারিক ও তাৎক্ষণিক প্রয়োজনবাদের সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই। রেনেসাঁসের পর দেখা যায় বস্তুগত চাহিদার দিকে দুর্নিবার আকর্ষণ। এর ফলে মানুষ প্রকৃতিকে জয় করার জন্য উন্মুখ হয়ে পড়ে। এই ধরনের

পরিস্থিতিতে জন্ম নেয় সামাজিক মানবতাবাদ। কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশত বিজ্ঞানমুখী সভ্যতা ক্রমশ যান্ত্রিক হয়ে পড়ে এমনভাবে যে, মানুষের মহত্ব বা তার স্বর্গীয় সুষমা আর স্বীকৃত হয় না। জন্ম নেয় বৈজ্ঞানিক মানবতাবাদ। এর ফলে মানুষকে বিচ্ছিন্ন আত্মা হিসেবে টুকরো টুকরো করে দেখা শুরু হয়ে যায়। কিন্তু মানব-সভ্যতা, শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির অগ্রগতিতে দেখা দিল আরেকটি প্রবণতা, তার নাম ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদ। কিন্তু, এই মতবাদও মানুষকে ব্যক্তি-একক হিসেবে না দেখে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র হিসেবে বিচার করতে চাওয়ায় মানবিক উপাদানই হোলো ক্ষতবিক্ষত এবং উপেক্ষিত। অথচ শিক্ষাদর্শনের আর্তি প্রকৃত মানবতাবাদের উপর। এইজন্য বর্তমান যুগে আরেকটি প্রবণতা দেখা দিয়েছে, যার নাম গতিশীল বা সৃষ্টিশীল মানবতাবাদ।

এই মতবাদের বৈশিষ্ট্য হোলো এই যে, মানুষের শ্রেষ্ঠত্বকে তা স্বীকার করে, এমন কি অদৃশ্য অজানা শক্তির স্বর্গীয় দ্যুতি হিসেবে মানুষকে বিবেচনা করতে চায় এবং সেই সঙ্গে বিজ্ঞানের কল্যাণে প্রকৃতিকে জয় করার মধ্য দিয়ে মানুষের যে শক্তি স্ফুরিত সেই শক্তিকে কল্যাণের আদর্শে, শান্তির আদর্শে, মহত্তম আদর্শের অনুসরণে এমন এক তাত্ত্বিক দিক প্রকাশ করতে চায় যার ফলে শিক্ষা জিনিসটি আসলে দাঁড়ায় শরীর মন আত্মার এক নিগূঢ় অভিব্যক্তি গড়ে তোলারই সামাজিক প্রক্রিয়া।

এই মতাদর্শ আদর্শবাদ, স্বভাববাদ, বস্তুবাদ, প্রয়োগবাদ, গণতান্ত্রিক আদর্শ ইত্যাদি সবকিছুরই সারধর্ম অনুসরণ করে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে শিক্ষাকে বিজ্ঞানমুখী ও মূল্যবোধ অভিমুখী হিসেবে গড়ে তুলতে চায়। মানুষের সামাজিক সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের দিকেই বর্তমান যুগের শিক্ষার আদর্শ ও লক্ষ্য পরিচালিত হচ্ছে।

প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা ব্যবস্থাপনার মধ্যে ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার সমন্বয় সাধন কেমন ভাবে হবে তা নিয়ে তর্ক বিতর্কের শেষ নেই। ইতিহাসের পাতায় এই দুইটি প্রবণতাকে বিচ্ছিন্ন শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে দেখা গেছে।

মহামতি প্লেটো ব্যক্তির গৌরব বা মর্মার্থ সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারেন নি। তিনি সামাজিক প্রগতির ক্ষেত্রে ব্যক্তির বৈচিত্র্যপূর্ণ আত্মপ্রকাশকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে পারেন নি। তারই ফলে তিনি যে সামাজিক

শ্রেণীর বিভাগ করেছিলেন তা নিতান্তই যান্ত্রিক ধরনের মাপকাঠিতে গড়া জিনিস। অথচ দেখা যায়, গ্রীস দেশে ব্যক্তি আদর্শের সঙ্গে সামাজিক আদর্শের পরিপূর্ণ মিলনের জন্য বিশেষ চেষ্টা হয়েছিল।

স্পার্টাতে অবশ্য ব্যক্তি-আদর্শ গৌণ হয়ে যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে পুনরায় ব্যক্তির আদর্শ বড়ো হতে থাকে এবং স্বীকৃত হতে থাকে এইভাবে যে, ব্যক্তি মানুষই স্বাধীন সত্তা হিসেবে সামাজিক প্রগতির মুখপাত্র হতে পারে।

• রুশোর 'সামাজিক চুক্তির' মধ্যে ব্যক্তির সম্পূর্ণ ও সুসংগঠিত আত্মপ্রকাশের জন্য সামাজিক পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা খুব গুরুত্ব সহকারে উচ্চারিত হয়েছিল।

এরপর দেখা যায়, জার্মানীতে শিক্ষাকে স্বীকার করা হয় নাগরিক অধিকার হিসেবে এবং মানবিক গুণের চেয়ে জাতীয়তাবোধের আদর্শ সেখানে প্রাধান্য পায়। নেপোলিয়নের বিজয়ের পর শিক্ষাকে ঐতিহাসিক কারণে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এর ফলে ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষার আদর্শ পেছনে পড়ে যায়, জয়ী হয় শিক্ষার পরিণতি লাভের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের গুরুত্ব। নির্দিষ্ট রাষ্ট্রীয় অনুশাসনের আওতায় ব্যক্তি আদর্শ বিসর্জিত হোলো। এই ধরনের পরিস্থিতিতে হেগেল এনেছিলেন প্রতিষ্ঠানধর্মী আদর্শবাদের নীতি এবং তিনি চেয়েছিলেন সমকালীন প্রতিষ্ঠানের আদর্শের সঙ্গে ব্যক্তি আদর্শের একাত্মভাবে বিলীন হওয়ার এক যুক্তি। অবশ্য কাণ্টের ব্যক্তি-কেন্দ্রিক নানা সংমিশ্রণবাদের মধ্যে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের আদর্শ উচ্চারিত হয়েছিল। কিন্তু ফিকটে ও হেগেলের নীতি অনুযায়ী শিক্ষা এসে যায় রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে। এর অনিবার্য পরিণতিতে জার্মানিতে প্রবর্তিত হয়েছিল বাধ্যতামূলক সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা, প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত, যার নজীর পৃথিবীতে সর্বপ্রথম। কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশত, রাষ্ট্রীয় আদর্শের চরম অভিব্যক্তিতে জার্মান জাতি একেবারেই ফেটে চৌচির হয়ে যায় এবং এর জন্য অনেকে দায়ী করেন জার্মান দার্শনিকদেরই।

আদিম সমাজের প্রবৃত্তি ছিল ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে নিয়ন্ত্রণ করার দিকে। পাশ্চাত্য দেশে ব্যক্তির মূল্য অবশ্যই স্বীকৃত হয়েছিল খৃষ্টীয় শিক্ষাদর্শনে। কিন্তু, আধুনিক যুগে শিক্ষার লক্ষ্য ও সাধনা আরো অন্যভাবে প্রসারিত হয়ে জন্ম দিয়েছে গতিশীল বা সৃষ্টিশীল মানবতাবাদের।

বর্তমান যুগের শিক্ষায় 'শিশু-কেন্দ্রিক' শিক্ষার কথা এবং শিক্ষার্থীর 'সামাজিক প্রবৃত্তি'র কথা বারংবার উচ্চারিত হচ্ছে। বর্তমানকালের শিক্ষায় ব্যক্তিত্ব গঠনের কথা যেমন বলা হয়, তেমনি বলা হয় 'সমাজ মণ্ডিত ব্যক্তিত্বের' কথা।

জন ডিউই বর্তমান যুগের গণতান্ত্রিক শিক্ষাদর্শের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, সেই সমাজকেই গণতান্ত্রিক বলা যাবে যেখানে সকল নাগরিকেরই কল্যাণের আদর্শে একই মাপকাঠিতে অংশ গ্রহণের অধিকার স্বীকৃত এবং যেখানে যুগ্ম জীবনের নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রকাশের একটি ঐক্যপূর্ণ ভিত্তিভূমি গড়ে তোলা হয়েছে স্বাভাবিক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। এই সমাজের শিক্ষা হবে সেই ধরনেরই ধাঁচে যার ভেতর দিয়ে ব্যক্তিরা সকলেই সামাজিক সম্পর্ক ও নিয়ন্ত্রণে ব্যক্তিগত অনুরাগ প্রকাশ করতে পারবে। সেই সঙ্গে কোনো বিশৃঙ্খলা না ঘটিয়ে সামাজিক পরিবর্তনকে গ্রহণ করার মতো মনের অভ্যাস গড়ে তুলতে পারবে।

শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে এই ধরনের 'মুক্ত সমাজের' আদর্শ পরিকল্পনা সকলে মেনে নিতে পারেন নি। বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে গণতান্ত্রিক নীতি মান্য করে রাষ্ট্রীয় আদর্শকে সামাজিক আবশ্যিক শর্তপূরণের হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করে সমাজমণ্ডিত ব্যক্তিত্ব গঠনের গণতান্ত্রিক নীতিকে মূল্য দেওয়া হয়।

আমরা দেখতে পাই, ব্যক্তিত্ববাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের সুষ্ঠু সমন্বয়ের আদর্শ কিভাবে কার্যকরী হতে পারে আমাদের নিজেদের দেশের স্থান-কাল-পাত্র অনুসারে, তাই আমাদের কাছে বেশি করে বিবেচ্য। আমাদের বিবেচনায় শিক্ষাকে ব্যক্তিত্ব মণ্ডিত করে তোলা এবং শিক্ষার্থীকে সমাজমণ্ডিত করে তোলাই শিক্ষার নীতি হিসেবে গৃহীত হতে পারে আমাদের দেশে। পার্সিনানের যুক্তি মেনে নিয়ে বলা যায়, যেকোনো 'সামাজিক' প্রশ্নের সঙ্গেই ব্যক্তি জড়িত এবং সমাজ মাধ্যম ব্যতিরেকে কোনো মহত্তম ব্যক্তিত্বের কথা কল্পনাও করা যায় না। ব্যক্তিত্ব একমাত্র উপযুক্ত সামাজিক অবস্থার ভেতর দিয়েই গড়ে উঠতে পারে এবং সেইজন্য সামাজিক শর্তের আবশ্যিক বিন্যাস ও নীতি নির্দেশ অপরিহার্য ব্যাপার সন্দেহ নেই। ব্যক্তি তার নিজস্ব দক্ষতা, অনুরাগ

প্রবৃত্তি, ক্ষমতা অনুযায়ী গড়ে ওঠার সুযোগ পাবে সামাজিক শর্তপূরণের অনিবার্য তাগিদেই এবং এর ফলে যে ব্যক্তিকে আমরা পাই তা অবশ্যই সামাজিক ব্যক্তি। এইভাবেই আমরা গতিশীল শিক্ষাদর্শনকে অনুধাবন করতে পারি।

## প্রশ্নাবলী

১। আধুনিক শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা কিরূপ হওয়া উচিত ?

২। কর্মকেন্দ্রিক অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষার যে প্রবণতা আমাদের দেশে দেখা দিয়েছে তার ত্রুটিবিচ্যুতি আলোচনা করো।

৩। শিক্ষা প্রযোগধর্মী কর্মকেন্দ্রিক ও বিজ্ঞান সম্মত হওয়া উচিত, এ সম্পর্কে দার্শনিক চিন্তাধারার বিশ্লেষণ করো।

৪। আধুনিক শিক্ষা কি 'শিশু-কেন্দ্রিক' অথবা 'জীবন-কেন্দ্রিক' ?

৫। চিরাচরিত শিক্ষার পদ্ধতির পরিবর্তে কিভাবে কর্মমূলক উদ্দেশ্যবাহী ও প্রয়োগধর্মী পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় তা বিশ্লেষণ করো।

৬। অবসর সময়ের শিক্ষা ও খেলাভিত্তিক শিক্ষার মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্য বর্ণনা করো।

৭। ব্যক্তি পার্থক্যের নীতি অনুসারে শিক্ষার কর্মসূচীর বাস্তব প্রয়োগ সম্ভব কি না ?

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

# শিক্ষার বাস্তব প্রণালী

# শিক্ষার বাস্তব প্রণালী

॥ ১ ॥

যুগের অনিবার্য দাবীতে শিক্ষার ধ্যান ধারণা পরিবর্তিত হতে বাধ্য। এমন এক সময় গেছে যখন শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বকে আমরা আদৌ মূল্য দিই নি। কঠোর শাসনের বেত্রাঘাতে জর্জরিত ছিল এককালের শিশুরা। কিন্তু, এখন সারা পৃথিবীতে শিক্ষার নীতি হিসেবে গৃহীত হয়েছে শিশু-কেন্দ্রিক তথা শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক শিক্ষার আদর্শ।

শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও শিক্ষণীয় বিষয়—এই তিন জিনিস নিয়েই শিক্ষার কারবার। পুরাতন শিক্ষাধারায় শিক্ষকের কাছে বিষয় ছিল বড়ো, শিক্ষার্থী ছিল গৌণ। অ্যাডামসের কথায় আমরা পাই—শিক্ষক 'জন'কে 'ল্যাতিন' শিক্ষা দেন। ল্যাতিন শিক্ষাটাই সেখানে বড়ো হয়ে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের "তোতা কাহিনী"র সেই "খাঁচার পাখি"টি ছিল নিতান্তই বন্দী ও অসহায়। খাঁচার জন্যে যত রকম জাঁকজমকপূর্ণ আড়ম্বর ছিল কিন্তু খাঁচার পাখিটি ছিল জাঁতাকলের বন্দী।

আধুনিক শিক্ষায় খাঁচার পাখির মুক্তি ঘটেছে। পুরাতন শিক্ষা নীতি সর্বত্রই বর্জিত হয়ে নতুন যুগের পরিবর্তিত আবহাওয়ায় শিক্ষার্থীর দিকে সকলের নজর পড়েছে বেশি করে। বাস্তব কার্যকারিতায় ফাঁকফোঁকর থাকলেও নীতিগতভাবে সর্বত্রই স্বীকৃত হয়েছে শিশু বা শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক শিক্ষার আদর্শ। এই কারণে বিংশশতাব্দীকে অনেকে শিশু-শতাব্দী হিসেবেও আখ্যায়িত করেছেন।

ফ্রোয়েবেল বলেছিলেন, বিদ্যায়তন আসলে একটি বাগিচা। শিক্ষার্থী সেখানে একটি কোমল চারা, শিক্ষক সেই বাগিচার একজন সতর্ক পরিচালক। উদ্যান, নরম কচি কাঁচা শিশু আর পরিচার্যকারী হিসেবে শিক্ষকের ভূমিকা মালীর মতো, এই নীতির কথা বলে ফ্রোয়েবেল আসলে শিক্ষক সমাজের দায়িত্ব অনেক বেশি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। সত্যই তো, শিক্ষা জিনিসটা এই শিশু-উদ্যান পরিচর্যারই ব্যাপার। শিক্ষক অবশ্যই হবেন পথপরিদর্শক নেতা, বন্ধু ও দার্শনিক। এই নীতি গৃহীত হওয়ার ফলে শিক্ষাদান তথা শিক্ষাপ্রণালীর ক্ষেত্রেও এসেছে অভূতপূর্ব পরিবর্তনের জোয়ার। বর্তমান শিক্ষা তাই নিছক

মগজ ধোলাইয়ের ব্যাপার নয় বা জোর জবরদস্তি করে মগজের মধ্যে ভাষাজ্ঞান, ব্যাকরণ, অঙ্ক, শৃঙ্খলাবোধ চাপিয়ে দেবার ব্যাপার নয়। বর্তমান যুগের শিক্ষাদান নীতি অবশ্যই উদ্দেশ্যমুখী, শিক্ষার্থীর কথা সর্বাগ্রে মনে রেখে শিক্ষার যা-কিছু উপচার ও উপকরণের আয়োজন ও ব্যবহার করতে হবে।

আধুনিক শিক্ষাদানের মধ্যে তাই **উদ্দেশ্যমূলক বহুমুখী আনন্দজনক কর্মবৃত্তির** কথা বারংবার বলা হচ্ছে। নিছক শুকনো বক্তৃতাদানের চিরাচরিত প্রথা আধুনিক শিক্ষার নীতি হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যমুখী প্রণালী নিয়ে দেশবিদেশে প্রচুর চিন্তাভাবনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে এবং হচ্ছে। এই ধরনের নানা প্রণালীর মধ্যে মন্তেসরী ও ফ্রোয়েবেল প্রবর্তিত কিণ্ডারগার্টেন প্রথা, ডেক্রলী প্রণালী, প্রোজেক্ট প্রণালী, উইনেটকা প্রণালী, গ্যারী প্রণালী, সেবাগ্রাম প্রণালী প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অবশ্য এইসব প্রণালীর বাস্তব কার্যকারিতায় অনেক রকমের ত্রুটি বিচ্যুতি আছে। শিক্ষার সর্বস্তরেই এইসব প্রণালীর হুবহু প্রয়োগও সম্ভব নয়। তথাপি, **নীতিগতভাবে যেহেতু এইসব প্রণালী চিরাচরিত বক্তৃতাদান পদ্ধতির পরিবর্তে উদ্দেশ্যমুখী, তাই এইসব প্রণালীর ব্যবহারিক প্রয়োগ অনেক ক্ষেত্রেই নানারকম সহ-পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করে গোটা শিক্ষার পরিবেশকেই আনন্দমুখর ও উদ্দেশ্যপ্রবণ করে গড়ে তোলা যায়।** এইখানেই নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে এর সার্থকতা অনেক বেশি উজ্জ্বল। মণ্টেইনের মহামূল্যবান উক্তি ছিল—শিক্ষা জিনিসটি শিক্ষাদানের চেয়েও বড়ো জিনিস। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে বলা যায়, শিক্ষার বহুমুখী উদ্দেশ্যবাহী প্রণালী শিক্ষার মূল লক্ষ্য সাধনের কার্যকরী উপায়মাত্র। যান্ত্রিকভাবে তাকে গ্রহণ করা যায় না। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের অনুকূল নানারকমের **সমাজসম্মত আনন্দজনক কর্মবৃত্তির** আমদানি করা যেতে পারে। শিক্ষককেই এইজন্য **সুসংহত পরিকল্পনা** রচনা করতে হবে এবং শিক্ষার **সামগ্রিক আবহাওয়ার** সঙ্গে তাঁর পরিকল্পনাকে **সংযুক্ত** করে নিতে হবে।

এ কথা সত্যি, শিক্ষার উপাদান বা বিষয়বস্তু উপেক্ষণীয় নয়। শিক্ষার্থীদের এই উপাদানের গভীরস্তরে যেতে হবে এবং সেইসঙ্গে তার কর্মধারাকে বিস্তৃতির দিকে নিয়ে যেতে হবে। বিষয়বস্তুর চর্বিতচর্বন নয়, অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে,

নানারকম কর্মবৃত্তিতে অংশগ্রহণ করে, ব্যক্তিগত চেষ্টায়, যুগ্ম সহযোগিতায় শিক্ষার্থীকে জানতে হবে অতীত বিষয় এবং সেই সঙ্গে তার বাস্তব সমন্বয়। এই কারণে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন শিক্ষাদানের বিশেষত্ব নির্দেশ করে বলে দিয়েছিলেন, শিক্ষার্থীর মগজকে নানারকম তথ্যে ভরপুর করার চেয়ে তার কৌতূহলকে জাগিয়ে দেবার কলাকৌশল অনুসরণ করাই শ্রেয়। অনেক সময় বলা হয়, শিক্ষক পথপ্রদর্শক, বন্ধু ও দার্শনিক হিসেবে সর্বদা আড়ালে আবডালে থেকে শিক্ষার্থীকে পরিচালনা করবেন। বাস্তব ক্ষেত্রে তা সর্বদা সম্ভব হয় না। তবুও শিক্ষক শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের কথা স্মরণ রেখে যুগ্ম-কর্মধারার মধ্যেও সযত্নে তাকে এমনভাবে নির্দেশ দেবেন যার ফলে শিক্ষার্থী সজ্ঞানভাবে এবং নির্জ্ঞানভাবে নানারকমের জ্ঞান অর্জনের জন্য আনন্দের সঙ্গে এগিয়ে যেতে পারে এবং বাস্তব ক্ষেত্রে নিজেকে সংযুক্ত করে নিজের অভিজ্ঞতার পরিসর বাড়িয়ে নিতে পারে। শিক্ষার্থীর স্বতঃস্ফূর্ত প্রচেষ্টাকে জাগিয়ে দেবার জন্য প্রয়োজন হলে শিক্ষক যত কম পারেন বক্তৃতা দেবেন এবং শিক্ষার্থীকে নানা কর্মধারায় যুক্ত করে তার কার্যধারার সদর্থক দিক চিহ্নিত করে দেবেন এবং তাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে, পর্যবেক্ষণ করে, সঠিক পথে পরিচালিত করবেন।[১৬]

১৬। শিক্ষাবিদরা এই দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সমগ্র শিক্ষার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের **নির্জ্ঞান প্রভাবের** উপর অনেক বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শিক্ষার্থীর উপর পরিবেশের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব তো রাখতেই হবে, সেই সঙ্গে চাই শিক্ষকের সযত্ন সস্নেহ ভূমিকা এবং শিক্ষার্থীর স্বতঃবৃত্ত 'আত্মশিক্ষা' বা আত্মানুসন্ধান বা স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত শিক্ষার কৌতূহল। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন—প্রকৃতপক্ষে কেউ কারো দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ করে না। প্রত্যেকেই নিজে নিজেরই শিক্ষক। বাইরের শিক্ষক এমন কিছু অভিভাব সৃষ্টি করেন যার সাহায্যে শিক্ষার্থীর নিজের ভেতরের শিক্ষা জেগে ওঠে পরিপার্শ্বকে জানবার জন্য। প্রকৃত অর্থে শিশু নিজেই নিজের শিক্ষা নেয়। তাত্ত্বিক দিক দিয়ে কথাটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তবে শিক্ষার্থীর স্বতঃবৃত্ত শিক্ষার আকাঙ্খাকে একেবারে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেওয়া যায় না বলেই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকের সযত্ন ভূমিকা অবশ্যম্ভাবী। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর স্বতঃবৃত্ত আত্মানুসন্ধানকে কার্যকরী করে তুলতে হবে। নিছক ভাগ্যের হাতে তাকে সমর্পণ করা যাবে না। প্রয়োজন উপযুক্ত সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনী। দেখতে হবে কিভাবে শিক্ষার্থী নিজেকে প্রকৃতি, সমাজ, মানুষ ও আধ্যাত্ম মূল্যবোধের প্রতি সংযুক্ত করে এগিয়ে যেতে পারে। শিক্ষার্থীর কৌতুকবোধ, অনুসন্ধিৎসা, আত্মানুশীলন, চরিত্র গঠন ইত্যাদির জন্য উপযুক্ত আয়োজন উপকরণের সমাহার করতে হবে তাকে ঘিরে। যে সব শিক্ষার আয়োজন বা উপকরণ বা প্রণালী ব্যবহার করা হবে তা অবশ্যই বিজ্ঞান-সম্মত গতিশীল উপাদান, যুগমূল্যবোধের সঙ্গে

॥ ২ ॥

## গতিশীল শিক্ষাদান প্রণালী

শিক্ষাদানের পদ্ধতি নানারকমের হতে পারে। দেশে বিদেশে শিক্ষাবিদেরা এইজন্য নানাধরনের উপায় উদ্ভাবন করেছেন। নিছক বক্তৃতাদানের চিরাচরিত পদ্ধতির পরিবর্তে শিক্ষা পদ্ধতিতে নতুন নতুন উদ্দেশ্যমূলক ভাবনা সংযোজিত হচ্ছে।

শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের সঙ্গে জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতার যাতে সঠিক অনুবন্ধ গড়ে উঠতে পারে সেইজন্য শিক্ষাদান প্রণালীকে গতিশীল, সমাজমুখী, বিজ্ঞানসম্মত এবং উদ্দেশ্য অভিমুখীন করে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। অবশ্য পদ্ধতিই শিক্ষার সবকিছু নয়—পদ্ধতি একটা উপায় মাত্র, আসল লক্ষ্য জীবনধর্মী শিক্ষার বিকাশ সাধন।

বর্তমান যুগ পরীক্ষা-নিরীক্ষার যুগ। শিক্ষাদান পদ্ধতিকে কিভাবে জীবনধর্মী করা যায় এবং শিক্ষার্থীর জীবনকে অনেক বেশি উদ্দেশ্যমুখী করা যায় সেজন্য যে সব চিন্তাভাবনা পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে তার কিছু উল্লেখ এখানে করা দরকার বলে আমরা মনে করি।

(ক) **সমন্বয়ধর্মী বক্তৃতাদান প্রণালী: নিছক বক্তৃতাদান প্রণালীর** গতানুগতিকতায় আধুনিক শিক্ষার রুচি নেই। তবুও এই পদ্ধতি বিলুপ্ত হয়নি বরং এই পদ্ধতিকেও কতখানি বিজ্ঞান সম্মত করা যায় সে সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা হয়েছে ও হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষায় না হোক, মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদানে বক্তৃতাদান পদ্ধতি একেবারে বাতিল করা যায় না।

---

সার্বজনীন মূল্যবোধের একটা বিন্যাস সেখানে থাকবে যার ফলে তার ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক মন গঠনে অনুকূল বাতাবরণ সাহায্য করবে। ফ্রোয়েবেল বলেছিলেন, কচি চারা গাছ বৃদ্ধি পায় উপযুক্ত কর্ষণ ও পরিচর্যার সুবাদে। মানুষ বৃদ্ধি পায় শিক্ষার তাগিদে। শিক্ষা মানুষের অন্তঃস্থিত শক্তিকে করবে বাইরে প্রকাশিত, বাইরের শক্তি অন্তরপ্রদেশে হবে সঞ্চালিত এবং এইভাবে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় তার মধ্যে অন্তর ও বাইরের একটা সুষ্ঠু কাঠামো গড়ে উঠবে, যার অভিব্যক্তি হবে সামাজিক ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে অথচ তার অন্তরসত্তা হবে পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। এইভাবে শিক্ষার্থীর সত্তার সর্বাঙ্গীন উদ্বোধন সম্ভব হতে পারে।

তাই, এখন চেষ্টা হচ্ছে কিভাবে শ্রেণীবক্তৃতাকে আকর্ষণীয় করা যায়। সেজন্য ব্ল্যাকবোর্ড, চার্ট, মডেল, ম্যাপ, স্লাইড প্রভৃতি নানা আনুষঙ্গিক উপকরণের সাহায্যে বক্তৃতাকে আকর্ষণীয় করার জন্য চেষ্টা চলেছে। তাছাড়া, আলোচনা চক্র, টিউটোরিয়াল, সেমিনার প্রভৃতি সংগঠনের মাধ্যমে কোনো বিষয়কে হৃদয়গ্রাহী, সহজবোধ্য এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করার জন্য প্রচেষ্টা চলেছে।

বক্তৃতাদানকে আকর্ষণীয় করার জন্য বিজ্ঞানসম্মতভাবে শিক্ষাদান প্রণালীর কৌশল নির্দেশ করেছেন শিক্ষাবিদ্ **হার্বার্ট**। তাঁর সেই নীতি সুবিখ্যাত **পাঁচটি ফর্ম্যাল স্তর** হিসেবে পরিচিত। তিনি বক্তৃতাদান পদ্ধতির জন্য পাঁচটি পর্ব বিভাগ করেছেন যেমন, প্রস্তুতি পর্ব, উপস্থাপন পর্ব, তুলনামূলক বা অনুষঙ্গ সূত্র স্থাপন পর্ব, সিদ্ধান্ত পর্ব এবং প্রয়োগ পর্ব। বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, শিক্ষক একটু যত্নশীল হলে এবং তাঁর পাঠ্যদান সম্পর্কে একটা প্রস্তুতি থাকলে এই ধরনের পর্ব অনুসরণ করে বক্তৃতাদান পদ্ধতিতে শ্রেণীপাঠ করতে পারলে শিক্ষার্থীদের কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা বেশ জাগ্রত হয়। আমাদের বিবেচনায়, বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে অনুষঙ্গ স্থাপনের ব্যাপারে বিদ্যালয় আবহাওয়ায় নানারকম বিষয়কেন্দ্রিক আয়োজন উপকরণের উপযুক্ত বন্দোবস্ত করলে ভালো হয় এবং প্রয়োগপর্বের কাজটি টিউটোরিয়াল, সেমিনার, হোম টাস্ক প্রভৃতির মধ্য দিয়ে সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রিত ও প্রসারিত হলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

জন ডিউই **'সমস্যামূলক পদ্ধতি'র** কথা বলেছেন। তিনি চেয়েছেন প্রথমে কোনো বিষয়বস্তুর জটিলতা সম্পর্কে অনুভব। তারপর সমস্যাকে পরীক্ষা করে তার সমাধানের চেষ্টা। অবশেষে সূত্র গঠন করে তার প্রয়োগ। কোনো কোনো শিক্ষাবিদ্ শিক্ষাদান পদ্ধতিকে ভাগ করতে চেয়েছেন দুটি পর্বে—**বিশ্লেষণাত্মক ও সংশ্লেষাত্মক** পর্যায় অনুসারে। কারো কারো মতে আরোহ ও অবরোহ পদ্ধতি খুবই কার্যকরী পদ্ধতি। আবার কেউ কেউ নিছক বক্তৃতা-দানের পরিবর্তে আলোচনামূলক পদ্ধতির পক্ষপাতী।

ওয়েল্টন শিক্ষাদানের পদ্ধতিকে ভাগ করে দেখেছেন কয়েকটি পর্বে। যেমন, প্রথমতঃ জ্ঞানের প্রসারমূলক পাঠ, তারপর গভীরস্তরে প্রবেশ, জ্ঞানের সূত্র অনুসন্ধান, কোনো কার্যের মধ্য দিয়ে দক্ষতা অনুসন্ধান, ভাষাজ্ঞান পর্যালোচনা এবং শেষে পুনরায় আলোচনা। মহামতি রুশো **আবিষ্ক্রিয়া পদ্ধতির** কথা বলেছিলেন। এই পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষার্থীই সম্পূর্ণভাবে নতুন জ্ঞানের

অনুসন্ধান করবে, শিক্ষকের কাজ শুধুমাত্র সূত্র নির্দেশ করে দেওয়া। যাহোক, আধুনিক শিক্ষাদান পদ্ধতিতে বক্তৃতা বা আলোচনা পদ্ধতিকে চিত্তাকর্ষক ও ফলপ্রদ করে তোলার জন্য কিছু কিছু মূলনীতি অনুসরণ করা হচ্ছে যা উল্লেখযোগ্য।

এই নীতিগুলি হোলো, শিক্ষার্থীর ইন্দ্রিয়ানুভূতির চর্চার প্রভূত সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। তারা যাতে মূর্ত থেকে বিমূর্ত চিন্তার দিকে এগিয়ে যেতে পারে সে বিষয়ে নজর দেওয়া দরকার। জ্ঞাত জিনিস থেকে অজ্ঞাত জিনিসের দিকে তাকে নিয়ে যেতে হবে এবং অজ্ঞাত জিনিস অনুভব করার জন্য ফিরিয়ে আনতে হবে জ্ঞাত জিনিসের কাছে যাতে তারা বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জ্ঞানের সূত্র অনুধাবন করতে পারে।

শিক্ষাদান জিনিসটা সাধারণ থেকে জটিল, জটিল থেকে সাধারণের দিকে ফেরা, এইরকম এক পদ্ধতিতে হলে ভালো হয়। শিক্ষাদান পদ্ধতি হবে মনস্তত্ত্বমূলক এবং তর্ক ও যুক্তিশাস্ত্র অনুযায়ী। ক্ষেত্র অনুযায়ী **বিশ্লেষণাত্মক** ও **সংশ্লেষণাত্মক প্রক্রিয়ার** সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। শিক্ষার্থীর স্বতঃবৃত্ত আত্মপ্রচেষ্টাকে জাগিয়ে দেবার জন্য সমস্যাধর্মী কর্মবৃত্তির মধ্যে তাকে নিযুক্ত করতে হবে। উদাহরণ দিয়ে বক্তৃতা বা আলোচনাকে চিত্তাকর্ষক ও মনোহারী করে তুলতে হবে। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বকে সম্মানিত করে উৎসাহব্যঞ্জক ও শিক্ষাপ্রদ উপাদান এমনভাবে এনে দিতে হবে যার ফলে সে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আরো শিক্ষণীয় বস্তু আহরণের জন্য উন্মুখ হয়। শিক্ষার্থীর সামগ্রিক উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য রেখে পঠন-পাঠন ক্রিয়া চালাতে হবে।

শিক্ষাদানের **স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির** কথা যাঁরা বলেন, তাঁদের মতে শিক্ষার্থীকে কিছুই শেখানো যায় না, সে নিজেই নিজের শিক্ষক হয়ে শিক্ষা নিতে পারে মাত্র। শিক্ষার্থীর মনের মধ্যে যে জ্ঞানের ভাণ্ডার লুক্কায়িত আছে তাকেই উদ্‌ঘাটিত করার জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীকে কিছু অভিভাব দিতে পারেন। শিক্ষাদানের স্বয়ংক্রিয় নীতি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত বলে গণ্য হয়েছে ফ্রোয়েবেল, মন্তেসরী প্রমুখ শিক্ষাবিদ্‌দের বিবেচনায়। এই নীতি অনুযায়ী শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে যত কম কথা বলা যায় ততই ভালো। শিশু নিজেই তার অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ ও সূত্রনির্দেশের মধ্য দিয়ে যত বেশি শিক্ষককেই চাইবে তাঁর নির্দেশনা, সেইটেই এই নীতি অনুযায়ী বিজ্ঞানসম্মত ও মনস্তত্ত্বসম্মত।

শিক্ষার্থীর স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান আহরণের এই পদ্ধতি বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে গেলে শিক্ষার কাঠামোর উপযুক্ত সংগঠন প্রয়োজন। শিক্ষার্থীর সক্রিয় স্বতঃবৃত্ত ভূমিকার জন্য শিক্ষার পরিবেশ, আয়োজন, উপকরণ, শিক্ষকের উপস্থিতি ও নির্দেশনা বিশেষভাবে প্রয়োজন।

**(খ) কিণ্ডার গার্টেন পদ্ধতি:** ফ্রোয়েবেল **কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতির** উদ্ভাবনা করে দেখিয়েছিলেন কিভাবে শিশু-মনস্তত্ত্বের দিকে তাকিয়ে শিশুদের **"স্বয়ংচালিত কর্মের"** মাধ্যমে কাজ করানো যায় এবং শিশুদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির অনুশীলন সম্ভব হয়। পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাধনার জন্য নানারকম খেলাধূলা, নাচ-গান, আমোদপ্রমোদ, ছবি আঁকা প্রভৃতি কাজের মধ্য দিয়ে স্বাভাবিক পরিবেষ্টনীতে শিক্ষার্থীরা কিভাবে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে সেই প্রচেষ্টা এই পরিকল্পনার অন্তর্ভূক্ত এবং সেই অনুযায়ী তিন থেকে ছয় বছরের শিক্ষার্থীদের জন্য তাঁর এই পরিকল্পনায় শিক্ষাকে বাস্তবধর্মী ও উদ্দেশ্যমুখী করার প্রচেষ্টা।

মন্তেসরী-ফ্রোয়েবেলের অনুসরণ করে **'মন্তেসরী প্রথা'** প্রবর্তন করেন শিশুর ইন্দ্রিয়ানুভূতির চর্চাকে ভিত্তি করেই। তবে, মন্তেসরী শ্রেণী-শিক্ষাকে একক হিসাবে গ্রহণ না করে নাচ-গান, খেলাধূলা, ছবি আঁকা প্রভৃতি কাজকে আলাদা আলাদা ভাবে করতে চেয়েছেন। শিক্ষার্থীদের উপর কোনকিছু জবরদস্তি চাপিয়ে না দিয়ে স্বাধীনতাই প্রথম, স্বাধীনতাই শেষ এই মহামন্ত্র নিয়ে তিনি গঠন করেন শিশু-গৃহ এবং শিশুচর্চার জন্য নানারকমের গতিশীল সাজসরঞ্জাম যেমন খেলনা, মোটর বোট, ইত্যাদি। শিক্ষিকাকে তিনি নির্দেশকের ভূমিকায় রেখে আনন্দজনক কর্ম ও স্বাধীন কর্মবৃত্তির মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির চর্চার আয়োজন চেয়েছেন। শিক্ষার নিম্নস্তরে এই জাতীয় শিক্ষা ও শিক্ষাদানের পরিকল্পনা অনেকখানি বাস্তবধর্মী ও উদ্দেশ্যবাহী সন্দেহ নেই কিন্তু দুর্ভাগাবশত কিছু শিল্পাঞ্চল ছাড়া এই জাতীয় শিক্ষার বিস্তার সর্বতোমুখী হয়নি।

**(গ) বাটাভিয়া পরিকল্পনা:** জন ক্যানেডির পরিকল্পনার নাম **বাটাভিয়া পরিকল্পনা**। তিনি তাঁর এই পরিকল্পনায় অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের প্রতি অধিকতর মনোযোগ দেবার কথা বলেছেন এবং তাদের কিভাবে যোগ্য করা যায় তার উপায় উদ্ভাবন করেছেন। শিক্ষার্থীদের দুর্বলতাগুলি বড়ো করে না দেখে তাদের মহত্বমগুনের বিকাশ সাধনে তিনি জোর দিয়েছেন বেশি করে

এবং সেইজন্য দৈনন্দিন কর্মসূচীর মধ্যে তিনি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত কাজকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়কেই একই রকম কাজ হাতেনাতে করতে হয় এই পরিকল্পনায়। শিক্ষার্থীর ত্রুটি বিচ্যুতি ও দুর্বলতা দূর করার জন্য শিক্ষককে শিক্ষার্থীর মতোই ভূমিকা পালন করতে হয় মনস্তাত্ত্বিক কারণে। হালকা ধরনের পঠন পাঠনের পরিবর্তে কঠোর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও কাজের মধ্য দিয়ে এই শিক্ষার ধারা নিয়ন্ত্রিত হয়। শিক্ষাদানও ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষা অর্জন এই দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার জন্য শিক্ষার উদ্দেশ্যমুখী নিয়মনীতি এখানে অনুসরণ করা হয়।

(ঘ) **ডেক্রলী প্রথা ঃ** ডেক্রলী নামে একজন চিকিৎসের নামে ডেক্রলী পরিকল্পনা চালু হয়। প্রকৃতপক্ষে মন্তেসরী প্রবর্তিত শিক্ষাপ্রণালীর সঙ্গে এই পরিকল্পনার মিল আছে। এই পারকল্পনায় বিদ্যালয়কে এমনভাবে গড়ে তোলা হয় যেখানে শিক্ষার্থীরা বসবাস প্রণালীর মধ্য দিয়েই শিক্ষা আয়ত্ত করে। প্রত্যেক শ্রেণীতে দশজন শিক্ষার্থী নিয়ে এক একটি ইউনিট গঠন করে তাদের নিয়ে যাওয়া হয় বিভিন্ন কক্ষে নির্দিষ্ট ল্যাবরেটাবী, স্টুডিও, ওয়ার্ক-সেণ্টার প্রভৃতিতে। তারপর আবার তাদেব সকলকে একত্রিত করে প্রত্যেকের এবং যুগ্মভাবে কাজের হিসেব-নিকেশ করা হয়। কাজগুলি যা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় তা সম্পূর্ণ না হলে আবার সেগুলি করবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয় এবং তা করার পর আলোচনা চক্রের মাধ্যমে ভুলভ্রান্তি দূর করে নতুন কাজে এগিয়ে যাওয়ার পথ নির্দেশ দেওয়া হয়। এই পরিকল্পনায় স্বাধীনভাবে কাজ করার অপূর্ব সুযোগ থাকে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীও তার দায়িত্ব সম্পর্কে এখানে সচেতন। শিক্ষার্থীদেব একটি শ্রেণীকক্ষে বা সমাজ জীবনের মধ্যে বাস্তবভাবে কাজ করতে দেওয়া হয়। তারা তাদের নিজেদের বুদ্ধি বিচার বিবেচনা ও জ্ঞান অনুযায়ী কাজ করে যায়। অর্থাৎ এই পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীর নিজস্ব স্বাধীনতা অনুযায়ী কাজ করার সুযোগ থাকে। শিক্ষার্থীবা তাদের নিজেদের দায়িত্ববোধ, আত্মসচেতনা, বিচাববোধ, কর্মপ্রেরণা, এবং জাগ্রত বুদ্ধি নিয়ে নিজেদের ব্যক্তিত্ব গঠনের অপূর্ব স্বাধীনতা পেয়ে থাকে।

(ঙ) **প্রোজেক্ট পদ্ধতি ঃ** প্রোজেক্ট পদ্ধতি নামে একপ্রকার পদ্ধতি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেছিলেন কিলপ্যাট্রিক। এই পরিকল্পনায় কোনো সমস্যামূলক কাজ স্বাভাবিক পরিবেষ্টনীর মধ্যে সমাধা করবার এক অপূর্ব সুযোগ এনে

দিয়েছে। প্রোজেক্টকে সংজ্ঞা নির্দেশ করে বলা হয়, একধরনের সর্বান্তঃকরণে নিয়োজিত উদ্দেশ্যমূলক কাজ যা সামাজিক পরিবেশে সমাধানের যোগ্য। ষ্টিভেনসন বলেছিলেন, প্রোজেক্ট আসলে একধরনের সমস্যাধর্মী ক্রিয়াকাণ্ড যা সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন করা যায় স্বাভাবিক পরিবেষ্টনীতে। এই পদ্ধতির বিশেষত্ব হোলো কোনো এক সমস্যার সমাধান করা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'ঝর্ণা' কবিতাটিকে গ্রহণ করা গেল একটি সমস্যাধর্মী বিষয় হিসেবে—শিক্ষক এই কবিতার জন্য ক্রিয়াকাণ্ডটি স্বাভাবিক পরিবেষ্টনীতে করার জন্য শিক্ষার্থীদের নিয়ে গেলেন কোনো এক ঝর্ণার ধারে এবং সেখানে কবিতাটি শুধু আবৃত্তির ব্যবস্থা করলেন না, শিক্ষার্থীদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা দিয়ে কিছু বর্ণনাও লিখিয়ে নিলেন এবং 'ঝর্ণা' কবিতার সাহিত্যগত দিকের সঙ্গে বিজ্ঞান, ভূগোল, পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে সাদৃশ্য ও অনুষঙ্গ স্থাপন করে ঝর্ণার রূপ, উৎপত্তি, জায়গার প্রাকৃতিক ভূগোল, পাথরের স্তরভেদ প্রভৃতি বিষয়েও আলাপ আলোচনা করে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জনের বিস্তৃত রিপোর্ট গ্রহণ করলেন। ফলে দেখা গেল, একটি সমস্যাধর্মী বিষয় থেকে নানাপ্রকার জ্ঞানের বিস্তৃতি অর্জিত হয়েছে এবং ক্রিয়াকাণ্ডটি সমাধা হয়েছে একেবারে জীবন্ত পটভূমিকায়। এই পরিকল্পনায় স্বাভাবিক পরিবেশ থেকে শিক্ষকের নির্দেশ মতো কোনো এক সমস্যার সমাধান করতে হয় বলে এর একটি উদ্দেশ্যগত এমন তাৎপর্য থাকে যা অভিজ্ঞতাকে পুষ্ট করে এবং সজীবও নতুন জ্ঞানের উন্মেষসাধনে দেহ-মন-আত্মাকে উদ্দীপিত করে। শিক্ষার্থীর মৌলিক ক্ষমতা, উদ্ভাবনী প্রবৃত্তি, দৃষ্টিশীল ক্ষমতা এর দ্বারা সম্যকভাবে বিকাশ লাভ করতে পারে। শিক্ষাদানও যতদূর সম্ভব উদ্দেশ্যমূলক হয়। এই প্রকল্প কার্যকরী করার জন্য শিক্ষাদান পদ্ধতির কয়েকটি বিশেষত্ব গোচরীভূত হয় যেমন, উদ্দেশ্য বর্ণনা, পরিকল্পনা করা, পরিকল্পনা কার্যে রূপান্তরিত করা, পরিকল্পনার পরিণতি বিচার করা। এই পদ্ধতির একটি সুবিধা এই যে, এর সাহায্যে অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞানের সঙ্গেও সুন্দরভাবে অনুষঙ্গ স্থাপন করা যায়।

**(চ) উইনেটকা পদ্ধতি ঃ** উইনেটকা পরিকল্পনায় সাধারণত শ্রেণীকক্ষে একজন করে মনোবিজ্ঞানী, মনোচিকিৎসক ও চিকিৎসক থাকেন। তাছাড়া, থাকেন একজন কর্মকর্তা। কর্মকর্তার কাজ হোলো বিভিন্ন বিভাগের কাজের সমন্বয় সাধন করা। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে পঠনীয় অনেক গ্রন্থ দিয়ে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী বিশেষজ্ঞের সাহায্য দেওয়া হয়। মনোবিজ্ঞানী, মনোচিকিৎসক

এবং চিকিৎসক শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় উপদেশ ও নির্দেশ দেন। পাঠ্যসূচীকে প্রধানতঃ দুটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়ঃ এক, মূলতত্ত্বপাঠ, দুই, সামাজিক ও সৃষ্টিমূলক নানা কর্ম অনুষ্ঠান।

**(ছ) গ্যারী পরিকল্পনাঃ** গ্যারী পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীদের ভাগ করা হয় দুটি ভাগে, একদল পড়াশোনায় ব্যস্ত থাকে, আর একদল নানা প্রকার কর্ম ও ক্রীড়ানুষ্ঠানে ব্রতী হয়। এই সময় কর্ম ও ক্রীড়ার মধ্যে সুতা কাটা, কাপড় বোনা, মাদুর বোনা, ব্যাগ তৈরি করা প্রভৃতি নানা শিল্প কর্মে তাদের নিযুক্ত করা হয় একটি দলে, অন্যদলে চলে পঠন-পাঠন। পর্যায়ক্রমে এক একদল এইভাবে একটি বিশেষ কর্মসূচীতে নিযুক্ত থাকে। এই পরিকল্পনার বিশেষত্ব এই যে, সারা বিদ্যায়তন জুড়ে সদাসর্বদা একটা কর্মচঞ্চল আবহাওয়া বিরাজ করে এবং মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে কর্ম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা দারুণ রকমের কর্মপ্রেরণা পেয়ে থাকে।

**(জ) ডল্টন পরিকল্পনাঃ** ডল্টন পরিকল্পনায় এক একটি কক্ষ এক একটি বিষয়ের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়। এই শ্রেণীকক্ষগুলি এক একটি বিষয়ের উপর গঠিত নানা আকর্ষণীয় উপকরণে সাজানো থাকে। যেমন, ইতিহাস কক্ষ, ভূগোল কক্ষ, বিজ্ঞান কক্ষ, শিল্প কক্ষ, সাহিত্য কক্ষ ইত্যাদি। পার্কহার্স্ট নামে এক রমণী ডল্টন নগরে এই পরিকল্পনা চালু করেছিলেন বলে তাঁর নামে এই পরিকল্পনা পরিচিত। এই পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীরা অভীত বিষয়ের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষে এক বিশেষ পরিবেশের মধ্যে কাজ করবার সুযোগ পায়। এখানে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের প্রারম্ভে কোনো বিষয় ব্যাখ্যা করার পর কিছু নির্দিষ্ট ধরনের কাজ দেন এবং শিক্ষার্থীরা সেই অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করলে পর নানারকমের চার্ট, মডেল, পঠনীয় পুস্তক, যন্ত্রপাতি প্রভৃতির সাহায্যে কাজ করে। ফলে, এই পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীর ভূমিকা অনুসন্ধিৎসু গবেষকের মতো। এই জাতীয় পরিকল্পনার সুবিধা এই যে, নির্দিষ্ট বিষয়কক্ষে নানাধরনের বৈচিত্র্যপূর্ণ সাজসরঞ্জাম উপাদান উপকরণ সন্নিবেশিত থাকায় একটি বিশেষ 'পরিমণ্ডলের' মধ্যে নিজেদের জ্ঞান অর্জন ও স্বাধীন চিন্তাধারা প্রকাশের সুযোগ থাকে।

**(ঝ) সেবাগ্রাম পদ্ধতিঃ** মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত পদ্ধতিকে বলা যায় সেবাগ্রাম পদ্ধতি। পৃথিবীতে শিক্ষাসংক্রান্ত প্রণালীর ক্ষেত্রে এই সেবাগ্রাম পদ্ধতি একটি বিশেষ সংযোজন বলা যায়। পাশ্চাত্য দেশে উদ্ভাবিত ও ব্যবহৃত

প্রণালী নিয়ে যখন আমাদের মন ভারাক্রান্ত, সেই সময় মহাত্মা গান্ধী ভারতের বিশেষ পরিবেশে এই উপায় সংযোজনা করে বিস্ময় সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর এই পদ্ধতির অপর নাম ওয়ার্ধা পরিকল্পনা। তিনি একটি মাত্র শিল্প অর্থাৎ চরকাকে মূল কেন্দ্র হিসেবে গ্রহণ করে শিল্পকেন্দ্রিক পঠন-পাঠনের নীতি উদ্ভাবন করেন। তাঁর এই পদ্ধতি অনুবন্ধ নীতির অনুগামী। এর ফলে একটি কেন্দ্র থেকে শুরু করে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে গিয়ে জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করা যায়। অনুবন্ধের মধ্য দিয়ে শিক্ষার বিভিন্ন দিকের সমবায় ঘটে। একটি শিল্পের জ্ঞান থেকে শিক্ষার্থী সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, সমাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং বিভিন্ন জ্ঞানের প্রবাহের মধ্যে একটি সাধারণ সমন্বয় খুঁজে পেতে পারে। এই পরিকল্পনায় বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা, নির্দিষ্ট একটি কুটির শিল্পকে কেন্দ্র করে উৎপাদনাত্মক তথা সৃজনাত্মক কর্মের আয়োজন, সত্য ও অহিংসাকে চরিত্র গঠনের নীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বুনিয়াদি শিক্ষা এই পরিকল্পনারই অংশ। আসলে মহাত্মাজী উৎপাদনাত্মক সৃষ্টিধর্মী এবং জাতীয় ও নৈতিক আদর্শের প্রাথমিক বুনিয়াদী শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন যা জাতির শিক্ষাদীক্ষা চরিত্র গঠন ও জীবিকা অর্জনের ভিত হিসেবে গড়ে উঠে। এঁর পরে স্যার জন সার্জেণ্ট একটি মূল শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষাধারার পরিবর্তে 'কর্মকেন্দ্রিক' শিক্ষার কথা জোর দিয়েছিলেন।

উপরোক্ত এইসব পদ্ধতিগত আলোচনা থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, আধুনিক যুগের শিক্ষার কাজ কখনো চিরাচরিত ধারায় শিক্ষক-শিক্ষার্থী-বিষয়ধর্মী হতে পারে না—তাকে অবশ্যই হতে হবে উদ্দেশ্যমুখী, পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক, বাস্তব অভিজ্ঞতার অনুসারী এবং বিজ্ঞানসম্মত। শিক্ষাকে মৌলিক ধর্মে রূপান্তরিত করতে গেলে চাই বিশেষ ধরনের শিক্ষাগত পরিবেশে বিশেষ বিশেষ ধরনের আয়োজন, অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকাণ্ড। ফলে, আধুনিক শিক্ষাদান অবশ্যই হবে কর্মকেন্দ্রিক এবং জীবনকেন্দ্রিক। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে সমস্যাধর্মী উদ্দেশ্যমুখী কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাদানের জন্য প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য এবং প্রত্যেক কর্মসূচীর জন্য চাই সুসংগঠিত পরিকল্পনা এবং তাকে বাস্তবে কার্যকরী করার জন্য সু আয়োজন।

উপরিবর্ণিত নানা পদ্ধতির মধ্যেই কোনো না কোনো সারবত্তা আছে। এই সমস্ত পরিকল্পনার সারার্থকে কিভাবে শ্রেণীকক্ষে ও বিদ্যালয়ের নানা সহ-পাঠ্যমূলক বা পাঠ্য বহির্ভূত কর্মসূচীর সঙ্গে একই সূত্রে গ্রথিত করা যায়, সে বিষয়ে চিন্তাভাবনা ও বাস্তব পরিকল্পনা দরকার। গতিশীল যুগের সঙ্গে পা ফেলে শিক্ষার আয়োজনকেও হতে হবে সমস্যাধর্মী ও গতিশীল। জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে যেসব অভিনব আবিষ্কার হচ্ছে সেই সব আবিষ্কারের সূত্র গ্রহণ করতে হবে অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রেও। এইভাবে বিভিন্ন জ্ঞানের সমবায়ে অনুবন্ধ প্রণালীতে মানুষের অর্জিত জ্ঞান আরো কিছু অর্জনের পথে প্রসারিত হয়ে যাবে। শিক্ষাদানকে আকর্ষণীয়, চিন্তাকর্ষক, শিক্ষাপ্রদ করে তোলার জন্য এইসব বিজ্ঞানসম্মত ও মনস্তত্ত্বসম্মত রীতিনীতি গ্রহণ করতে হবে আমাদের নিজের দেশের উপযোগী করে, তবেই তা সার্থক হবে।

## প্রশ্নাবলী

১। ভারতের প্রাথমিক অথবা মাধ্যমিক অথবা উচ্চশিক্ষার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করে তার লক্ষ্য ও পদ্ধতি সম্পর্কে পরিচয় দাও।

২। ভারতের শিক্ষাতন্ত্রের সাধারণ বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে বিদেশের যে কোনো দেশের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দেখাও।

৩। ভারতে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা কি রকম এবং তার প্রতিকারের উপায় কি?

৪। স্বাধীন ভারতের শিক্ষায় ইংরেজির স্থান কতখানি হওয়া উচিত?

৫। ওয়ার্ধা ও সার্জেণ্ট পরিকল্পনায় প্রাথমিক তথা বুনিয়াদী শিক্ষার কি কি বৈশিষ্ট্য দেখানো হয়েছে?

৬। প্রাথমিক অথবা মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যসূচী কিভাবে নির্ণয় করা যায়?

৭। ভারতের প্রাথমিক বা মাধ্যমিক বা উচ্চশিক্ষার ক্রটিবিচ্যুতি দেখাও এবং প্রতিকারের উপায় নির্দেশ করো।

৮। নার্সারী ও শিশুশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে কি না?

৯। বৃত্তিগত শিক্ষার সঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষার সম্পর্ক কতটুকু হওয়া উচিত?

১০। ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রের মূল প্রবণতাগুলি আলোচনা করো।

১১। জাতীয় সংহতির জন্য সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দাও।

# অষ্টম পরিচ্ছেদ

# শিক্ষার উপাদান

## ॥ শিক্ষার উপাদান ॥

॥ ১ ॥

বিভিন্ন যুগে বিভিন্নরকমের সামাজিক অবস্থার মধ্যে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয়েছিল বলেই এই বিভিন্নতা অনুসারে শিক্ষার উপাদান বা পাঠ্য বিষয়বস্তুর ও হেরফের ঘটেছিল। শিক্ষার বিষয়-সম্পদ বা ভাব-সম্পদ কি ধরনের হবে বা হতে পারে সেইজন্য আলাপ আলোচনার অন্ত নেই। আমরা জানি, যুগের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষার বিষয়বস্তু বা পঠনীয় বিষয়াবলীর নানারকম বৈচিত্র্য এসেছে। শিক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এই জিনিসটি আরো স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

শিক্ষার অপরিহার্য উপাদান হিসেবে তিনটি জিনিস অবশ্যই স্বীকৃত হয়ে এসেছে—শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং বিষয়বস্তু বা শিক্ষার উপাদান। বর্তমান যুগ শিশু-শতাব্দীর যুগ, তাই শিক্ষার্থীর মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ না করলে কি ধরনের জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীর পক্ষে কার্যকরী ও ফলপ্রদ হবে তা নির্ণয় করা যাবে না। এইজন্য আধুনিক শিক্ষাবিদ ও মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ শিক্ষার্থীর চাহিদা, আশা-আকাঙ্খা, প্রবৃত্তি, কামনা, আবেগ, ভাবানুভূতি ইত্যাদি সবকিছু অনুধাবন করে শিক্ষার্থীর রুচি, প্রবণতা, অনুরাগ, যোগ্যতা, ক্ষমতা ইত্যাদি সবকিছুর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার মতো শিক্ষার উপাদান বেছে নেওয়ার পক্ষপাতী। এ যুগে জ্ঞানের বিভিন্নতা বা বৈচিত্র্যের সীমা পরিসীমা নেই। যুগ সমস্যা দিনে দিনে জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। এই অবস্থায় জ্ঞানরাজ্যের বিস্তৃত এলাকা থেকে শিক্ষার্থীর চাহিদা মতো সুনির্বাচিত বিষয়াবলী নির্ধারণ করা সত্যাই কঠিন কাজ। অথচ শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মধ্যে মানবজাতির অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের ফসল সঞ্চারিত করতে হবে এবং শিক্ষার্থীকে যুগের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তার ব্যক্তিত্ব সংগঠন করতে হবে ও সামাজিক চাহিদা পূরণ করতে হবে। এইসব বিবেচনা করেই শিক্ষার উপাদান নির্ণয় করতে হবে শিক্ষার স্বার্থে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

মানুষ অভিজ্ঞতা আহরণ করে প্রধানতঃ তিনটি ক্ষেত্র থেকে—প্রাকৃতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক দিক থেকে। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংস্রবের ফলে

যে অভিজ্ঞতা মানুষ অর্জন করে, শিক্ষার মধ্য দিয়ে সেই অভিজ্ঞতা বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা হয়।

এই পর্যায়ের মধ্যে পড়ে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, প্রকৃতিপাঠ জাতীয় বিষয়াবলী। সমাজের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিষয়ের মধ্যে পড়ে সমাজপাঠ, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য, কলাচর্চা প্রভৃতি। আমাদের আধ্যাত্মিক সত্তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অভিজ্ঞতা আহরণের ক্ষেত্র হোলো ধর্ম, দর্শন, নীতিশাস্ত্র প্রভৃতি। যুগ যুগ ধরে মানুষ নানারকমের জ্ঞান আহরণ করে এসেছে। তার সেই কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে সে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছে সামাজিক মাধ্যমের সাহায্যে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেই ধরনের সামাজিক প্রতিষ্ঠান। মানব জাতির পুঞ্জীকৃত সংস্কৃতির মধ্যে অবগাহণ করা মানুষের একধরনের স্বভাবকর্ম। সংস্কৃতি, ইতিহাস, সভ্যতা, কৃষ্টি প্রভৃতির মধ্য দিয়ে যে মানবাত্মার শ্রেষ্ঠতম আকুতির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়, তাকে শিক্ষার অপরিহার্য উপাদান হিসাবে গ্রহণ করা বিধেয়। সেই অভিজ্ঞতাকে পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে সংক্রামিত করা দরকার হয়। এইভাবেই মানবসভ্যতা এক অব্যাহত ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে।

ইতিহাসের পাতায় কখনো কোনদিন সম্পূর্ণ নতুনের আবির্ভাব হয় না। যা কিছু আবিষ্কার তার মূলে পূর্ব আবিষ্কারেরই জের। তাছাড়া, সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষার সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে, মানুষে মানুষে সম্পর্ক বা সামাজিক সম্পর্ক নিত্যই পরিবর্তিত হচ্ছে এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাণ্ডারে নিত্য নতুন নতুন সম্পদ সঞ্চিত হচ্ছে যার সঙ্গে মানব জাতির ক্রমোন্নতির একটি ধারাবাহিকতা আছে। এই সমস্ত বিষয়ে যেমন একটি সাধারণ জ্ঞান বা মনোভাব অর্জন করা দরকার, তেমনি যুগের দাবীতে জ্ঞানের এক একটি রাজ্যে বিশেষজ্ঞ হওয়ার দাবী উপেক্ষা করা যায় না।

এর ফলে শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার উপাদান হিসাবে যেমন প্রয়োজন সমগ্র মূল্যবোধের সাধারণ প্রাণকেন্দ্রটিকে জানা, তেমনি প্রয়োজন জ্ঞানরাজ্যের এক একটি বিভাগের শাখা প্রশাখার এক একটি বিশেষ দিক বা সমস্যা সম্পর্কে বিশেষ ধরনের জ্ঞান অর্জন করা। প্রাচীন আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্যমান যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে চুরমার হচ্ছে বলে যেমন পৃথিবীতে দেখা দিয়েছে একধরনের আধ্যাত্মিক সংকট, তেমনি বিজ্ঞানের মানবিক মূল্য যথার্থভাবে উপলব্ধি না করার জন্য আধুনিক যুগে এসেছে এক নিদারুণ নৈতিক সংকট।

এই পরিপ্রেক্ষিতে মানবিক বিদ্যা, বিজ্ঞান, কারিগরী, পারস্পরিক সহযোগিতা-মূলক অনুধ্যান ইত্যাদি বিষয়ে নতুন রীতিতে শিক্ষার উপাদান নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। অবিশ্বাস ও মূল্যবোধের অবলুপ্তির যুগে জাতিতে জাতিতে শ্রদ্ধা ও সমঝোতা গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের সাহিত্যে, ইতিহাস, রাজনীতি, ধর্মনীতি, দর্শন প্রভৃতি বিষয়েব পারস্পরিক আদান-প্রদান জরুরি হয়ে পড়েছে।

এইসব নানা কারণে আধুনিক যুগের শিক্ষার উপাদান তথা পাঠ্যবিষয় অনেক বেশি জটিল ও সমস্যাধর্মী হয়ে পড়েছে।

শিক্ষাবিদ্দের উপর এসেছে এক বিশেষ ধরনের দায়িত্ব কেননা, কি কি বিষয়বস্তু শিক্ষার অপরিহার্য বিষয় হবে এবং কোন্ বিষয় কোন্ স্তরে পঠন-পাঠন হবে এসব দিক বিজ্ঞানসম্মত ও মনস্তত্ত্বসম্মতভাবে না হলে শিক্ষাক্ষেত্রে বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। আর শিক্ষার বিপর্যয় মানে মানব সংস্কৃতির অপমৃত্যু।

## ॥ ২ ॥

## পাঠ্যসূচী নির্ধারণের নীতি

আভিধানিক অর্থে পাঠ্যসূচী বলতে বোঝায় কোনো এক নির্দিষ্ট শিক্ষার পর্যায়ের জন্য শিক্ষার্থীদেব উপযোগী বিষয়াবলী। আবার পাঠ্যসূচী বলতে বোঝায় বিস্তৃত ক্ষেত্রের উপযোগী এক সুনির্বাচিত বিষয়াবলী, বিশেষ ধরনের শিক্ষার উপাদান এবং সমাজজীবনের জন্য নির্বাচিত শিক্ষাপ্রদ অভিজ্ঞতার জিনিস। জ্ঞানের বৈচিত্র্য সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এমন বিষয়াবলী নির্বাচিত করতে হয় যা শিক্ষার্থীর জীবনসমস্যার নানা দিক সম্পর্কে ব্যবহারিকভাবে ও মানসিক-ভাবে একটি প্রস্তুতি গড়ে তুলতে পারে।

বিষয়াবলীর উপাদান বিশেষভাবে সতর্কভাবে নির্বাচিত করতে হবে এবং সেই নির্বাচন যেন সুনির্বাচিত ও সুসংগঠিত নির্বাচন হয়। তাছাড়া, বিদ্যালয়ে সকলের দিকে লক্ষ্য রেখে বহুমুখী বিষয়াবলীর ব্যবস্থা করতে হয়। কেননা, সকলের রুচি, প্রবণতা ও অনুরাগ একরকমের নয়। সকলের মানসিক ক্ষমতা একরকম নয়। মেধাবী, উচ্চ মেধাবী, সাধারণ, অতি-সাধারণ সকল স্তরের শিক্ষার্থীদের দিকে লক্ষ্য রেখে পাঠ্যসূচী নির্ণয় করতে হয়। সমাজজীবনের

কোন্ কোন্ অভিজ্ঞতা বাঁচিয়ে রাখতে হয়, নতুন নতুন কোন্ কোন্ অভিজ্ঞতাকে সংগঠিত করতে হয়, ভাবীকালের জন্য কি কি ধরনের মানসিক প্রস্তুতি প্রয়োজন, এইসব বিষয় লক্ষ্য রেখে পাঠ্যবিষয় নির্ণয় করা প্রয়োজন আছে।

পার্সিনান বলেছিলেন, পাঠ্যসূচী এমন হবে যার মধ্যে জীবনের আদর্শ প্রতিফলিত হবে। অর্থাৎ, জীবনধর্মী পাঠ্য বিষয় নির্বাচন করা দরকার। তাঁর মতে, প্রত্যেক শিক্ষার পরিকল্পনার তলদেশে কাজ করে একটা বাস্তব দর্শন যা জীবনের প্রত্যেকটি বিন্দুকেই অবশ্যই স্পর্শ করে। জীবনের সঙ্গে বিষয়বস্তুর অভিন্নতার দিক বিবেচনা করে পাঠ্যসূচীর যথার্থ সংজ্ঞা নির্দেশ করতে হয়। যে সব জিনিস অকেজো, প্রাণহীন, যুগের চাহিদার একান্ত অনুপযুক্ত সেগুলি সযত্নে পরিহার করে মানব সংস্কৃতির মূল প্রবাহ ধারা থেকে মূল্যবান সাধারণ চিন্তাস্রোতকে বেছে নিতে হয় খুব সতর্কভাব সঙ্গে আবার যুগ চাহিদার নামে মূল্যবোধের অবক্ষয় যেন প্রশ্রয় না পায় সেদিকেও রাখতে হয় সতর্ক দৃষ্টি।

## ॥ ৩ ॥

আদর্শবাদী শিক্ষাবিদেরা শিক্ষার পাঠক্রমকে যুগ যুগান্তের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির উপর প্রতিষ্ঠা চান এবং সেজন্য এঁরা মানুষের আধ্যাত্মিক সম্পদ ও বস্তুগত চাহিদার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে ভাবময় সত্তার বিকাশ সাধনে বেশি তৎপর হন। সংস্কৃতির আবহমান ধারায় যে সব মূল্যবোধ সার্বজনীন সেগুলিকে এঁরা পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করতে চান।

উত্তরাধিকার সূত্রে যে জ্ঞান মানুষের কাছে এসেছে তাকে আহরণ করে সংস্কৃতিমুখী মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এঁরা পঠন পাঠন প্রক্রিয়ার পক্ষপাতী। আদর্শবাদীদের মধ্যে একদল যাঁরা নয়া-আদর্শবাদী হিসেবে চিহ্নিত তাঁরা পাঠ্যসূচীকে ভাগ করতে চেয়েছেন তিনটি পর্যায়ে—প্রাকৃতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক ভাগ অনুসারে।

রাধাকৃষ্ণণ কমিশন এই দৃষ্টিতেই পাঠ্যসূচীর তিনটি পর্যায় ভাগ করে দেখিয়েছেন, প্রাকৃতিক পর্যায়ে বিজ্ঞান, কারিগরী প্রমুখ বিদ্যা প্রভৃতি, সামাজিক পর্যায়ে ইতিহাস, পৌরবিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, তর্কশাস্ত্র, সমাজ-দর্শন, ভূগোল প্রভৃতি এবং আধ্যাত্মিক পর্যায়ে সূক্ষ্মশিল্প, ধর্ম, দর্শন প্রভৃতি বিষয়াবলীকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

মানুষকে যদি প্রকৃত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয় তাহলে এই কমিশনের বিবেচনায় এই তিনটি পর্যায়ের শিক্ষা সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ করতে হবে এবং এই তিনটি পর্যায়ের সামগ্রিক ধারণা প্রত্যেক শিক্ষার্থীকেই গ্রহণ করতে হবে নতুবা সংস্কৃতি ও যুগমূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকৃত মানুষ গড়ে উঠবে না।

প্রয়োগবাদী দার্শনিকেরা মানুষের উপযোজন শক্তির বিকাশ সাধনকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন এবং সেইজন্য আধুনিক যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী বিশেষজ্ঞ গড়ে তোলার বিষয়বস্তুর উপর জোর দেন। জ্ঞানের বিস্তৃত রাজ্য থেকে জ্ঞান আহরণের নীতিতে এঁদের আস্থা নেই। অথচ জ্ঞানরাজ্যের বিস্তৃতি থেকেই জ্ঞান আহরণ না করলে চলে না। কোন বিষয়ে কখনো একেবারে খাঁটি বা নিখুঁত বিশেষজ্ঞ হওয়াও সম্ভব নয়। কোনো একটি বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করলেও তার দ্বারা সামাজিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। তাই, বিভিন্ন বিষয়ে একটা সাধারণ জ্ঞান অর্জন করতেই হয়। কোন দিনই মানুষের পক্ষে পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন সম্ভব নয় কিন্তু তবুও পরিপূর্ণতার আদর্শের দিকে ছুটে চলাই মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা। তাই, আদর্শবাদ থেকে যে প্রেরণা পাওয়া যায়, প্রয়োগবাদ থেকে সে প্রেরণা বা উদ্দীপনা পাওয়া যায় না। প্রয়োগবাদী যেন নিছক এক প্রয়োজনমাফিক দর্শন। প্রয়োজনের উর্ধেও মানুষের যে একটা আকাঙ্ক্ষা আছে সে সম্পর্কে প্রয়োগবাদ উদ্দেশ্য নয়। প্রয়োগবাদ বিশ্লেষণ করলে আরো দেখা যায়, এঁরা প্রয়োজনবাদের উপর বিশ্বাস রেখে শুধুমাত্র "প্রয়োজনীয় বস্তু" শিক্ষা দেবার উপর জোর দেন। অ্যারিস্ততলের বিধান অনুযায়ী এঁরা প্রয়োজনমুখী, উদ্দেশ্যমুখী নয়। জন ডিউই জোর দিয়েছেন শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার উপরে, পুস্তককেন্দ্রিক শিক্ষার উপরে নয়। তিনি দেখিয়েছেন, শিশুর ক্ষমতা আছে মূল্যবোধ সৃষ্টি করবার, এমনকি তাকে পুণর্গঠিত করবার। শিশুর কিছু কিছু স্বাভাবিক অনুরাগের কথা কেউ কেউ বলেছেন। শিশুর ভাষা শিক্ষা সম্পর্কে অনুরাগ, বস্তু সৃষ্টি করার আকাঙ্ক্ষা, বস্তু অনুসন্ধান করার আকাঙ্ক্ষা, সৌন্দর্য প্রকাশ করবার ক্ষমতা অনেকখানি তার স্বভাবধর্মের মধ্যেই পড়ে। অতএব শিশু মনস্তত্ত্বের এই দিকটির উপর নির্ভর করে শিক্ষাকে করতে হবে শিশুকেন্দ্রিক, পাঠ্যবিষয়কেন্দ্রিক নয়।

জন ডিউই ও পার্সিনান পাঠ্যসূচীকে সেইজন্য গতিশীল করতে চেয়েছেন এবং শিশুর স্বভাবধর্মকে, তার রুচি ও অনুরাগকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন।

প্রয়োগবাদীরা মানুষের প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষণীয় বিষয়কে শিক্ষার বিষয়বস্তু করতে চান। এইজন্য তাঁরা কোনো সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা গ্রহণ করতে চান না। তাঁদের মতে মানুষের বহুরকমের বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিজ্ঞতা আহবণের ক্ষেত্র হোলে শিক্ষা। শিশু তার বিচিত্র অভিজ্ঞতা আহরণ করবে কোনো সংকীর্ণ পরিসর থেকে নয়। পরিবেশ নানা রকমেরই হতে পারে যথা—প্রাকৃতিক, সামাজিক, অর্থ নৈতিক, আধ্যাত্মিক ইত্যাদি। শিক্ষার্থী সব রকম পরিবেশ থেকেই জ্ঞান আহরণ করে। এইজন্য প্রয়োগবাদীরা শিক্ষার পাঠক্রমকে গতিশীল করতে চেয়েছেন এবং শিশুর সক্রিয় কর্মপন্থার উপর আস্থা প্রকাশ করে উদ্দেশ্যমূলক জ্ঞানার্জনের পথ নির্দেশ করেছেন। এঁদের বিবেচনায়, নানা সক্রিয় কর্মের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা আহরণই শিক্ষার মুখ্য কথা।

জন ডিউই শিক্ষাকে চেয়েছেন অভিজ্ঞতা-কেন্দ্রিক কর্ম হিসেবে, অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে, অভিজ্ঞতার দ্বারা, অভিজ্ঞতার ভেতরে শিক্ষা গ্রহণ করাই শিক্ষার কাজ বলে মনে করেছেন। শেষপর্যন্ত প্রয়োগবাদীরা জ্ঞানেব বৈচিত্র্য স্বীকার করেছেন দেখা যায় কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী বিষয়াবলী নির্দিষ্ট না করায় শিক্ষাক্ষেত্রে কি কি মুখ্য কর্মধারা অনুসরণ করা যেতে পারে সে সম্পর্কে কোনো নিয়মনীতি অনুসরণ করা যায় না।

**প্রকৃতিবাদীরা** বা মানুষের বর্তমান অভিজ্ঞতাকেই শুধু স্বীকার করেন। বর্তমানের চাহিদা পূরণের দিকেই তাঁদের লক্ষ্য। কোনো সুনির্দিষ্ট পাঠ্যসূচী এঁরা প্রবর্তন করতে চান নি। **প্রকৃতিবাদী** দার্শনিক রুশোর মতে, স্রষ্টির পৃষ্ঠায় যা লিখিত আছে তার ভেতব থেকেই শিক্ষার্থীরা জ্ঞান আহরণ করবে। স্রষ্টার হাত মুক্ত ও নিষ্কলুষ। মানুষ তাকে ক্লেদাক্ত করেছে সামাজিক বিধান সৃষ্টি করে।

প্রকৃতিবাদীরা প্রাচীন কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে স্বীকার করেন না। এর ফলে শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হয় মানুষের পুরাতন বিচিত্র বহুমুখী অভিজ্ঞতার সম্পদ থেকে। শুধু তাই নয়, সুস্পষ্ট বর্তমানের দিকে প্রবল ঝোঁক থাকে বলে এঁরা ভবিষ্যতের কথা বেমালুম ভুলে যান। কোনো দূরদৃষ্টি না নিয়ে শুধু মাত্র বর্তমানকে নিয়েই এঁরা কাজ কারবার করতে চান। বর্তমানকে অতিক্রম করে ভবিষ্যতের দিকে এগিযে যাওয়ার কোনো দূরদৃষ্টি এই মতবাদের মধ্যে নেই। তবে এইটুকু স্বীকার করা যায়, এই মত শিক্ষার্থীর স্বাধীন, স্বতঃস্ফূর্ত, স্বাভাবিক বিকাশ সাধনকে

স্বীকার করেছে এবং প্রকৃতির অভ্যন্তর থেকে খোলা চোখ নিয়ে খোলা মন নিয়ে উপাদান আহরণের নীতি অনুসরণ করেছে বলে এর সাহায্যে শিক্ষার্থীরা অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠতে পারে।

মানবতাবাদী শিক্ষা-দার্শনিকেরা শিক্ষার বিষয়বস্তু হিসেবে মানবধর্মী বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্তের পক্ষপাতী। তাঁরা মানুষের যাবতীয় বোধ ও অভিলাষকে প্রাধান্য দিতে চেয়েছেন। এই মতবাদ ইউরোপের ইতিহাসে মধ্যযুগের শেষপাদে এমন তীব্র রূপ নিয়েছিল যার মধ্যে এইসব শিক্ষা দার্শনিকরা শিক্ষার মধ্যে ক্ল্যাসিকাল বিষয়কে খুবই প্রাধান্য দিয়েছিলেন এই উদ্দেশ্যে যে, এর দ্বারা মানবধর্মীতা জাগ্রত করা যায়।

বর্তমান যুগেও মানবধর্মী বিষয়াবলীর গুরুত্ব হ্রাস পায়নি। বিজ্ঞানের কল্যাণে যখন প্রত্যেক মানুষ তার রুচি ও চাহিদা অনুসারে বিশেষজ্ঞ হওয়ার শিক্ষার জন্য উন্মুখ, তখন কিছু-না-কিছু সাধারণ বা মানবধর্মী শিক্ষার সুষ্ঠু পরিকল্পনা না থাকলে ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, শিক্ষা, ইতিহাস, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির কোনো মূল্য থাকে না, মানুষ হয়ে যায় নিছক যন্ত্রের ক্রীতদাস। স্বাধীন ভারতে তাই দেখা গেছে, মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় মানবধর্মী বিষয়াবলীকে মূল বা কোর এবং ঐচ্ছিক বিষয়াবলী হিসেবে বিভক্ত করে প্রাধান্য দেবার চেষ্টা।

মানবধর্মী বিষয়াবলী মানুষকে যান্ত্রিক হতে না দিয়ে তার মধ্যে মানবতা-বোধ জাগ্রত করবার প্রেরণা দেয় কিন্তু আবার শুধুমাত্র মানবধর্মী বিষয়াবলী গুরুত্ব পেলে বর্তমান যুগের চাহিদা ও মূল্যবোধের প্রতি সুবিচার করা হয় না বলে শিক্ষাকে কিভাবে একসঙ্গে মানবধর্মী, সংস্কৃতিমুখী, বিজ্ঞান ও প্রয়োগধর্মী করা যায়, অন্তত মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যন্ত একটি সাধারণ স্তরে, সেই রকম চিন্তাভাবনা আমাদের দেশের বিভিন্ন কমিশন পর্যালোচনা করে দেখেছেন দেখা যায়।

বস্তুবাদী শিক্ষা-দার্শনিকেরা বর্তমান চাহিদা ও অভিজ্ঞতার উপর গুরুত্ব দেন এবং শিক্ষার উপাদান হিসেবে বিজ্ঞানধর্মী ও মানবধর্মী বিষয়াবলীকে অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে মত দেন। তবে তাঁরা বলেন, জগতের সুখশান্তির জন্যই ভাষা, সাহিত্য, ভূগোল, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি মানবধর্মী বিষয় অধ্যয়ন করা যেতে পারে, চিরন্তন মূল্যবোধের ধারণা নিয়ে নয়। কোনো প্রকার গূঢ় আধ্যাত্মিক তাৎপর্য নিয়ে তাঁরা এইসব বিষয় পঠন-পাঠনের পক্ষপাতী নন। তাঁরা

পাঠ্যসূচীর মধ্যে ইহকালের কল্যাণ ও প্রয়োজন শাস্তির আদর্শ উপযোগী মানবকল্যাণধর্মী বিষয়াবলীকে পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছেন।[১৬]

## ॥ ৪ ॥

পাঠ্যসূচী নির্ণয়ের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিভূমি আলোচনায় শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার ঐতিহাসিক ধারা সম্পর্কে কিছু প্রসঙ্গ উত্থাপন করা দরকার। প্রাচীন ভারতে পঠন, আলোচনা, মনন ও অভ্যাসকে শিক্ষাপদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল এবং শিক্ষার্থীকেই শিক্ষাকার্যে অধিকতর অংশ গ্রহণ করতে হোতো। প্রাচীন গ্রীসেও পাঠ, আলোচনা, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিক্ষা লাভ করতে হোতো। কিন্তু পরবর্তীকালে শিক্ষার ইতিহাসে দেখা যায় মানবতাবাদী ও শৃঙ্খলাবাদীদের দাপটে শিক্ষা নিতান্তই অর্থহীন, বিষয় সর্বস্ব, গতানুগতিক হয়ে পড়েছিল।

ফরাসী দার্শনিক রুশোই সর্বপ্রথম তাঁর 'নঞর্থক' শিক্ষানীতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে শিক্ষাগ্রহণের উপযুক্ত করে তোলার জন্য পুস্তক বা শিক্ষক উভয়ের স্থান গৌণ করে দেখে শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক প্রয়োজন অনুযায়ী প্রকৃতির সংস্পর্শে অভিজ্ঞতা অর্জনকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস বলে গণ্য করেন।

প্লেটোর মধ্যে আমরা পেয়েছিলাম তিনি চর্চার চেয়ে স্বাভাবিক শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর মতে, শিক্ষার কাজ হোলো অন্তঃস্থিত প্রকৃতিকে শুশ্রূষা করা এবং এইজন্যই শিক্ষার আয়োজন। আমরা দেখতে পাই, দেশ-বিদেশের শিক্ষাগুরুগণ শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার উপর জোর দিয়েছেন।

আধুনিক শিক্ষায় মনস্তত্ত্বের প্রভাবে শিক্ষার্থীর উপর অধিক প্রাধান্য দেখানো হচ্ছে। এখন শিক্ষককে শিক্ষার্থীর ব্যবহার, রুচি, প্রবণতা প্রভৃতি সবকিছু জেনে নিতে হয়। শিক্ষার্থীর আশা-আকাঙ্খা, হাবভাব, চালচলন, মানসিক সম্পদ, পরিবেশ ইত্যাদি সবকিছু সম্বন্ধে শিক্ষকের পরিষ্কার ধারণা থাকা চাই। শিক্ষক

---

সোভিয়েত রাশিয়ার বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে শিক্ষাকে 'পলিটেকনিক্যাল' আদর্শে গড়ে তোল' হয়েছে এমনভাবে যার ফলে মাধ্যমিক শিক্ষার সাধারণ স্তরে শিক্ষার্থীরা মানবধর্মী ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তিধর্মী শিক্ষার মধ্য দিয়ে একটি দৃঢ় প্রাথমিক মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে পরবর্তী শিক্ষার পর্যায়ে যেতে পারছে। এই পরিকল্পনার মাধ্যমে মানুষকে জগৎ ও জীবনের উপযোগী করে সকল প্রকার অভিজ্ঞতা অর্জনে গড়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে।

যদি তা না জানেন, তাহলে তাঁর পক্ষে শিক্ষাদান করা কঠিন ব্যাপার। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষাদানের চেয়ে শিক্ষার অর্থ আরো ব্যাপক এবং বহুবিস্তৃত। তাই, শিক্ষককে জানতে হয় শিক্ষার্থী কোন্ পরিণতির দিকে অগ্রসর হবে সেই পটভূমিকা।

মন্তেসরী শিশুকে ইন্দ্রিয়ানুভূতি শিক্ষণের মধ্য দিয়ে শিক্ষাদান করতে চেয়েছেন। এই নীতি রুশোর নীতির অবশ্যম্ভাবী ফল। রুশো বলেছিলেন, শিক্ষাকে প্রক্ষোভমূলক বা ভাবধারামূলক হতে হবে। শিক্ষার ভাবগত বিকাশ লক্ষ্য করতে হবে, দেখতে হবে জ্ঞান ও মহত্ত্ব পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়। তিনি সেইজন্য শিক্ষার্থীর সহজাত প্রবৃত্তির উদ্‌গতিসাধন চেয়েছেন। এইজন্য নানা ধরনের সহ-পাঠ্যসূচীর প্রয়োজনীয়তা শিক্ষানীতি হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানে। মন্তেসরী ইন্দ্রিয়গুলির শিক্ষণের কথা বলেছেন কেননা, এরই মধ্য দিয়ে শিশুর পক্ষে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন সহজ হয়। ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে সর্বপ্রথম অভিজ্ঞতা আহরণের উপযুক্ত করে গড়ে তোলা প্রয়োজন।

এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মন্তেসরী, ফ্রোয়েবেল প্রমুখ শিক্ষাবিদেরা আধুনিক শিক্ষানীতি 'ক্রীড়াত্মক' অন্তরঙ্গ পরিবেশের সুপারিশ করেছেন। আধুনিক নীতিতে শিশুর উপর কোন কিছু জোর করিয়ে চাপিয়ে দেওয়া যায় না। শিক্ষা হবে শিক্ষার্থীর স্বাধীনভাবে অর্জিত অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক। জন ডিউই এই নীতির কথা বারবার বলেছেন।

থর্ন ডাইকের বক্তব্য, বারংবার আবৃত্তি করিয়ে শিক্ষার্থীদের শাস্তি ও পুরস্কারের আনন্দ-বেদনা সঞ্চার করে শিক্ষা দিলে ভালো হয়। কিন্তু এই বক্তব্য আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বের নীতি অনুসারী নয়। শিক্ষাকে হতে হবে চাহিদা-ভিত্তিক। শিক্ষা গ্রহণের ইচ্ছা জাগ্রত করার জন্য চাই পারিপার্শ্বিক আয়োজন। শিক্ষার্থী যে ধরনের অভিজ্ঞতা আহরণ করে এবং অর্জন করতে পারে সেই দিক লক্ষ্য রেখে শিক্ষক তাকে সাহায্য করতে পারেন।

মহামতি অ্যারিস্ততল বলেছিলেন, যাঁরা শিশুকে শিক্ষা দেন তাঁরা অভিভাবকের চেয়েও বেশি সম্মানিত হতে পারেন এইজন্যে যে, পিতা মাতা প্রকৃত পক্ষে জন্ম দেন কিন্তু শিক্ষক শিক্ষা দেন জীবন যাপনের কলাকৌশল। আধুনিক শিক্ষায় সেই নীতি অনুসরণ করে শিক্ষককে বন্ধু, পথনির্দেশ ও দার্শনিকের ভূমিকা নেবার জন্য শিক্ষা-মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ পরামর্শ দিয়েছেন।

মনোবিজ্ঞান ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্যের যে নীতির কথা বলে তা শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষাদর্শের বিরোধী নয়। অন্তর্নিহিত ক্ষমতা ও আগ্রহের দিক দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যক্তিগত পার্থক্য আছে। তাদের নিজ নিজ ক্ষমতা, আগ্রহ, দক্ষতা, অনুরাগ প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষার উপাদান নির্ণীত হওয়া চাই।

সকল শিক্ষার্থীকে একই প্রকার শিক্ষা দেওয়া উচিত হবে না। শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক বিকাশ সাধনের জন্য ব্যক্তি-পার্থক্যের নীতি অনুযায়ী শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্বাচিত ও নির্ধারিত হওয়া যুক্তিসম্মত। পার্সিনান এই দৃষ্টিভঙ্গিতেই শিক্ষাকে "ব্যক্তিত্বমণ্ডিত" এবং শিক্ষার্থীকে "সমাজমণ্ডিত" করার যে নীতি নির্ধারণ করেছিলেন তা মনোবিজ্ঞান সম্মত ও গ্রহণযোগ্য। তাঁর মতে, ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে সামাজিক পরিবেশে যেখানে শিক্ষার্থীরা সাধারণভাবে একই অনুরাগ ও কর্মবৃত্তির মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে। সেইজন্য চাই যুগ্ম কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে ব্যক্তি-পার্থক্য অনুযায়ী বিষয়াবলীরও বৈচিত্র্য। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে পরিবেশ বা বংশগতি কার প্রভাব সবচেয়ে বেশি ক্রিয়াশীল, এ সম্বন্ধে বেশি কিছু সঠিকভাবে বলা যায় না।

তবে আধুনিক শিক্ষানীতি বংশগতি ও পরিবেশ উভয়েরই প্রভাব স্বীকার করে নিয়ে বলতে চায়, শিক্ষার্থী জন্মগ্রহণ করে একটা জৈবিক উত্তরাধিকার নিয়ে কিন্তু তাকে বেড়ে উঠতে হয় সামাজিক উত্তরাধিকারের মধ্য দিয়ে। একথা সত্য যে, বিদ্যালয়কে কৃত্রিম ধরনের একটা সামাজিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে নিতে হয় এবং সামাজিক সংগঠনের মধ্য দিয়ে বংশগতি ও আদিম উপাদানগুলিকে সমাজ-সম্মতভাবে পরিচালিত করতে হয়।

স্যাণ্ডিফোর্ড দেখিয়েছেন, বংশগতি আসলে জৈবিক সত্তার অঙ্কুরে অবস্থিত সম্ভাবনা সমূহের সমাহার। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায়, মানুষ যে ধরনের জৈবিক গুণাবলী, প্রবৃত্তি, বুদ্ধি, ক্ষমতা, আদিম উপাদান সঙ্গে করে বহন করে আসুক না কেন, পরিবেশের প্রভাবে তার অনেকখানি সংশোধিত হয়ে অন্যরূপ নেয়।

ড্যাভেনপোর্ট দেখিয়েছেন, পরিবেশ আসলে এনে দেয় এক ধরনের উদ্দীপনা —সেই উদ্দীপনাতে প্রতিবেদন করার ক্ষমতা আসে শিক্ষার্থীর আদিম ক্ষমতা থেকে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যবহার বা অভিজ্ঞতা জিনিসটা দাঁড়ায় এই দুই শক্তিরই মিলিত যোগফলে। আমরা এইটুকু বুঝি, শিক্ষার্থীর মধ্যে অনেক রকমের

সম্ভাবনার বীজ লুকিয়ে আছে যা তার পৈত্রিক সূত্র থেকে আহৃত জৈবিক গুণাবলী ছাড়াও মানব জাতির গুণগত বৈশিষ্ট্যও, সেই সঙ্গে যদি পরিবেশের যত্ন ও পরিচর্যা যথার্থভাবে হতে পারে, তাহলে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর নব রূপান্তর অবশ্যই সম্ভব।

এই কাজে আধুনিক বিদ্যায়তনের ভূমিকা নিছক জ্ঞান বিতরণের কেন্দ্র হিসেবে নয়। অফুরন্ত আনন্দ ও স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক বিকাশ সম্ভব করে তোলার জন্যে চাই বিশেষভাবে নির্বাচিত পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যসূচী বহির্ভূত নানারকমের কর্মানুষ্ঠান।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন— 'শিক্ষাকে দেয়াল দিয়া ঘিরিয়া, গেট রুদ্ধ করিয়া দিয়া দারোয়ান দিয়া পাহারা বসাইয়া, শাস্তি দ্বারা কণ্টকিত করিয়া, ঘণ্টা দ্বারা তাড়া দিয়া মানবজীবনের আরম্ভে এ কি নিরানন্দের সৃষ্টি করা হয়েছে।' তিনি অন্যত্র আরো বলেছেন, শিশুদের নিজেদের একটা সক্রিয় নির্জ্ঞান মন আছে, গাছের মতোন তা পরিপার্শ্ব থেকে খাদ্য সংগ্রহ করতে পাবে। তাদের কাছে বেতের শাসন, নিয়মনীতি অনুশাসন অট্টালিকা সাজসরঞ্জামের চেয়ে এবং পাঠ্যপুস্তক ও শ্রেণী শিক্ষাদানের চেয়ে বেশি কার্যকর হোলো পরিবেশের ভূমিকা। তিনি সেইজন্য শিক্ষার একটি বিশেষ পরিবেশ গঠনের পক্ষপাতী যার ভেতর দিয়ে শিক্ষার্থীরা পাবে আত্ম-বিকাশের স্বাধীনতা, আত্মার সংবেদনশীলতা, মনের দরদপূর্ণ সত্যিকারের স্বাধীনতা। তিনি সেইজন্য প্রাকৃতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সত্তার সঙ্গে পরিপূর্ণ সঙ্গতি রেখে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও তার পঠন-পাঠন, কার্যাবলীর ধারা নির্ণয় করতে চেয়েছিলেন, যা আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান সম্মত রীতি। সম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য তিনি চেয়েছেন আদিম স্বভাবের মতো উচ্ছল প্রাণপ্রবাহ এবং মানসিক দিক দিয়ে সভ্যভব্য হওয়ার নীতিকে, যার ফলে মানুষ মানসিক দিক দিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হতে পারে, মানুষের সঙ্গে হতে পারে একান্তই মানবিক ও সামাজিক।

আমরা জানি, জন ডিউই শিক্ষার বিষয়বস্তুর উপর জোর না দিয়ে শিক্ষার উপাদান বা উপাত্ত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন শিশু বা শিক্ষার্থীকে এবং তার কর্মবৃত্তিকে। তাঁর মতে, শিক্ষার্থীর জীবনে নানাধরনের কর্মবৃত্তিই মুখ্য জিনিস। নানারকমের কর্ম অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে শিক্ষার্থীকে সক্রিয় করে শিক্ষা আহরণের

সুযোগ দিতে হবে। তিনি আরো দেখিয়েছেন, শিক্ষার্থীর মধ্যে কিছু ঝোঁক বা প্রবণতা আছে, সে কিছু সৃষ্টি করতে চায়, কিছু অনুধাবন করতে চায়, সামাজিক মূল্যবোধকে গড়ে তুলতে চায়, সমাজকে কিছু দান করতে চায় এবং এইভাবে তারা তাদের এক ক্ষেত্রে অর্জিত অভিজ্ঞতাকে অন্য ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে। একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে অর্জিত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগায় অন্য কোনো অবস্থায়। এক ক্ষেত্রে অর্জিত ক্ষমতাকে অন্য ক্ষেত্রে প্রয়োগের এই ক্ষমতা এক ধরনের মানসিক শক্তি। একে জন ডিউই-যের ভাষায় বলা যায়, 'বুদ্ধিগত শৃঙ্খলা', তবে পার্থক্য এই যে, এই শৃঙ্খলাকে কখনো প্রাচীন ধ্যান ধারণা অনুযায়ী 'গতানুগতিক শিক্ষণজাত শৃঙ্খলা' বলে গণ্য করলে চলবে না। চেষ্টিতবাদীরা যে ধরনের মানসিক শৃঙ্খলার কথা বলেন তার সঙ্গে এর মৌলিক পার্থক্য আছে। প্রাচীন চেষ্টিতবাদীরা (ফ্যাকাল্টি মতানুযায়ী) মনের বিভিন্ন কর্মবৃত্তির আলাদা আলাদা চচার উপর জোর দিয়েছিলেন। কিন্তু, জন ডিউই সামগ্রিকভাবে 'বুদ্ধিগত শৃঙ্খলার' পক্ষপাতী। তাঁর মতে সমস্ত কাজ পরস্পরের পরিপূরক হবে, থাকবে এক গভীর একাত্মতা বা অনুষঙ্গ। এক একটি মানসিক শক্তির বিচ্ছিন্ন শিক্ষণ নয়।

মনস্তাত্ত্বিকরা মানুষেব অভিজ্ঞতাকে ভাগ করেছেন তিনটি পযাযে। জ্ঞান, ভাব এবং অনুভূতি, এই তিন প্রকার অভিজ্ঞতার স্তর থেকে মানুষ শিক্ষালাভ করে। আমবা বিভিন্ন বুদ্ধিগত ক্ষেত্র থেকে জ্ঞান অর্জন করি। ধর্মনীতি কাব্য প্রভৃতি থেকে আহরণ করি ভাব বা উদ্দীপনা। সৌন্দর্যগত ক্ষেত্র থেকে পাই অনুভূতি। পাঠ্যসূচী নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এই তিন প্রকার অভিজ্ঞতা অর্জনের স্তব মনস্তাত্ত্বিকেরা অনুমোদন করেন।

তবে মনে রাখতে হবে ভাব আহরণের ক্ষেত্র আর অনুভূতি আহরণের ক্ষেত্র এক জিনিস নয়। উভযের মধ্যে একটা ভেদ বা সীমা রেখা আছে তা যেন স্পষ্ট থাকে। কোনো কোনো মনস্তত্ত্ববিদ্ বলেছেন, এক ক্ষেত্র থেকে যে জ্ঞান বা ভাব বা অনুভূতি আহরণ করা যায়, তা অন্য ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যায়। জিনিসটা ঠিক শিক্ষণের হাতফেরি বদল ব্যাপার নয়, অনুষঙ্গের ব্যাপার। তবে তাঁরা সতর্ক করে দিয়েছেন যে, অনুবন্ধ নীতি সব সময় সার্থক হয় না, তার একটা সীমা-পরিসীমা আছে। তাই, যেখানে অনুবন্ধ নীতি কাজের কাজ করে না, সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয বিষয় শিক্ষাদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা শ্রেয়।

স্যাণ্ডিফোর্ড বলেছেন, যেখানে এই শিক্ষণ ক্ষমতার সংক্রমণ সম্ভব হবে না, সেখানে সব চেয়ে ভালো কাজ হবে সামাজিক দিক থেকে প্রয়োজনীয় জিনিস শিক্ষা দেওয়া।

থমসন দেখিয়েছেন, শিশু তাব নিজস্ব অনুভূতি ও রস কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে, জ্ঞানকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে না—সুতরাং পাঠ্যসূচীতে ভাব ও অনুভূতিমূলক বিষয়াবলীই গ্রহণ করা বিধেয়।

এইভাবে আমরা দেখতে পাই, বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক শিক্ষার অপরিহার্য উপাদান হিসেবে বিষয়বস্তুর নীতি নির্বাচ.ন বিজ্ঞানসম্মত পথের নির্দেশ করেছেন এবং তাঁদের সেই নির্দেশ মনে রেখে পাঠ্যসূচী নির্ধারণের ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়াই শিক্ষাবিদ্‌দের কাজ হবে।

## ॥ ৫ ॥

পার্সিনান বলেছিলেন, বিদ্যালয়ের ভেতর এমন সব মানবিক ক্রিয়াকাণ্ড চলবে যা পৃথিবীর সব চেয়ে মূল্যবান, স্থায়ী ও কার্যকরী সম্পদ। সমাজবাদীরা এই দিক লক্ষ্য রেখেই বলতে চান, পাঠক্রম নির্ণয়ের সময় জীবনের তথা সমাজ-মণ্ডিত ব্যক্তিও সমাজজীবনের প্রয়োজনের দিকেই লক্ষ্য রেখে গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। তাঁদের ধারণা এই, সমাজে শিক্ষার্থীকে নানা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে যার প্রস্তুতি শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে চাই। পাঠ্যসূচীকে সেইভাবে প্রস্তুত করতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি সামনে রেখে একসময় হার্বার্ট স্পেনসার পাঠক্রমের কয়েকটি মূলনীতি নির্দেশ করে দিয়েছিলেন, যার একটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে।

হার্বার্ট স্পেনসারের সেই নীতিগুলিব মধ্যে আছে (১) আত্মরক্ষার তাগিদ (২) সংগ্রহ প্রবৃত্তি (৩) শিশুপালন (৪) সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্বন্ধ (৫) সাংস্কৃতিক জীবনের চর্চা।

একটু বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় স্পেনসারের উদ্দেশ্য কি ছিল। প্রথমতঃ, আত্মরক্ষার তাগিদকে তিনি দুভাগে ভাগ করে দেখিয়েছেন, এক, প্রত্যক্ষ আত্মরক্ষা, দুই, অপ্রত্যক্ষ আত্মরক্ষা। মানুষ এই পৃথিবীতে একা বাঁচতে পারে না, সমাজের মধ্যেই তাকে মিলে মিশে বাঁচতে হয়। প্রত্যক্ষ আত্মরক্ষার তাগিদ এইখানে যে, তাকে সকলের সঙ্গে মেলামেশা করেও নিজেকে বাঁচতে

হবে। অপ্রত্যক্ষ আত্মরক্ষা হোলো এই জিনিস যে, নিজেকে বাঁচতে তো হবেই, সেই সঙ্গে সঙ্গে দেশ, জাতি, সমাজ যাতে বাঁচে সেজন্য সামাজিক দায়িত্ব পালন করা মানে নিজেরও একধরনের প্রতিরক্ষা। দ্বিতীয়তঃ, মানুষকে বাঁচার তাগিদে জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় বস্তু সৃষ্টি করা ও সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করা প্রয়োজন হয় এবং সেক্ষেত্রে তাকে পারস্পরিক সহযোগিতার নীতি মেনে চলতে হয়। তৃতীয়তঃ, শিশুরা আমাদেরই সৃষ্টি এবং ভবিষ্যতের ধারক ও বাহক। প্রত্যেক পিতামাতা, অভিভাবক ও শিক্ষকের একটা দায়িত্ব আছে এই প্রজন্মের জন্য সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন করা। চতুর্থতঃ, সমাজ ও রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং সেইজন্য শিক্ষানীতির মাধ্যমে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নিয়ম নীতি অনুসরণের একটা চাহিদা থাকে। পঞ্চমতঃ, মানুষের কাছে সাংস্কৃতিক জীবনের একটা সম্পর্ক খুবই মূল্যবান, কেননা, মূল্যবোধের প্রতি তার একটা অনিবার্য আকর্ষণ আছেই।

এইভাবে হার্বার্ট স্পেনসার জীবন ধারণের সম্পূর্ণ তাগিদে কয়েকটি নীতি নির্ধারণ করে দেখিয়েছিলেন, শিক্ষার পাঠক্রমের মধ্যে এই নীতিগুলি লক্ষ্য রেখে এমন সব প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষাদান করতে হবে যা মানুষকে একটা পরিপূর্ণ জীবন যাপনে তৈরি করে।

তাঁর এই মূল বক্তব্য অনুসরণ করে আমেরিকার ন্যাশনাল এডুকেশন কমিশন পাঠ্যসূচীর মূল নীতি প্রণয়ন করেছিলেন নিম্নলিখিতভাবে: (১) স্বাস্থ্যরক্ষা (২) মৌলিক বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করা, যেমন ভাষা শিক্ষা, অঙ্ক কষা, লিখতে পারা (৩) পরিবারের যোগ্য হওয়ার শিক্ষা লাভ করা (৪) বৃত্তিগত বা পেশাগত শিক্ষণ (৫) নাগরিকত্ব গড়ে ওঠার শিক্ষা (৬) বিশ্রামমুখীন শিক্ষা এবং (৭) নৈতিক চরিত্র গঠন।

সমাজতাত্ত্বিক দিক দিয়ে শিক্ষার লক্ষ্য হবে এমন গণতান্ত্রিক শোষণহীন বিভেদহীন সামাজিক ও মানবিক আদর্শের রূপায়ণ করার উপযোগী মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠা যার ফলে শিক্ষার্থীর জীবন চর্চা সম্পূর্ণভাবে বসবাসের নীতিতে উপযুক্ত হয়ে উঠবে এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সামাজিক প্রগতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটা সক্রিয় উপাদান হিসেবে কাজ করবে। সেইজন্য জীবনের অভিজ্ঞতাপ্রদ বিজ্ঞানসম্মত সবরকমের কর্মবৃত্তিরই স্থান থাকবে পাঠ্য তালিকায়।

এইজন্য কোনো কোনো শিক্ষাবিদ্ পাঠ্যসূচীকে ভাগ করেছেন সুনির্দিষ্ট পর্যায়ে যেমন, ভাষা শিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা, নাগরিকত্বের শিক্ষা, সামাজিক সংযোগ সাধনের শিক্ষা, মানসিক বা বুদ্ধিগত শিক্ষা, ধর্মীয় বা নীতিবোধের শিক্ষা, বিশ্রামমুখীন শিক্ষা, গৃহসংস্কৃত শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং সাধারণ মনোভাব গড়ে ওঠার শিক্ষা।

আমাদের বক্তব্য এই, যে যে অভিজ্ঞতা মানুষের সমাজজীবনে একান্ত প্রয়োজনীয়, সুদূরপ্রসারী সেই বিষয়গুলি পাঠ্য তালিকায় নিতে হবে সমাজ মণ্ডিত ব্যক্তিত্ব গঠনের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য। বর্তমান যুগে মানুষের জীবনধারা ও অভিজ্ঞতা বহুমুখী ও জটিল হয়ে পড়েছে, মানুষের জ্ঞানের বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের সীমা পরিসীমা নেই।

এই ক্ষেত্রে বিজ্ঞান সম্মতভাবে পাঠ্যসূচী নির্ধারণ করতে গেলে মানুষের তিনটি মূল অভিজ্ঞতা আহরণের কেন্দ্রবিন্দু—প্রাকৃতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক দিক লক্ষ্য রেখে এগিয়ে যেতে হবে এবং সেজন্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর উপযোগী পথ নির্দেশক বা গাইড জাতীয় বই দরকার যার ভেতর খুব সংক্ষিপ্তভাবে, যার ভেতর মানবসভ্যতার বিবর্তনের একটি বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা থাকবে, আধুনিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ও স্বাস্থ্য, ভূগোল, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক মূল্যবোধ ইত্যাদি সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন সংস্কারমুক্ত সাধারণ মৌলিক নীতির নির্দেশ থাকবে এবং গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার অনুকূলে দেশ রাষ্ট্র বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার অনুকূলে আবশ্যিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সাধারণ নির্দেশ থাকবে।

আমাদের বিবেচনায় শিক্ষার প্রত্যেক স্তরেই এইরকম একটি কমনসেন্স এডুকেশন প্রোগ্রাম খুবই জরুরি। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের জন্য এই জাতীয় কর্মসূচী পাঠ্য তালিকার অত্যাবশ্যক অঙ্গ হওয়া যুক্তিসম্মত। তাছাড়া, জ্ঞানবিজ্ঞান ও অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের যুগে যেখানে প্রতি পদে পদে অস্তিত্বের সংকট, সেখানে বিশেষভাবে জ্ঞান অর্জনের জন্য জীবন ও জীবিকার "বাস্তবসম্মত কার্যকরী শিক্ষণ" পাঠ্যতালিকার মূল প্রাণকেন্দ্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। কেননা, নিছক জ্ঞানচর্চা, পুঁথিগত বিদ্যাস মানুষের বাস্তব জীবনে কোনো কাজে লাগে না। সাধারণ মূল্যবোধের শিক্ষার সঙ্গে বাস্তব-জীবনের প্রস্তুতির শিক্ষা হবে একান্তই কর্মভিত্তিক,

বিজ্ঞানধর্মী ও বাস্তব কর্মসূচী ভিত্তিক। যতদূর সম্ভব জটিলতা পরিহার করে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও বাস্তবপন্থাকে সহজ, সরল ও সংক্ষিপ্ত ও সুস্পষ্ট করে শিক্ষার কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, তবেই সামাজিক উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও চাহিদা পূরণ সম্ভব হবে।

· বিদ্যালয়ে সংগঠিত করতে হয় অসংখ্য ধবনের সমন্বিত কর্মধারা। তা করতেই হয় শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কাযকারিতার দিকে লক্ষ্য রেখেই। প্রচলিত শিক্ষায় এইসব শিক্ষার সমন্বিত ধারা যেন নাম-কা-বাস্তে একটা সংযোজন, জীবনধারা বা জীবনচর্চার অঙ্গ হয় না। অথচ জীবনবোধের প্রকৃত সুষ্ঠু বিকাশ সাধনের জন্য শিক্ষার সমন্বিত কর্মধারার ভেতর অজস্র রকমের কর্মকাণ্ড আনতেই হয়। শরীরচচা, খেলাধূলা, আমোদপ্রমোদ অনুষ্ঠান, শ্রমশীল উৎপাদনমুখী কাজ, প্রত্যক্ষভাবে আহরণ করা যায় কিছু অভিজ্ঞতা এমন সব ক্রিয়াকাণ্ড শিক্ষার পাঠক্রমের অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত না হলে শিক্ষাই জীবন এই জিনিসটা একটা ফাঁকা আওয়াজ থেকে যায়।

সেইজন্যে, আমাদেব মনে হয়, বিদ্যালয়ের পাঠক্রম নির্বাচনের সময় শিক্ষার সমন্বিত কর্মধারাকে সমধিক গুরুত্ব দিতে হবে। অজস্র কর্মসূচীর বিন্যাস চাই। শিক্ষার্থীরা নিজেরাই সেইসব কর্মসূচী আলাপ আলোচনা করে ঘুরে ফিরে দেখে বাজিয়ে নিয়ে নিজেদের রুচি ও প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষাক্রম ও সমন্বিত কর্মধারা নির্বাচন করুক। শিক্ষাবর্ষেব প্রথম তিন মাস শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে নিজেদের কর্মসূচী নির্বাচন করার জন্য উদ্যোগ নিক। তারপর তাদের কাছ থেকে অধীত ও সমন্বিত শিক্ষাক্রমে ফিরিস্তি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে "সমষ্টিগত পৃথকীকরণ" বা শ্রেণী বিন্যাসের কাজে শিক্ষক বন্ধু, দার্শনিক ও পথপ্রদর্শের ভূমিকায় নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসুন।

এই বিষয়ে আমাদের বিবেচনায় একটি "কর্মসূচী ভিত্তিক শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসমন্বিত ক্রিয়াকাণ্ডের" পরিচ্ছন্ন গাইড বা নির্দেশ বই থাকা দরকার যার ভেতর রেলের টাইম টেবিলের ছকে নির্দিষ্ট উপায়ে চলতে থাকবে কর্মধারা, জীবন ও জীবিকা তথা বৃত্তিগত ও সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে শিক্ষা সমন্বিত ক্রিয়াকাণ্ডের সুষ্ঠু সমন্বয়।

মনে রাখা দরকার, আমাদের দেশে কোনো অধীত বিষয়ে বিশেষভাবে বিশেষজ্ঞ হওয়ার বয়স কুড়ি বছরের আগে নির্দিষ্ট হওয়া সমীচীন নয়। তার

পূর্বে শিক্ষার্থীর জানা দরকার আছে তথ্যের স্তূপ নয়, মৌলিক জ্ঞানের সূত্র ও প্রণালী। যার যে বিষয়ে প্রবল অনুরাগ সেই সেই এক বা একাধিক বিষয়ে আস্তে আস্তে দক্ষতা বাড়িয়ে তুলে খুব সতর্কভাবে তাদের স্থানান্তরিত করতে দিতে হবে বিশেষ ধরনের বিদ্যায়তনে।

শিক্ষাসূচীর এইসব প্রয়োজন মেটানোর জন্য শিক্ষার বৃহৎ কর্মকাণ্ড দরকার, তাই, প্রত্যেক ধাপে প্রত্যেক কর্মসূচী হবে সুচিন্তিত, সুবিন্যস্ত, বিজ্ঞানসম্মত, সহজ, সরল, সুনির্দিষ্ট ও সংক্ষিপ্ত ধরনের। শিক্ষাসূচীর এই প্রয়োজন মেটানোর জন্য চাই রাষ্ট্রের প্রেরণা ও প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব। আমাদের মতোন এই সুবিশাল দেশে বৈচিত্র্যের নামে শিক্ষার কোনো সুস্পষ্ট জাতীয় নীতি নেই অথচ শিক্ষার নীতিনির্দেশের জন্য সুস্পষ্ট কেন্দ্রীকরণ নীতিরই এখানে আবশ্যকতা সবচেয়ে বেশি এবং তা কার্যকরী করার জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হস্তে রূপায়ণের সার্বিক অধিকার এখানে খুবই জরুরি। নতুবা সমন্বয়ের অভাবে, দূরদর্শিতার অভাবে এক এক রাজ্যে এক এক রকম শিক্ষানীতি চলতে থাকলে জাতীয় সংহতির পক্ষে তা আদৌ অনুকূল হবে না।

পাঠ্যসূচী নির্ধারণের সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তিভূমি সম্পর্কে পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে, শিক্ষার উপাদান নিঃসন্দেহে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও শিক্ষাসূচী। তাই, এই তিনটি জিনিসের মধ্যে চাই সমন্বিত সমন্বয়ের বিন্যাস। শিক্ষা যা চলবে তা যেন সামাজিক অভিজ্ঞতা আহরণের উপযোগী হয় এবং সামাজিক চাহিদা পূরণের পক্ষে উদ্দেশ্যমূলক হয়। 'শিক্ষাই জীবন' এই মূলনীতি বিস্মৃত হলে চলবে না। শিক্ষার কার্যক্রম এমনভাবে গড়ে উঠবে যেখানে বিভিন্ন রকমের কর্মমূলক ও উদ্দেশ্যমূলক অভিজ্ঞতা আহরণ করা যায়। বিদ্যালয়ের অপরিহার্য কাজ হবে সামগ্রিক অবস্থার সৃষ্টি করা। এমনভাবে তা করতে হবে যার ফলে প্রত্যেক শিক্ষার্থীই সমাজমণ্ডিত ব্যক্তি হিসেবে গড়ে ওঠার গুণ অর্জন করতে পারে এবং আনন্দমূলক কর্মানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতা আহরণ করতে পারে।

## ॥ ৬ ॥

## প্রচলিত পাঠক্রম ও তার সংস্কার

**মানুষের বিভিন্ন অভিজ্ঞতাকে শ্রেণীবদ্ধ করে উত্তরাধিকার সূত্রে সেগুলি মানবমনের মধ্যে সংক্রামিত করে তোলার জন্য শিক্ষা পরিকল্পনার মাধ্যমে**

দরকার হয় সুনির্দিষ্ট পাঠ্যক্রমের। পাঠ্যসূচী সুনির্দিষ্ট, সুনির্বাচিত না হলে প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করা সম্ভব নয়। গতানুগতিক পন্থায় পাঠ্যসূচী নির্ধারিত হলে শিক্ষার লক্ষ্য পূরণ হয় না। কোন্ লক্ষ্যের অভিমুখীন হবে শিক্ষার ধার সেইটে খুবই প্রয়োজনীয় ব্যাপার। যুগের চাহিদা ও উদ্দেশ্য লক্ষ্য করে শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন।

শিক্ষার্থীর বিভিন্ন অভিরুচি ও চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে বিষয় নির্বাচনের স্বাধীনতা দিতে হবে। শিক্ষক এই নির্বাচনে সাহায্য করবেন একজন হিতাকাঙ্ক্ষী হিসেবে। আমাদের দেশের বিভিন্ন কমিশন বিভিন্ন সময়ে শিক্ষার বৈচিত্র্যমূলক বিষয়াবলী সম্পর্কে যেসব আলোকপাত করেছেন, সেগুলি পর্যালোচনা করে পাঠ্যসূচীর ব্যাপারে স্থির সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

পাঠ্যসূচী নির্ণয়ের সময় মনে রাখতে হবে, আমরা চাই সম্পূর্ণ মানুষটির শিক্ষা। সেইভাবে শিক্ষার্থীর বয়স, রুচি, প্রবণতা, দক্ষতা ইত্যাদি লক্ষ্য রেখে পাঠক্রমের ধারা গড়ে তুলতে হবে। পাঠক্রম অত্যন্ত "বিষয়কেন্দ্রিক" হয়ে পড়লে তা নিতান্তই এক পেশে, গতানুগতিক ও একঘেঁয়ে হয়ে যায়। মানুষের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে মানবধর্মী বিষয়, বৈজ্ঞানিক বিষয়, প্রযুক্তিবিদ্যা, সমাজ সম্বন্ধীয় বিষয় ইত্যাদি নানা পর্বে ভাগ করার রেওয়াজ দেখা যায়।

কিন্তু এই ধরনের জ্ঞানের স্তর বিভাগ করার সার্থকতা কতখানি, কোন্ সময় এই স্তরভাগ করা যেতে পারে, শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট পরিকল্পনায় প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে কিভাবে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য যোগ্য করে তোলা যায়, এই-সব বিষয়গুলি গভীরভাবে বিবেচনা না করলে ফল ভালো হয় না। প্রত্যক্ষভাবে অভিজ্ঞতা আহরণ করা যায় যে সব ক্ষেত্র থেকে, সেগুলি অনেক সময় 'বিষয়-কেন্দ্রিক' গতানুগতিক শিক্ষায় মর্যাদা দেওয়া হয় না।

এইসব কারণে শিক্ষাবিদেরা বিভিন্ন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সুষ্ঠু সমন্বয়ের জন্য অনুবন্ধ নীতির কথা বলেছেন। অবশ্যই এই নীতি চালু হলে বিষয়কেন্দ্রিক গতানুগতিক শিক্ষার একঘেঁয়েমি দূর হয়ে উদ্দেশ্যমূলক কর্মক্ষেত্র থেকে জ্ঞান অর্জনের নীতি গৃহীত হতে পারে।

বিষয়-কেন্দ্রিক পাঠ্যসূচীর সংস্কার সাধনের জন্য অনেক শিক্ষাবিদ্ 'কর্মের মাধ্যমে শিক্ষার' নীতি অনুসরণের কথা বলেছেন। বিষয়কেন্দ্রিক শিক্ষায়

জ্ঞানের বহরের উপর জোর বেশি পড়ে কিন্তু ব্যবহারিক জীবনের জ্ঞানের উপর জোর দেওয়া হয় না।

গতানুগতিক শিক্ষার ত্রুটি হোলো, জ্ঞানের বৈচিত্র্যকে স্বীকার না করা। আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদেরা চেষ্টিতবাদীদের মানসিক শৃঙ্খলার নীতি বরবাদ করে দিয়েছেন সেইজন্য। মনের কোনো নির্দিষ্ট শক্তিচর্চার চেয়ে সামগ্রিক জ্ঞান অর্জনের দিকেই আধুনিক শিক্ষার ঝোঁক।

মনস্তাত্ত্বিক আন্দোলনের ফলে আধুনিক শিক্ষানীতি বিষয় ভারাক্রান্ত শিক্ষাকে বরবাদ করে শিক্ষার ব্যাপক অর্থকে সম্প্রসারিত করতে চেয়েছে এবং সেইজন্য শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক চাহিদা পূরণের উপযোগী বাস্তব, কার্যকরী, উদ্দেশ্যমূলক শিক্ষার উপর জোর দিয়েছে।

আধুনিক শিক্ষানীতি শিক্ষার্থীর সক্রিয় অভিজ্ঞতা আহরণের ক্ষেত্রকে চেয়েছে সম্প্রসারণ করতে। শিশুর চাহিদা, প্রবৃত্তির স্ফুরণ, শক্তি, অভিরুচি ও দক্ষতার চর্চা আজ সর্বজনস্বীকৃত। আধুনিক শিক্ষানীতিতে বিভিন্ন জ্ঞানের মধ্যে সমন্বয় সূত্র স্থাপনের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন বিষয়কে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা আধুনিক শিক্ষানীতির লক্ষণ নয়।

পুরাতন বিষয়কেন্দ্রিক শিক্ষায় রচনামূলক পরীক্ষা-পদ্ধতি ছিল ব্যাপকভাবে চালু। কিন্তু, আধুনিক শিক্ষানীতি চেয়েছে নতুন নতুন উদ্দেশ্যমুখী পরীক্ষা-পদ্ধতি, বিজ্ঞানসম্মত ও মনস্তত্ত্বসম্মত উপায়ে শিক্ষার্থীর কার্যক্ষমতা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের মূল্যায়ন।

এই উদ্দেশ্যে আধুনিক শিক্ষানীতি পাঠ্যসূচীকে ব্যবহারিক প্রয়োজনের উপযোগী করে পুণর্গঠিত করতে চেয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন সেইজন্য সঠিকভাবেই বলেছিলেন, শিক্ষার্থীর স্মৃতিকে কতকগুলো তথ্যের স্তূপ দিয়ে ভরাট না করে তাকে এমনভাবে অনুরাগী ও কৌতুকপ্রবণ করতে হবে যার ফলে সে জ্ঞানের বিভিন্ন কায়দাকানুন বা কলাকৌশল রপ্ত করতে পারে। এবং বলা যায়, এইভাবে সে বিভিন্ন জ্ঞানরাজ্যের মধ্যে অনুবন্ধ ও অনুষঙ্গ স্থাপন করতে পারে। আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের ফলে প্রচুর বিষয় পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে।

মানুষের পক্ষে সে সব কিছু আয়ত্ত করা সম্ভব নয় অথচ জগৎ ও জীবনের চ্যালেঞ্জ যেখানে প্রতি পদে পদে, সেখানে তাকে এমন একটা মানসিক প্রস্তুতি নিতে হয় যার দ্বারা সে একটা সাধারণ মনোভাব নিয়ে সবকিছুর মোকাবিলা করতে পারে।

এইসব দৃষ্টিভঙ্গির ফলে আধুনিক শিক্ষানীতি বিষয়াবলীর পরিবর্তিত রূপে নতুন নতুন বিষয়-পার্থক্য বা শ্রেণীবিভাগ করেছেন। যেমন, ইতিহাস, ভূগোল, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয় একত্রীভূত হয়ে নতুন একধরনের জ্ঞান-শৃঙ্খলার রূপে আত্মপ্রকাশ করছে যার নাম 'সমাজবিজ্ঞান'।

এতদিন পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যসূচী বিষয় ভারাক্রান্ত ছিল ইংরেজ আমল থেকেই কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষার বিশেষ সমস্যা যতই আলোচিত হচ্ছে, ততই এই স্তরের পাঠক্রমকে শিক্ষার্থীর রুচি প্রবণতা দক্ষতার দিকে লক্ষ্য রেখে নতুনভাবে বিন্যাসের চেষ্টা হয়েছে ও হচ্ছে।

বৃত্তিগত শিক্ষার দিকে নজর পড়েছে যদিও বাস্তব ফলাফল যৎসামান্য। অন্যান্য প্রগতিশীল দেশে এই স্তরে শিক্ষার্থীর বুদ্ধিগত, শারীরিক, ভাবগত, সৌন্দর্যগত ও সমাজগত অনুরাগ ও ক্ষমতা ব্যাপকতা অনুযায়ী শিক্ষণীয় বিষয় নিরূপণের চেষ্টা হয়েছে এবং এই স্তরে বাস্তব জীবনের সামাজিক শিক্ষার দিকেই বেশি করে ঝোঁক দেখা গেছে। আমাদের দেশের সমস্যা এই, শিক্ষার্থী জ্ঞানের পরিমাণ কম আয়ত্ত করুক আপত্তি নেই কিন্তু সে যেন জ্ঞানার্জনের কলাকৌশল রপ্ত করে মৌলিকভাবে ও স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে ও কাজ করতে শেখে এমনভাবে শিক্ষার্থীকে প্রস্তুত করে তোলা চাই। সেই বিষয়াবলীই শিক্ষা দেওয়া উচিত যা শিক্ষার্থীদের রুচিগত ও মেজাজগত ব্যাপার হয়, তাদের দক্ষতায় তথা পারদর্শিতায় সম্ভব হয়, বুদ্ধিগতভাবে তারা সে সব বিষয় অনুধাবন করতে পারে—এক কথায় জীবন ও জীবনের কর্মধারায় সেইসব বিষয় কিছু অবদান রাখতে পারে।

যে পাঠ্যসূচী শিক্ষার্থীকে জীবনের জন্য প্রস্তুত করে না এবং যে শিক্ষা আনন্দজনক নয়, জীবনধর্মী নয়, বিদ্যালয়ের বাইরের জীবনে যে শিক্ষা কোনো কাজে লাগে না, চেতনা সৃষ্টি করে না, সে শিক্ষার কানাকড়ি মূল্য নেই।

এইসব কারণে, মাধ্যমিক শিক্ষায় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে, কর্মের মাধ্যমে জীবনধর্মী ও জীবিকাধর্মী শিক্ষার আওয়াজ উঠেছে, যা খুবই যুক্তিসম্মত। পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যসমন্বিত ও অতিরিক্ত বিষয়াবলী ও কর্মবৃত্তির এমন যুক্তিসঙ্গত বিন্যাস চাই মাধ্যমিক স্তরে যারফলে শিক্ষা যেন বাস্তবোচিত, বিজ্ঞানধর্মী, প্রগতিশীল, সংবেদনশীল, সৃষ্টিমুখর হতে পারে। গতানুগতিক পাঠক্রমের পরিবর্তে শিক্ষাক্রমে আধুনিক শিক্ষানীতির সংযোজন তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আবশ্যিক।

॥ ৭ ॥

## পাঠ্যসূচী নির্ণয়ের মৌলনীতি

পাঠ্যসূচী নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সর্বদা দায়িত্বমূলক নীতি অনুসরণ করতে হয় এবং এইজন্য এই ব্যাপারে শিক্ষকদের চেয়েও বিশেষজ্ঞের ভূমিকা খুবই প্রয়োজনীয়।

পাঠ্যসূচী নির্ধারণের জন্য কিছু মৌলিক নীতি অনুসরণ করা দরকার এবং সেইজন্য আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির চাই প্রসারতা। সংকীর্ণ দৃষ্টিতে পাঠ্যসূচী নির্ণীত হলে শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। পাঠ্যসূচীর মধ্যে কতকগুলি নির্দিষ্ট বিষয়সূচী থাকতে পারে কিন্তু অভিজ্ঞতা-কেন্দ্রিক শিক্ষার জন্য চাই বিরাট ও বহুমুখী কর্মবৃত্তির আয়োজন।

শিশুর চাহিদা বহুবিচিত্র এবং বহুমুখী। তাদের চাহিদা পূরণের জন্য উদ্দেশ্য-মূলক ও কর্মমূলক সূচীর ব্যবস্থা করতে হয়। পাঠ্যসূচী নির্ণয়ের ক্ষেত্রে চাই শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা। সেই স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ করবে সমাজ, রাষ্ট্র, বিদ্যালয় ও শিক্ষক। এই নিয়ন্ত্রণ মানে তাদের স্বাধীন বিকাশকে সুষ্ঠুধারায় প্রবাহিত হতে সাহায্য করা। স্বেচ্ছাচারিতা নয়।

পাঠ্যসূচী নির্ণয়ের আরেকটি নীতি হবে ব্যক্তি-পার্থক্যের নীতি মেনে চলা। শিক্ষার্থী তার ব্যক্তিগত অভিরুচি ও চাহিদা অনুসারে যাতে চলতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। একজন শিক্ষার্থীর ইচ্ছা, অনুরাগ, চাহিদা, প্রবণতা আর একজনের মতো নয়। এইজন্য পাঠ্যসূচী যেন বিচিত্র ধরনের শিক্ষার্থীর দিকে লক্ষ্য রেখে বহুমুখী ও বৈচিত্র্যমুখীন হয়। এইরকম ধারণা থেকেই আমাদের দেশে মাধ্যমিক স্তরে বহুমুখী বিদ্যালয় গঠনের প্রচেষ্টা দেখা দিয়েছিল। মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশ ছিল তাই। নিছক এক ঘেঁয়ে পুস্তককেন্দ্রিক শিক্ষাসূচীর পরিবর্তে বৈচিত্র্যপূর্ণ শিক্ষাসূচী গ্রহণের নীতি অবশ্যই স্বীকৃত হয়েছে পরবর্তী কমিশনের সুপারিশেও। তবে শিক্ষাবিদদের ধারণা, একটা স্তর পর্যন্ত শিক্ষায় সাধারণ ভিত্তিভূমি শক্ত হওয়া দরকার। এই নীতি অনুযায়ী বহুমুখী সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা পরবর্তীকালে বর্জিত হয়েছে।

ব্যক্তি পার্থক্যের নীতি অনুসরণ করতে গিয়ে মুদালিয়র কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যসূচীকে মানবধর্মী, বিজ্ঞান, কারিগরী, বাণিজ্য, কৃষি, চারুশিল্প ও গার্হস্থ্য বিজ্ঞান—এই ধরনের পর্যায়ে ভাগ করেছিলেন এবং শিক্ষার্থীদের জন্য কিছু

আবশ্যিক মূল বিষয় যেমন ভাষা, সমাজ বিজ্ঞান, অঙ্ক, শিল্পকে সর্ব ধরনের শিক্ষার্থীদের পক্ষে আবশ্যিক (ভাষা ও শিল্পের ক্ষেত্রে ইচ্ছাধীন বিষয় নির্বাচনের স্বাধীনতা সহ) ছাড়া যে কোনো একটি শাখায় বিষয় নির্বাচনের অধিকার ও স্বাধীনতা দিতে চেয়েছিলেন। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব ও কার্যকারিতা বিচারের জন্য 'কিউমুলেটিভ রেকর্ড-কার্ড' প্রবর্তনেরও সুপারিশ করা হয়েছিল।

পরবর্তীকালে কোঠারি কমিশন এইসব পদ্ধতির মধ্যে অনেক কিছু অসঙ্গতি লক্ষ্য করে মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও কাঠামো সম্পর্কেই এক ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির প্রবর্তন করেন। এইসব কারণে আমাদের দেশে মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা কোনো স্থিতিশীল রূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি। যাহোক, এইটে অনুভূত হচ্ছে যে শিক্ষার্থীকে সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব অর্জন করতে হলে এবং তাকে সামাজিক উদ্দেশ্য পূরণের হাতিয়ার হিসেবে গড়ে তুলতে গেলে শিক্ষার্থীর শিক্ষার একটি স্তর পর্যন্ত সময় খুব ভালো করে সাধারণ ভিত্তিভূমি গডে দিতে হবে এবং তারপর তার দক্ষতা, চাহিদা, প্রবণতা ইত্যাদির দিক লক্ষ্য রেখে অভিজ্ঞতা ও বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তাকে বৃত্তিমুখী শিক্ষার দিকে নিয়ে যেতে হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে অনুবন্ধ নীতির সাহায্যে সমস্ত কিছু শিক্ষাদান করা সম্ভব নয় বলে অনেক শিক্ষাবিদ্‌দের ধারণা। আবার জ্ঞানবিজ্ঞান ও বিশেষজ্ঞের যুগে জ্ঞানের ফাঁক যাতে না হয় সেজন্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিস্তার একটা সাধারণ ভিত সকলের জন্য দরকার। এইসব নানা কারণে মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যসূচীর মূল ও ঐচ্ছিক বিষয় নির্দিষ্ট করা খুবই জটিল প্রশ্ন হয়ে আছে। তবুও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়েই একটা স্থিতিশীল পথের সন্ধান চলছে যা সকলের কাম্য।

## প্রশ্নাবলী

১। শিক্ষামূলক তথ্যপঞ্জী তৈরি করতে গেলে কি কি প্রাথমিক নীতি মেনে চলা উচিত?

২। একটি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর পূর্ণাঙ্গ পরিচয় কিভাবে তুলে ধরা যায়?

৩। তথ্যপঞ্জী তৈরির বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক যুক্তি কি?

৪। সমাজ উন্নয়নের ক্ষেত্রে অথবা শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে তথ্যপঞ্জী সংগ্রহের সার্থকতা কি?

৫। কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে দেখাও একটি বিজ্ঞান সম্মত তথ্যপঞ্জী একটি পরিকল্পনাকে সুষ্ঠুভাবে কার্যকরী করার ক্ষেত্রে উপযুক্ত পদক্ষেপ।

# নবম পরিচ্ছেদ

# সহ-পাঠ্য সূচীর প্রয়োজনীয়তা

# সহ-পাঠ্য সূচীর প্রয়োজনীয়তা

## ॥ ১ ॥

শুধুমাত্র বিষয়কেন্দ্রিক পাঠ্যসূচী বা কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যসূচীতে শিক্ষার উদ্দেশ্য পূরণ হতে পারে না—সেজন্য চাই পাঠ্যসূচীর পরিপূরক শক্তি হিসেবে পাঠ্য সমন্বিত তথা সহ-পাঠ্যসূচী ও কর্মবৃত্তির অনুসরণ। কর্মমূলক, অভিজ্ঞতামূলক, সমাজমূলক ও উদ্দেশ্যমূলক শিক্ষার ধারায় বিচিত্রমুখী অভিজ্ঞতা আহরণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের নিয়ে যেতে হবে, এই দাবী আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানের।

আধুনিক যুগের শিক্ষা কেবলমাত্র পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। তাকে অবশ্যই সহ-পাঠ্যসূচীর সঙ্গে সমন্বিত হতে হবে। সহ-পাঠ্য-সূচীকে পাঠ্যসূচীরই অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গ্রহণ করার নীতি মানতে হবে। এইসব কারণে আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানে পাঠ্যসূচী বহির্ভূত তথা একসট্রা-কারিকুলার কর্মবৃত্তির পরিবর্তে নতুন নতুন প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন একসট্রা-ম্যুরাল, কো-কারিকুলার, একসট্রা ক্লাস, নন্-ক্লাস, কোলেটোর‍্যাল ইত্যাদি।

এন্‌সাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা আভিধানিক অর্থে সহ-পাঠ্যসূচীকে বলেছেন, শ্রেণীকক্ষের বাইরে শিক্ষার্থীদের কর্মধারা। সহ-পাঠ্যসূচীর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মধ্যে নিম্নলিখিত গুণাবলীর বিকাশ সাধন সম্ভব বলে শিক্ষাবিদেরা মনে করেন। যেমন, সামাজিক বিষয় অনুধাবন করবার ক্ষমতা অর্জন করা, সঠিক পন্থা নির্ণয়ের অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা, আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা, সততা, জনসেবার মহৎ আদর্শ প্রভৃতি গুণাবলী অর্জন করা।

অতি প্রাচীনকাল থেকেই বুদ্ধিগত চর্চার উপর অস্বাভাবিক জোর দিয়ে আসা হয়েছিল। শিক্ষায় শরীর, মন ও ও আত্মার সম্মিলিত চর্চার নীতি তখন 'অনুসরণ করা হোতো না। দার্শনিকরা শরীর ও মনকে আলাদা সত্তা হিসেবে দেখেছিলেন। ফলে, সামগ্রিকভাবে মানুষকে দেখবার বা তাকে গড়ে তোলার বাস্তবধর্মী শিক্ষা সে যুগে ছিল না।

প্লেটো ও অ্যারিস্ততল যা-কিছু পার্থিব জিনিসকেই অবাস্তব বলেছিলেন। তাঁদের কাছে, আইডিয়া বা ভাব ছিল কাজের জিনিস। পার্থিব জিনিস সম্পর্কে

ভারতীয় দর্শনও কোনো মোহ প্রকাশ করেন নি। এইসব দার্শনিক ধারণার ফলে মানসিক উৎকর্ষ সম্বন্ধে চরম ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল—দেহগত ও বস্তুগত উৎকর্ষ সাধনের দিকে অবহেলা ছিল। আমরা যদি শুধুমাত্র চিন্তা, ভাবনা, বিচার প্রভৃতি মানসিক শক্তির চর্চা করি, দেহগত ও বস্তুগত তথা পার্থিব ব্যাপার-স্যাপার অবহেলা করি, তাহলে সম্পূর্ণ মানুষ তৈরি হবে কি করে?

আধুনিক শিক্ষানীতিতে ক্রমবিকাশের ধারায় শরীর-মন আত্মার উৎকর্ষ সাধনের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ সমাজ সমন্বিত ব্যক্তিত্ব গঠনের আদর্শ স্বীকৃত হয়েছে। ব্যক্তির জীবনসত্তার সমগ্র দিকটিই বিবেচনার যোগ্য। শিক্ষার মধ্য দিয়ে চাই শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত দেহগত চেতনার বিকাশ, অনুভূতি, মানসিক ও বুদ্ধিগত শক্তি এবং আধ্যাত্মিক প্রেরণার যুগ্ম উদ্‌বোধন।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, শুধুমাত্র "অত্যাবশ্যক বিষয়াবলীর" মধ্যে আবদ্ধ থাকা মানুষের প্রকৃতি নয়। অত্যাবশ্যক বিষয় ছাড়াও মানুষেব এমন কিছু প্রয়োজন আছে যা শবীব, মন ও আত্মাকে পরিপূর্ণতাব দিকে নিয়ে যায়। এই যুক্তি মেনে নিয়ে বলা যায়, শিক্ষা-সূচীতে শুধুমাত্র "পাঠ্যসূচীকেই" অপরিহায বলে ধরে নেওয়া যায় না। প্রয়োজন নানাবকমের আনুষ্ঠানিক কর্মবৃত্তি—খেলাধূলা, নাচগান, সভাসমিতি, অভিনয়, বিতর্ক, ভ্রমণ, বনভোজন প্রভৃতি। বিশ্রামমুখীন কাজও এক ধরনের কাজ। কাজ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে কাজ করা শক্তি সংগ্রহের এক অত্যাশ্চর্য নীতি। মানুষের মন ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া দিয়ে গঠিত। নানা কর্মের মধ্য দিয়ে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে মনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করতে হবে গড়ে ওঠার দিকে আব এইজন্য চাই নানাধরনেব কর্মানুষ্ঠান। পুঁথিগত জ্ঞানের সঙ্গে কর্মধাবার মধ্য দিয়ে অর্জিত জ্ঞানের সুষ্ঠু সমন্বয় দরকার।

রাধাকৃষ্ণণ বলেছিলেন, শিক্ষকের কাজ তাই হবে শিক্ষার্থীর ভেতরকার সৌন্দর্যকে টেনে বের করা এবং ব্যবহারিক জগতে সে কতখানি কার্যকরী তা প্রমাণ করা। এই কাজ করার জন্য পাঠ্যসূচী বহির্ভূত বলে গণ্য বিষয়কে শিক্ষাসূচীর মধ্যেই টেনে আনতে হবে এবং "পাঠ্যসূচী বহির্ভূত" কথাটি ব্যবহার না করে বলা দরকার "সহ-পাঠ্যসূচী"।

আধুনিক শিক্ষায় সহ-পাঠ্যসূচী কর্মবৃত্তি অপাংক্তেয় ব্যাপার নয়, একেবারে

শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। প্রগতিশীল বিদ্যালয়গুলিতে এর পরীক্ষা-নিরীক্ষা সার্থক বলে প্রমাণিত হয়েছে।

একথা আজ সর্বজন স্বীকৃত যে, পাঠ্যসূচীর পরিপূরক হিসেবে সহ-পাঠ্যসূচীর স্থান গৌণ নয়। এমন এক সময় ছিল যখন শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষার্থী সকলেই 'পাঠ্যসূচী বহির্ভূত বিষয়'কে কোনো মর্যাদা দিতেন না কিন্তু বর্তমান যুগে পাঠ্যসূচীর সঙ্গে সহ-পাঠ্যসূচীর সহ-অবস্থান তথা কর্মবৃত্তি সমন্বিত পাঠ্য-সূচীর প্রবর্তন স্বীকৃত হয়েছে বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে। যে বিদ্যালয়ে যত বেশি রকমের সহ-পাঠ্যক্রম অনুসৃত হয়, সে বিদ্যালয় ততো বেশি প্রগতিশীল হিসেবে চিহ্নিত।

আমরা শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে বাঁচতে পারি না। অনাবশ্যক বোঝা অনেক সময় বহন করার প্রয়োজন আছে জীবনের তাগিদেই। গড়ের মাঠে যে বিস্তৃত প্রান্তর, তারও প্রয়োজনীয়তা আছে বলে রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছিলেন। শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন আছে 'খেলাচ্ছল' পরিবেশের। সমস্তকিছু কাজের মধ্যে একটা হাস্যোচ্ছল আনন্দ ও খেলাচ্ছল স্বতঃস্ফূর্ততার প্রয়োজন আধুনিক শিক্ষা-নীতিতে সর্বজন স্বীকৃত হয়েছে। 'খেলাচ্ছল' কর্মবৃত্তির পেছনে যে মনস্তাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে তা আমরা এখানে কিছু উল্লেখ না করে পারি না। কেননা, সহ-পাঠ্যমূলক কর্মবৃত্তির মাধ্যমে শিক্ষাকে সমাজমণ্ডিত করে তোলার কাজে, শিক্ষার্থীকে স্বতঃস্ফূর্ত, ক্রিয়াশীল ও স্বাধীনভাবে তৈরি করার কাজে 'খেলাচ্ছল' কর্মবৃত্তির একটি বিশেষ ভূমিকা আছে।

খেলাধূলা শিশুর নানাপ্রকার ভাবধারা প্রকাশের একটি উপযুক্ত মাধ্যম। তাই, আধুনিক শিক্ষাবিদেরা ক্রীড়াসুলভ মনোভাবকে জাগিয়ে রাখার অপরিহার্য নীতিকে মেনে নিয়েছেন।

খেলাধূলা আসলে সহজাত প্রবৃত্তির স্ফুরণ, প্রবৃত্তিগুলি এর মাধ্যমে সমাজ-সম্মত পথ পেতে পারে। তাছাড়া, এ জিনিসটি একটি সৃষ্টিমূলক কাজ, সৃষ্টিসুলভ প্রবণতায় সংঘবদ্ধ হয়ে শিক্ষার্থীরা নানারকমের উৎসাহ উদ্দীপনা ও আনন্দ প্রকাশের সুযোগ পায়। এর দ্বারা আত্মপ্রকাশের সুযোগ আসে, সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতা উভয় রকমের কাজের ভেতর দিয়ে। খেলার আনন্দে শিশুরা এক ধরনের 'কল্পনা-বিলাসে'র আশ্রয় নিয়ে কল্পনার রঙীন মানুষ উড্ডীন করে।

শিশুর আত্মবিকাশ, আত্মপ্রচেষ্টা, কল্পনাবিলাস, সংযোগ সহযোগিতা ও নেতৃত্ব বোধ, স্বর্গীয় আনন্দ লাভ প্রভৃতি নানা গুণাবলীর বিকাশ সাধন সম্ভব হয় এর মধ্য দিয়ে।

ফ্রোয়েবেল বলেছিলেন—"খেলাধূলার মধ্য দিয়ে শিশুর মনে যে গভীর আনন্দ দেখা দেয়, তা দিয়ে তারা বেড়ে ওঠার সুযোগ পায়। যেমন কুঁড়ি থেকে ক্রমশ ফুল ফোটে, তেমনি খেলাধূলার মাধ্যমে তারা প্রকৃত মনুষ্যত্বের গৌরবে গৌরবান্বিত হয। তাব মাধ্যমে আনন্দের উৎস খুঁজে পায়।" কাজের সঙ্গে খেলাধূলাব সংমিশ্রণ ঘটিযে তোলা আধুনিক শিক্ষানীতির একটি বিশেষত্ব। মানুষের মধ্যে এই জিনিসটি একটি প্রবণতার মতো স্থায়ী উপাদান। কোনো কোনো মনস্তাত্ত্বিক খেলাধূলাকে 'প্রবৃত্তি' বলে আখ্যায়িত করেছেন কিন্তু একে একটি কোনো প্রবৃত্তি মনে কবা ভুল, আসলে অনেক প্রবৃত্তিরই তা সমাহার। এর মাধ্যমে মানুষ খুঁজে পায় আশা-আকাঙ্খা, উৎসাহ-উদ্দীপনা, আনন্দ ও স্বতঃস্ফূর্ততাব পথ। নিছক বস্তুগত চাহিদার পথ নয়।

ম্যাকডুগালের মতে, খেলাধূলা আসলে প্রাণপ্রৈতিরই প্রকাশ, প্রবৃত্তির পথ ধরে তার প্রবাহ নয়, তার পথ একটা গতিশীলতাব অনিবার্য অতৃপ্ত ক্ষুধার জন্য উপচে পড়া শক্তি, আমাদের জৈবিক গতিশীল যন্ত্র-উপাদানের মধ্য দিয়ে খুঁজে পেতে চায় তার আশা-আকাঙ্খার পথ। সত্যই তাই। একে তাই নিছক মাংসপেশীর স্বতঃস্ফূর্ত ও আনন্দজনক প্রতিবর্ত ক্রিয়া বলে মনে করা যায় না। আসলে এই জিনিসটি মানুষের জন্মগত অধিকারের মতো ব্যাপার।

ড্রেভার খেলাব মধ্যেই পেয়েছেন আনন্দের সন্ধান। পার্সিনান জিনিসটিকে অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার বলে মনে করেন নি বরং মনে করেছেন এর দ্বারা মানুষ ইচ্ছা করলে কাজ করতে পারে, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, প্রয়োজন হলে অবস্থা আয়ত্ত করে তাকে পরিবর্তন করতে পারে। খেলা শিক্ষার্থীর জীবনে এক অপরিহার্য উপাদান মনে করে ফ্রোয়েবেল দেখিয়েছেন, জিনিসটা একটা ফালতু ব্যাপার নয়, বেশ গুরুত্বপূর্ণ বা অর্থপূর্ণ ব্যাপার। পার্সিনানের বিবেচনায় খেলাধূলার ব্যাপারটি প্রবৃত্তির মতো সংরক্ষণশীল নয়, আসলে এ জিনিসটি গতিশীল, লীলার আনন্দ, সৃষ্টির আনন্দ, এই উল্লাস আছে এর মধ্যে।

আমাদের ভারতীয় দর্শনেও খেলাধূলাকে 'লীলা' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে—ভগবান আনন্দের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশিত করেন, লীলার আনন্দেই এই লীলা, তার উদ্দেশ্য তার নিজের মধ্যে একেবারে স্বতঃনির্ধারিত ব্যাপার বলে স্বীকৃত।

মনস্তাত্ত্বিক ও দার্শনিকরা খেলাধূলার আরো নানা তত্ত্বের অবতারণা করেছেন দেখা যায়। জার্মান দার্শনিক শিলার, ইংরেজ শিক্ষা-দার্শনিক হার্বার্ট স্পেনসার প্রমুখের মতে শিশুর মধ্যে লুকিয়ে আছে এমন এক অস্বাভাবিক শক্তি যা তার প্রয়োজনের চেয়েও বেশি। খেলাধূলার মাধ্যমে সে তার বাড়তি শক্তিকে বের করে দেয় এবং বাইরের থেকে শক্তি আহরণ করে নিজের প্রাণপ্রৈতিকে এইভাবে সে ব্যাটারী চার্জ করে।

স্ট্যানলি হলের মতে, খেলাধূলা আসলে পূর্ব পুরুষের সংস্কারজাত কর্মধারার একধরনের রিহার্সল বা পুনরাবৃত্তি। এই অভিনয়ের দ্বারা আসলে মানুষ তার প্রবৃত্তির উদ্গতি সাধন চায়।

পার্সিনান এই তত্ত্ব সমর্থন করে বলেছেন, খেলাধূলার মধ্য দিয়ে এক রকম 'ক্যাথারসিস' হয় যার উদ্দেশ্য শক্তির উদ্গতি সাধন বা সমাজ সম্মতভাবে চালিত করলে তার শারীরিক-মানসিক-আধ্যাত্মিক শক্তির পুণর্বীকরণ।

মেলব্রানস্, কার্ল গ্রুস প্রভৃতি দেখিয়েছেন খেলাধূলার মাধ্যমে শিশু যে তার বাড়তি শক্তি বের করে দেয় তা নয়, সে আসলে শক্তি সংগ্রহ করে। জার্মান দার্শনিক ল্যাজারাসের মতে, খেলাধূলার মধ্য দিয়ে মানুষ পেতে চায় আনন্দ ও পরিতৃপ্তি, এক ধরনের কাজে ক্লান্তি অনুভব করে অন্য কাজের মধ্যে গিয়ে স্বস্তি পাওয়ার ব্যাপার।

এইভাবে মানুষের প্রাণপ্রৈতির ধারা অব্যাহত থাকে। কোনো কোনো মনঃস্তাত্ত্বিক, খেলা জিনিসটাকে অবদমিত ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ বলে অভিহিত করেছেন। তাঁরা বলেন, এর মধ্য দিয়ে অবদমিত কামনা, ইচ্ছা, অনুভূতি প্রভৃতি একটা আশা পূরণের পথ পায়।

জন ডিউই, ফ্রোয়েবেল প্রমুখ শিক্ষাবিদেরা দেখিয়েছেন, খেলার মধ্য দিয়ে শিশু চায় সক্রিয় জীবন ধারা এবং নানা প্রকারের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে। উডওয়ার্থ প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, খেলাধূলা আসলে একটা যান্ত্রিক ব্যাপার, উদ্দীপনা-প্রতিবেদনার মতো সম্পর্কের ব্যাপার, এর মধ্যে কোনো জীবন দর্শন নেই।

লীপ বলেছেন, খেলার মধ্য দিয়ে মানুষ চায় বস্তুর সঙ্গে একাত্মতা। রাসেলের মতে, এর মধ্য দিয়ে ক্ষমতা অর্জন করে বড়ো হওয়া যায়। অ্যাডলারের মতে আসলে এই শক্তিটা ক্ষমতা অর্জনের একপ্রকার ইচ্ছাশক্তি। ফ্রয়েড দেখিয়েছেন, এর মধ্য দিয়ে শুধু কতকগুলি আনন্দ প্রকাশ করা যায় তা নয়, মনের মধ্যে সঞ্চিত অবদমিত ভাব ধারার স্ফুরণ ও বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয় এর মধ্য দিয়ে।

এইভাবে খেলাধূলা সম্বন্ধে নানা তত্ত্ব প্রচলিত আছে। ব্রাড্‌লি ও হর্নীর মতে, খেলাধূলা ও কাজের মধ্যে কোনো পার্থক্য স্বীকার করা যায় না। পার্থক্য যেটুকু আছে তা মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে যুক্তিসম্মত খেলাধূলা দীর্ঘস্থায়ী হয় না, কাজ হয় দীর্ঘস্থায়ী, এই ধরনের একটা পার্থক্য আছে এদের মধ্যে। আধুনিক শিক্ষাবিদেরা খেলাভিত্তিক কাজ এবং কাজভিত্তিক খেলার নীতিকেই সমর্থন করেছেন।

এই নীতির সঙ্গে শিক্ষার পাঠ্যক্রম ও পাঠক্রম সমন্বিত সহ-পাঠ্যসূচীর কর্মধারার সংহতি গড়ে তোলাই আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানের নীতি। খেলাভিত্তিক কাজ ও কাজভিত্তিক খেলা আসলে জীবনধারারই স্বাভাবিক প্রকাশ, তাই তাকে নানা কাজ, খেলা ও পাঠের সঙ্গে সমন্বিত করতে পারলে শিক্ষার ধারা হয়ে ওঠে বাস্তবধর্মী অথচ আনন্দজনক।

## ॥ ২ ॥

**জীবনের সক্রিয় অভিজ্ঞতা আহরণের মধ্য দিয়ে সমাজজীবনের যোগ্য নাগরিক হওয়ার শিক্ষাই বাস্তব ভিত্তিক শিক্ষা। সহ-পাঠ্যসূচী বা পাঠক্রম সমন্বিত কর্মমূলক শিক্ষা এই উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারে।**

বিদ্যালয়ের কাজ হবে একটা সামগ্রিক অবস্থা সৃষ্টি করা যার ফলে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক একাত্ম হয়ে একই কর্মধারার মধ্যে কর্মানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সমাজজীবনের যোগ্য নাগরিক হিসেবে যে যার কাজ করতে পারে।

আধুনিক শিক্ষায় পাঠ্যসূচীর সঙ্গে সমন্বিত কর্মধারা অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত করার চেষ্টা চলছে। বিষয় পঠন পাঠনের সঙ্গে কর্মধারা যুক্ত হলে শিক্ষা জিনিসটা যে সার্থক হতে পারে তা দেখা যাচ্ছে নানান বিশ্রামমুখীন কর্মসূচী গ্রহণের

দ্বারাও। বিতর্ক সভা, প্রাচীরপত্র, বিজ্ঞান ক্লাব প্রভৃতি সংগঠিত প্রয়াস পাঠ্যসূচীর বিষয় পাঠকে আকর্ষণীয় ও আনন্দপ্রদ করে তুলছে।

সহ-পাঠক্রম শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক পূর্ণতা সাধনে সাহায্য করে। এগুলি শিক্ষার উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় শিক্ষার্থী প্রেরণামূলক অনেক উপাদান সংগ্রহ করবার সুযোগ পায়। তার মধ্যে নানা সম্ভাবনা ও সৃজনীশক্তি লুকিয়ে আছে অথচ সেগুলি নিছক বিষয়কেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় স্ফুরিত হতে পারে না।

সহ-পাঠক্রমে অংশ নিলে নানা বিচিত্র সৃজনধর্মী ক্ষমতা প্রকাশে এক অপূর্ব সুযোগ আসে। জীবনের অনেক মহৎ গুণাবলীর চর্চায় উপাদান হিসেবে সে সব কাজ খুবই চমকপ্রদ ও কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয়।

এ জাতীয় কর্মবৃত্তির সুযোগ পাওয়ায় শিক্ষার্থীর ভেতর যে ভাবধারা বা অনুভূতি প্রচ্ছন্ন থাকে তা প্রকাশিত হয়ে পড়ে, ফলে তার পক্ষে একটা মানসিক ভারসাম্য অর্জন সম্ভব হয়, তার ভাবগত দিকটি একটি সমাজসম্মত পথ ধরে সম্ভাবনার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এ জাতীয় কর্মসূচীর ফলে সে বাস্তব ক্ষেত্র থেকে অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করে, ভাবসংহতি অর্জন করে অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে একটা সামগ্রিক দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করে যা আত্মগত ও বিষয়গত দুই ধরনেরই।

শিক্ষার্থীর মধ্যে যে ভাব সংহতি আসে তার দ্বারা সে হতাশা ও বেদনা অতিক্রম করে আশার আলোকে আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। সামাজিক যোগ্যতা অর্জন করে সে দায়িত্বশীল হতে থাকে। তার মধ্যে দেখা যায় বিচারবোধ, চিন্তাশক্তি, আত্মবিশ্বাস, দায়িত্ববোধ প্রভৃতি অসংখ্য গুণাবলী। নতুন নতুন জ্ঞানের ক্ষেত্রে সে নিজেকে সম্প্রসারিত করতে পারে।

আরো দেখা যায়, সহ-পাঠক্রম অনুসরণের ফলে বিদ্যালয়ের আবহাওয়ার মধ্যে একটা সামাজিক সম্পর্কের সুস্থ পরিবেশ তৈরি হয়। শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, সমাজের লোক সকলে মিলে এমন এক নিবিড় একাত্ম পরিবেশ তৈরি করে যা সামাজিক ব্যক্তিত্ব গঠনের পক্ষে একান্তই কাম্য। একঘেঁয়ে শিক্ষাদান ও জ্ঞানার্জন কখনো সুস্থ শিক্ষানীতি নয়। পাঠ্য সূচী অনুসরণের সঙ্গে তাল রেখে যদি সহ-পাঠ্যসূচী অনুসরণ করা হয়, তাহলে 'কাজের পরিবর্তনের' ফলে শিক্ষার্থীর শিক্ষা ক্ষমতা বেড়ে যায়।

তাছাড়া, সহ-পাঠক্রম কর্মসূচীর নানা অনুষ্ঠান, বিতর্ক, মেলামেশা, খেলাধূলা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর এক বিশেষ 'জীবনদর্শন' গড়ে ওঠে এবং শিক্ষার্থীর মনে স্থায়ীভাবে সেগুলি এমন প্রভাব আনে যা তার পরবর্তী জীবনে সামাজিক নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য প্রস্তুত কবে তোলে। দেশ ভ্রমণ, বন ভোজন প্রভৃতি কর্মের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীবা বিত্থালয়ের গণ্ডীর বাইরে প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রান্তরে অবাধ মেলামেশার সুযোগ পায়।

প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রাঙ্গনতলে এসে তাদের মনের প্রসারতা বাড়ে, হৃদয় বৃত্তির স্ফুরণ হয়, চিন্তাশক্তির স্বাচ্ছন্দ্য আসে। জ্ঞানের বৈচিত্র্যমূলক আনন্দ আহরণ করে জীবনের ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক মূল নীতি অনুসরণের একটা প্রেরণা জাগে।

জন ডিউই বলেছিলেন, প্রকৃত জ্ঞান সক্রিয় কর্মের মধ্য দিয়েই অর্জিত হয়। জ্ঞানের সঙ্গে কর্মের সম্মিলন ঘটিয়ে দেয় সহ-পাঠক্রম। তাই, সহ-পাঠক্রম তথা পাঠ্যসূচী সমন্বিত কর্মবৃত্তি শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ হওয়া উচিত বলে জন ডিউই মনে করেছিলেন। সর্বাঙ্গীন শিক্ষার সুষ্ঠু পরিকল্পনায় তাই এব গুরুত্ব অপরিসীম এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

আধুনিক শিক্ষা-পরিকল্পনায় নানারকমেব সহ-পাঠ্যসূচী অনুসরণ করা হচ্ছে। এগুলির বিস্তৃত তালিকা তৈরি সহজ ব্যাপার নয়। কিছু কিছু কর্মবৃত্তির অবশ্য উল্লেখ করা যেতে পারে।

খেলাধূলা বহির্বৃত্ত ও অন্তর্বৃত্ত দুই ধরনের হতে পারে। বিত্থালয়ে নানারকমের খেলাধূলার আয়োজন করা হয়। বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আন্তরিক প্রীতি ও সহযোগিতার ভাব গড়ে তোলা যেতে পারে সুস্থ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমাজবোধ, সমাজপ্রীতি প্রভৃতি গুণাবলী এইভাবে অর্জিত হতে পারে। মানুষের জীবনে খেলাধূলার অপরিসীম মূল্য স্বীকার করে এক সময় বলা হয়েছিল, 'ইটনের খেলার মাঠেই ওয়াটারলু যুদ্ধের জয় ঘোষিত হয়েছিল। একথা নিশ্চিত সত্য যে, খেলাধূলার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের সুযোগ আসে, আত্মানুভূতি জাগে, বন্ধুত্ব-প্রীতি, সমাজ প্রীতি প্রভৃতি গড়ে ওঠে, স্বাস্থ্য, হাতের চর্চা, মস্তিষ্কের চর্চা, হৃদয়ের চর্চা হয় খেলাধূলার মধ্য দিয়ে।

বিত্থালয়ে নানারকম খেলাধূলার আয়োজন করা যেতে পারে যেমন—ফুটবল, হকি, ব্যাডমিণ্টন, ক্রিকেট, হাডুডু, সাঁতার, ডিগ-ডিগ, দৌড়ঝাঁপ, উল্লম্ফন,

লাঠিখেলা, কাঠিনাচ, তীরধনুকের খেলা, ক্যারাম, টেবিল টেনিস ইত্যাদি। খেলার ভেতরে এমন সুযোগ আছে যেখানে বুদ্ধিবৃত্তির কসরত দেখাতে হয়। খেলাধুলা ছাড়া, বাগান করা, বয়েজ স্কাউটস, গার্লস্ গাইড, ব্রতচারী আন্দোলন, রেডক্রস গঠন, এন. সি. সি. প্রভৃতি সংগঠনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জীবনের অনেক মৌলিক চাহিদা পূরণ করা যায়। এছাড়া, সভাসমিতি, বিতর্কসভা, প্রাচীরপত্র, হবি-ক্লাব, ভ্রমণ, বনভোজন, প্রদর্শনী প্রভৃতির মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মনে গভীর আনন্দ দেওয়া যায়। পারস্পরিক মেলামেশা, আলাপ আলোচনা, বৃত্তিমূলক শিক্ষার ভবিষ্যৎ নিয়ে বিতর্কসভা ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা অনেক মৌলিক সূত্র আবিষ্কার করতে পারে। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান ক্লাব, বিজ্ঞান মেলা, কৃষিপ্রদর্শনী, শিল্পপ্রদর্শনী, শ্রেণীকার্যের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত শিক্ষাপ্রদ নানারকমের প্রাচীর পত্র ও কাজ, ছাত্রসম্মেলন, অভিভাবক সম্মেলন প্রভৃতির মাধ্যমে বিদ্যালয়ের আবহাওয়ায় একটা সামাজিক ক্রিয়াকর্মের পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়। ঋতু উৎসব, আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, নাটক অভিনয়, ক্যাম্পগঠন, মহাপুরুষ স্মৃতিসভা, শহীদ স্মৃতিতে উৎসব, পার্ক গঠনের মাধ্যমে আনন্দ উপভোগ, সাঁতার কাটার জন্য পুষ্করিণী খনন, পরিবেশের জঞ্জাল আবর্জনা সাফ, ট্রাফিক কাজে সাহায্য করা, রাস্তাঘাট বাঁধা, কলেরা বসন্ত প্রভৃতি রোগের প্রতিষেধক কর্মে অংশ নেওয়া, ইত্যাদি হরেক রকম সামাজিক কাজে শিক্ষার্থীরা অংশ নিতে পারে এবং সেইসব কাজে অর্জিত অভিজ্ঞতার সঙ্গে পাঠ্যসূচীর অধীত বিদ্যার যোগসূত্র স্থাপন করতে পারে। অনেক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে বুক ব্যাঙ্ক, দরিদ্র ছাত্রকল্যাণ ভাণ্ডার, সস্তায় বিতরণী কেন্দ্র, প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, প্রভৃতি কাজ করে থাকে। এইভাবে কর্মের মধ্য দিয়ে তারা নানারকম বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করে।

শিক্ষাপ্রণালীতে 'কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার' যে নীতি আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানে স্বীকৃত তা সহ-পাঠ্যসূচী কর্মবৃত্তি অনেকখানি মেটাতে পারে। তাছাড়া, রুশোর বিখ্যাত উক্তি—শিক্ষা হবে স্বাভাবিক প্রকৃতি অনুসারে—এই উক্তির সার্থকতা প্রতিপন্ন করা যায় এইসব কর্মবৃত্তির মাধ্যমে। সহ-পাঠ্যসূচীর মধ্যে আরো অনেক অনেক কর্মসূচী অনুসরণ করা যেতে পারে যেমন, ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক সোসাইটি গঠন, মিউজিয়াম গঠন, ছবি, ফটো, শিক্ষাগত প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা, যান্ত্রিক যুগের নানা উপকরণ যেমন দূরদর্শন,

বেতার, কমপিউটার, এপি-ডায়ো-স্কোপ, ল্যান্টার্ণ, চার্ট, মডেল, ডায়াগ্রাম, গ্লো রেফারেন্স প্রভৃতির নানা কায়দায় ব্যবহার করা। শিক্ষাদানকে নিছক গতানুগতিকতা মুক্ত করতে গেলে এইসব কর্মবৃত্তির বেশ ভালো রকমের সার্থকতা আছে। সাহিত্য-সভা, বিজ্ঞান মেলা, নকল পার্লামেন্টের অনুষ্ঠান, নকল ইউনেস্কো গঠন প্রভৃতি কাজের দ্বারা শিক্ষার্থীরা অনেক বেশি বাস্তব জ্ঞান অর্জন করতে পারে। রেডিও, জার্ণাল প্রভৃতির ব্যবহার, সংবাদ বিচিত্রার আসর, প্রাচীর পত্রে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পরিবেশন করা, বিদ্যালয় ম্যাগাজিন পরিচালনা করা, নিয়ন্ত্রিতভাবে পাঠাগার অভ্যাস গড়ে তোলা, যৌথ বিচার সভা, ছাত্র মজলিস প্রভৃতি গঠন করা ইত্যাদি কর্মসূচীর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলাবোধ ও নাগরিকত্ববোধ জাগানো যায়।

এইভাবে নানারকমের কর্মানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিদ্যালয়কে পুরোমাত্রায় 'কর্মমুখর কর্মকেন্দ্রিক' সামাজিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা যায়। প্রত্যেক বিদ্যালয় নিজেদের বুদ্ধিবিচার বিবেচনা করে নিজেদের সঙ্গতি ও নেতৃত্বকে সংগঠিত করে এইসব কাজ এমনভাবে গড়ে তুলতে পারেন যার দ্বারা সেই বিখ্যাত উক্তিরই সার্থকতা প্রতিপন্ন হতে পারে, যেমন বলা হয়ে থাকে, এক পাউণ্ড বুদ্ধিগত শিক্ষাদানের চেয়ে এক আউন্স নৈতিক অভিজ্ঞতার শিক্ষা অনেক বেশি বাস্তবসম্মত ও ফলপ্রদ।

শিক্ষার্থীর সামাজিক ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য শিক্ষার পরিবেশে চাই স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দময় কর্মধারার সুষ্ঠু বিন্যাস। পার্সিনান বলেছিলেন, শিক্ষার প্রচেষ্টা অবশ্যই প্রত্যেকের জন্য এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে যার ফলে প্রত্যেক ব্যক্তিরই ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠতে পারে। এই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব আধুনিক অর্থে বোঝায় সামাজিক ব্যক্তিত্ব।

মনরো ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক দেখিয়ে মন্তব্য করেছিলেন, আধুনিক শিক্ষার তাৎপর্যের সামগ্রিক দিক হোলো দেখা কিভাবে ব্যক্তিকে সমাজের সঙ্গে সংযোগ সাধন করা যায়।

ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রিপোর্টে বলা হয়েছিল, গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে সহযোগিতার সম্মিলিত নীতির ভেতর, সুনিয়ন্ত্রিত নাগরিকত্ব-বোধ বিকাশের উপর, প্রত্যেক নাগরিকের সামাজিক কাজে অংশ নেবার ক্ষমতার বিকাশ সাধনের উপর। শিক্ষার ক্ষেত্রে তাই সমাজ সচেতনভাবে এমন ভূমিকা

নিতে হবে যার ফলে শিক্ষার পরিবেশ হয়ে উঠে সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডের সংহত অথচ স্বতঃস্ফূর্ত একটি ক্ষেত্র। বিদ্যালয় নিছক জীবনের প্রস্তুতিভূমি হবে না, হবে একেবারে নিজেই জীবনের মূর্ত প্রকাশ।

জন ডিউইর ভাষায় সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ হবে বিদ্যালয়। বিস্তৃত অর্থে তা হবে সামাজিক অভিজ্ঞতার প্রবহমান ধারার একটা উপায় বিশেষ। প্রত্যেক ব্যক্তির মন সামাজিক কর্মকাণ্ডের ধারায় এমনভাবে গড়ে উঠবে নানারকম কর্মবৃত্তির নিরবচ্ছিন্ন উদ্দীপনায় যে, এখানে শিক্ষার্থী অর্জন করবে তার জীবনের প্রাথমিক মহত্তম সম্পদ।

॥ ৩ ॥

## শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর যুগ্ম সহযোগিতা

আধুনিক যুগের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাগত দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন দেখা দিয়েছে।

এক সময় ছিল যখন শিশুর মনস্তাত্ত্বিক চাহিদার দিকে বিন্দুমাত্র নজর না দিয়ে কবরের শাস্তির মতো কঠোর বজ্রআঁটুনি ছিল শিক্ষাক্ষেত্রে। রুশোই প্রথম শিক্ষাক্ষেত্রে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রবর্তন করেন অষ্টাদশ শতাব্দীতে। তাঁর মতে, স্বাধীন মানুষ জন্মেছে তার আদিম প্রকৃতি নিয়ে, মুক্তির মন্ত্রগানই তার বেদমন্ত্র। প্রকৃতির শ্যামলিমায় যে সৌন্দর্য সুষমা নিহিত আছে, তাকেই বরণ করে নেওয়াতেই শিশুর গৌরব। 'অহং' ভাব থেকে নিষ্কৃতি লাভ না করে তার উপায় নেই। রুশোর এই বৈপ্লবিক চিন্তাধারার উপর ভিত্তি করে শিক্ষাক্ষেত্রে এসেছে এক অভাবনীয় বিপ্লব—তার নাম শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষা।

আধুনিক মনস্তাত্ত্বিকগণ মনস্তত্ত্বকে আত্মবিশ্লেষণের বিষয় করে তুলেছেন। শিশুর আচারগত পরিচয় তার মানসিক সুস্থতা বা অসুস্থতার পরিচয় নির্দেশ করে থাকে। শিশুর বয়স, তার কর্মক্ষমতা ও উন্নতির উপর শিশুর ব্যবহার নির্ভরশীল।

মনোবিজ্ঞানীরা তাই আধুনিক শিশু-শতাব্দীতে শিশুর চাহিদা ও আশা-আকাঙ্খার উপর জোর দিয়েছেন বেশি করে। শিশুকে তাঁরা চেয়েছেন ব্যক্তিত্ব-মণ্ডিত ও সমাজমণ্ডিত করতে। তার ফলে শিক্ষার্থীর শিক্ষা মানবধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আত্মপ্রকাশের সুযোগ লাভ করেছে।

আধুনিক শিক্ষার সর্বপ্রকার পরীক্ষামূলক গবেষণা আজ পশ্চিম দেশে হচ্ছে অনেক বেশি, আমাদের দেশেও পরীক্ষা-নিরীক্ষার কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। কেউ কেউ শ্রেণী শিক্ষার সম্পূর্ণ বিলোপ সাধনের কথা বললেও শ্রেণী শিক্ষা বর্জন করা যায়নি। শিক্ষকের ভূমিকা হবে শ্রেণীগত শিক্ষার সঙ্গে কিভাবে ব্যক্তিগত নজরদারীর শিক্ষা মেলানো যায়। তাঁকে তাই হতে হবে উপদেষ্টার মতো, বাগানের পরিচর্যাকারী মালীর মতো, রোগ চিকিৎসার বৈদ্যের মতো। শিশুর ব্যক্তিত্ব সংগঠনে শিক্ষকের ভূমিকা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

অ্যাডামস্ বলেছিলেন শিক্ষার অপরিহার্য উপাদান তিনটি—শিশু, শিক্ষক ও বিষয়। প্রচলিত শিক্ষা ছিল বিষয়কেন্দ্রিক কিন্তু আধুনিক শিক্ষা শিশু-কেন্দ্রিব, শিশুই মধ্যবিন্দু, তাকে ঘিরেই শিক্ষক ও বিষয়াবলীব অবস্থান। নতুন শিক্ষা-ধারায় কিভাবে নিছক পুঁথিগত বক্তৃতাধর্মী শিক্ষাধারার পরিবর্তে শ্রেণী শিক্ষা ও বিদ্যালয় সমন্বিত সামাজিক কর্মসূচীর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আশা আকাঙ্খা ও চাহিদা পূরণ করা যায়, সেইটেই প্রধান বিবেচ্য। শিক্ষার্থীর 'আধ্যাত্মিক রুগ্নতারচিহ্ন' দেখে আধুনিক শিক্ষক এগিয়ে আসবেন মনস্তাত্বিক কৌশলে তার সমাধানের জন্য। শিশুকে সমাজমণ্ডিত করার জন্য তার ব্যক্তিত্বকে উন্মোচিত করে তুলতে হবে। পাঠ্যসূচী বা সামাজিক কর্মবৃত্তির মধ্যে কোথাও যেন ফাঁক না থাকে তা দেখার দায়িত্ব শিক্ষকের।

কি কি কারণে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, সেই কারণগুলি অনুসন্ধান করে শিক্ষার্থীদের বেখাপ্পা, বেপরোয়া, হতাশাগ্রস্ত মনোভাব প্রভৃতি অসুস্থ লক্ষণের সুচিকিৎসার জন্য এগিয়ে আসতে হবে শিক্ষককে। বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী, কার্যাবলী, শৃঙ্খলা রক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষার্থীদেব প্রয়োজনানুগ বুদ্ধির অনুশীলনে সাহায্য করতে হবে।

মহামতি কার্লাইল বলেছিলেন, মৌলিক প্রতিভা একটা অদ্ভুত কিছু ব্যাপার নয়, আসলে তা পূর্ণমাত্রায় সততারই প্রকাশ। এই সততা অর্জন করা যায় নিজস্ব প্রকৃতির বৃহত্তর গতি সম্বন্ধে সচেতনবোধ থেকে। সজ্ঞানতা ও গতি, এই দুটো জিনিস প্রয়োজন। বিদ্যালয় এই সততা উপার্জনেরই ক্ষেত্র। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সদর্থক, নঞর্থক নয়। স্বাধীন কর্মবৃত্তি তথা স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলাবোধ জাগিয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীদের হাতে এমন একটা প্রশিক্ষণের যাদুদণ্ড তুলে দিতে হবে যা দিয়ে তারা পরিপক্ক হাতের কলাকৌশল জেনে ফেলে।

বিদ্যালয়ের মধ্যে পরিবেশগত এমন একটা শৃঙ্খলাবোধ থাকবে যা খবরদারীর ব্যাপার নয়, বাইরের থেকে চাপানো ব্যাপার নয়, আসলে তা শিক্ষার্থীর আচরণগত গভীরতম আত্মাকেই স্পর্শ করে। পার্সিনান এইভাবেই বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলার কথা বলেছেন, যার নাম মুক্ত শৃঙ্খলা।

বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেছিলেন, প্রকৃত শৃঙ্খলা বাইরের বাধ্যবাধতাকে বোঝায় না, আসলে তা এমন এক মনের অভ্যাস অর্জন করা যা দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সদর্থক পরিণতির দিকে নিয়ে যায়, নঞর্থক প্রভাবকে প্রশ্রয় দিয়ে নয়।

জন ডিউই দেখিয়েছেন, শিশুর বিকাশ যদি সামাজিক ক্ষমতা ও সেবার পথ ধরে চলে, যদি সে জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে, তাহলে শৃঙ্খলা জিনিসটা বা সংস্কৃতিচর্চা বা তথ্যানুসন্ধান প্রভৃতি ব্যাপার তার কাছে স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। শিক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীকে সমাজসম্মত অভীপ্সিত পথে পরিচালনা করা। এই অর্থে সংরক্ষণশীলতা ও স্বাধীনতা পরস্পরবিরোধী নয়, বরং পরস্পরের পরিপূরক।

শিক্ষার মধ্যে শিশুর পরেই শিক্ষকের স্থান। পার্সিভাল রেন তাঁকে বন্ধু, দার্শনিক ও পথপ্রদর্শক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। একমাত্র শিক্ষকই শিক্ষার্থীর জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করতে পারেন।

রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষা' গ্রন্থে বলেছেন, জ্ঞানের আদান প্রদানের ব্যাপারটি সাত্ত্বিক। তাহা প্রাণকে উদ্বোধিত করে। সেইজন্য এইখানেই প্রাণের নাগাল পাওয়া সহজ। এইখানেই গুরুর সঙ্গে শিষ্যের সম্বন্ধ যদি সত্য হয়, তবে ইহজীবনে, তার বিচ্ছেদ নাই। তাহা পিতার সঙ্গে পুত্রের সম্বন্ধের চেয়েও গভীরতর। শিক্ষার আসল কাজ জীবনকে এক আধ্যাত্মিক পুনর্জন্ম দেওয়া, শিক্ষার্থীর আত্মাকে সত্য ও মহত্ত্ব লাভের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া। এই কাজ করতে গেলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্বন্ধ শুধুমাত্র কিছু বিষয় পাঠদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। সমস্ত শিক্ষার কাজটাই হওয়া চাই জীবনধর্মী। শিক্ষক জানবেন শিক্ষার্থীর মনের এবং হৃদয়ের গূঢ় অভ্যন্তরের অভিজ্ঞতার মর্ম আর সেই সঙ্গে তাদের অভিজ্ঞতার একটা বাইরের সংযোজন ঘটিয়ে দেবেন এবং এইভাবে শিক্ষার্থীর অন্তর ও বাহির গ্রথিত হয়ে যাবে একটি সুশৃঙ্খল সূত্রে।

এম. এল. জ্যাকস্ এই ধরনের কথাই বলেছেন। শিক্ষার অপরিহার্য উপাদান হিসেবে তাই প্রয়োজন শিক্ষক-শিক্ষার্থীর প্রাণে প্রাণে মিল। এঁরা

উভয়ে মিলে অন্তর ও বাইরের জ্ঞানগত অভিজ্ঞতাকে মিলিয়ে দেবেন এক জীবনধর্মী সৃষ্টিশীল পরিকল্পনায়।

গুরু-শিষ্যের যুগ্ম সহযোগিতাকে ঘিরেই পাঠ্যসূচী ও সমাজসমন্বিত কর্মধারা এগিয়ে যাবে নিরবচ্ছিন্ন গতিতে, সংরক্ষণ ও গতিশীলতার গ্রহণ-বর্জন গ্রহণের মধ্য দিয়েই গড়ে উঠবে সমাজমণ্ডিত ব্যক্তিত্ববোধ ও সামাজিকতা।

## দশম পরিচ্ছেদ

# ভারতের শিক্ষা-সমস্যা ও গতি-প্রকৃতি

# ভারতের শিক্ষা সমস্যা

## ॥ ১ ॥

## ভারতের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

শিক্ষার ব্যাপক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিকে তাকিয়ে যেকোনো দেশের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষা সুবিন্যস্ত হওয়া প্রয়োজন ভারতবর্ষে আধুনিক শিক্ষার ধারায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষার বিন্যাস আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে ইংরেজ-প্রবর্তিত কাঠামোর মাধ্যমে পেয়েছি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর নানারকম কমিশন ও কমিটি বসিয়ে এই ধারাকে একটি জাতীয় রঙে রঞ্জিত করার প্রয়াস নিয়েছি। দুর্ভাগ্যের বিষয়, ভারতের সকল রাজ্যে একই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়নি। আমাদের জাতীয় শিক্ষার মারাত্মক ত্রুটি এইখানেই।

জাতীয় সংহতির দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি পরিচ্ছন্ন জাতীয় নীতি গ্রহণ করা হয়নি। **জাতীয় করণের কেন্দ্রীকরণ নীতিই** শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের কাঠামো নির্দেশক হলে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা জাতীয় সংহতিকে সুদৃঢ় করতে পারতো। অনেকে বলেন, বিভিন্ন রাজ্যের ভৌগোলিক ও অন্যান্য স্থানীয় সমস্যার জন্যে প্রদেশে প্রদেশে শিক্ষার বৈচিত্র্য থাকা সমীচীন। কিন্তু সেকথা আমরা স্বীকার করি না। স্থানীয় বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য স্বীকার করলেও সারা দেশের জন্য একটি সার্বিক জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী কাঠামো প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা আমাদের দেশের পক্ষে খুবই যুক্তিসঙ্গত ছিল। দেরি করে হলেও, এ বিষয়ে কিছু কিছু চিন্তাভাবনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়েছে। শিক্ষা-দার্শনিকগণ এবং শিক্ষার নিয়ামকগণ জাতীয় কেন্দ্রীকরণ নীতির সম্ভাব্যতা সম্পর্কে ক্রমশ সচেতন হয়ে উঠেছেন। জাতীয় পর্যায়ে নীতি নির্ধারণের ব্যবস্থাপনা করে রাজ্যের হাতে সম্পূর্ণভাবে শিক্ষানীতি রূপায়ণের ভার ছেড়ে দিলে ভালো হয়

ভারতের শিক্ষা কাঠামো বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত। সাধারণতঃ, এই জিনিসটিকে আমরা তিনটি পর্যায়ে ভাগ করে নিয়েছি—(১) প্রাথমিক (২) মাধ্যমিক ও (৩) উচ্চতর শিক্ষা। বিভিন্ন রাজ্যে অবশ্য এই তিনস্তরের বিভিন্ন পর্বে

নানারকমের স্তরবিভেদ আছে। এইসব পর্বের শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা নিয়ে একটি সর্বভারতীয় সর্বস্তরের শিক্ষার মূল্যায়ন করা বিশেষ প্রয়োজন আছে। শিক্ষার জাতীয় নীতি পুণর্গঠনে তা বিশেষভাবে সহায়ক হতে পারে বলে আমাদের ধারণা।

## ॥ ২ ॥

## প্রাক্-প্রাথমিক পর্যায় : নার্সারী ও শিশুশিক্ষার সমস্যা

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রারম্ভিক পর্যায়ের শিক্ষার নাম প্রাথমিক শিক্ষা। একে গোড়ার শিক্ষা বা বুনিয়াদ গঠনের শিক্ষা হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে শহর ও শিল্প এলাকায় প্রাথমিক পর্যায়ের পূর্বে প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে নার্সারী ও কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয় চালু আছে। প্রধানতঃ ফ্রোয়েবেল, মন্তেসরী প্রবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গিতে এই জাতীয় বিদ্যালয় পরিকল্পিত হয়েছে। তবে, কোনো পরিকল্পনা মাফিক বিদ্যালয় গড়ে ওঠেনি। সখের বাগানের মতো এক শ্রেণীর বিলাসবহুল মানুষের প্রয়োজন মাফিক এখানে-সেখানে কিছু কিছু শিশু-বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। এদের সংখ্যা বেশি নয়, তবে বাড়তির দিকেই চলেছে দেখা যায়।

শিল্প ও শহর অঞ্চলের নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে জীবিকার তাড়নায় ব্যতিবস্ত থাকায় শিশুদের পরিচর্যা করার জন্য গৃহগত পরিবেশের বাইরে একটি কৃত্রিম পরিচর্যার স্থান খুঁজে পাওয়ার তাগিদে এই জাতীয় বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। অভিভাবকরা তিন থেকে পাঁচ বছরের শিশুদের বিদ্যালয়ে অর্পণ করে নিজেরা কিছুটা নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছেন। কোনো কোনো জায়গায় নার্সারী স্কুলকে আবাসিক স্কুল হিসেবেও গড়ে তোলা হয়েছে। কোথাও তিন থেকে পাঁচ বছর, আবার কোথাও তিন থেকে সাত বছর বয়সের শিশুদের জন্য নার্সারী বিদ্যালয় আছে। আর্থিক সঙ্গতিপূর্ণ পরিবার বেশি অর্থ ব্যয় করে শিশুদের সেখানে পাঠিয়ে দেন এবং শিশুদের নিরাপত্তার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ হতে চান।

আমাদের একটু ভেবে দেখা দরকার আছে, ভারতের মতো বিশাল ও বিরাট দেশে একদল সুবিধাভোগী তাদের সন্তানদের মানুষ করার জন্য দরাজহস্তে

অকাতরে অজস্র ব্যয় করবেন আর দীন দরিদ্র কৃষক ও শ্রমিক কূলের সন্তানেরা প্রাথমিক পর্যায়ের সাধারণ শিক্ষাটুকুও সকলে নিতে পারবে না, এই ধরনের বিসদৃশ শিক্ষার আবহাওয়া দেশে বিরাজ করলে শিক্ষার মহান আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে বড়ো বড়ো লম্বা চওড়া বাত নেহাৎ উপহাসের মতোই শোনায় কিনা।

এই শ্রেণী-বিভেদের দেশে শ্রেণী-বৈষম্য লোপ করার জন্য সার্বজনীন ঐক্যমুখী প্রাথমিক শিক্ষার ঢালাও ব্যবস্থা অত্যন্ত জরুরি। প্রাক্-প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা এদেশে বিলাসিতা বলে মনে হয়।

তবুও, মনস্তাত্ত্বিক বিচারে শিশুদের পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষারও একটি বিজ্ঞান সম্মত ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা যায়। মনে রাখতে হবে, এই স্তরের শিশুদের পক্ষে পিতামাতার তত্ত্বাবধানে গৃহশিক্ষারই তাৎপর্য সব চেয়ে বেশি। তবুও সেখানে জীবনের ক্ষেত্রে নানা জটিল টানা পোড়েন, সেক্ষেত্রে পাঁচবছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষারও একটি ভিত্তিভূমি সর্বস্তরের মানুষের জন্য গড়ে তোলা যায়। অবশ্য একেবারে পৃথক ধরনের প্রাক্-প্রাথমিক বিদ্যালয় সর্বপর্যায়ে গড়ে তোলা খুবই কঠিন ও ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। অথচ এক শ্রেণীর লোক বিশেষ সুবিধা পাবে, বিশেষ সুবিধার নামে তাকে অব্যাহত রাখা হবে তা গণতন্ত্রের পক্ষে আদৌ নিরাপদ নয়।

আমাদের বিবেচনায় প্রত্যেকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়েই একটি উইং তৈরি করে শিশুদের জন্য হলি-ডে জাতীয় হোম বানিয়ে দিলে, খেলার সাজসরঞ্জাম, ফুলের বাগান, পার্ক প্রভৃতি গড়ে দিলে, পাঁচ বছরের বয়স পর্যন্ত শিশুরা একজন 'বিদ্যালয় জননীর' তত্ত্বাবধানে কিছু সময় কাটিয়ে আনন্দোচ্ছল সামাজিক মন গড়ে তুলতে পারে। এইভাবে তারা এই আনন্দময় পরিবেশে দৌড়ঝাঁপ খেলাধূলা করে হাঁক ছাড়তে পারে। কিছু কিছু অভিজ্ঞতাও আহরণ করতে পারে। অভিভাবকরা একটা নির্দিষ্ট সময় শিশুদের এইখানে পৌঁছে দেবেন, খাবার দেবেন আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। অভিভাবকরাও কিছুটা সময় এখানে কাটিয়ে যেতে পারেন, তার ফলে পরিবেশ আরো বেশি রকমের আকর্ষণীয় ও শিক্ষাপ্রদ হতে পারে। এইভাবে প্রাক্-প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাকে আমরা উদ্দেশ্যমুখীন করে তুলতে পারি।

পাশ্চাত্ত্যের অন্ধ অনুকরণে নার্সারী বিদ্যালয় গড়ে তুললে কমবয়সের শিক্ষার্থীরা মা-বাবার স্নেহচ্ছায়া স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হয়। অবশ্য যে সব নার্সারী

বিদ্যালয় আমাদের দেশে আছে, সেগুলিতে আনন্দ দানের নানা ব্যবস্থাপন রয়েছে। তাতে বিশ্রামমুখীন শিক্ষা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাবোধের শিক্ষ প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হওয়ার শিক্ষা, নানা গতিশীল সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে খেলাধূলা প্রভৃতি নানা কর্মসূচীর চিত্তাকর্ষক ব্যবস্থা আছে। এইসব নার্সারী বিদ্যালয়ে সাধারণত শিক্ষিকাগণ কর্মরত। ফলে, মাতৃত্বের মৃদুস্পর্শ থেকে শিশুরা কিছু কোমল স্নেহ পেয়ে থাকে। কিন্তু, এখানকার ব্যবস্থাপনা খুবই ব্যয়বহুল। একটি বিশেষ সামাজিক শ্রেণীরই পক্ষে তা অনুকূল। এদের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনাতেও দেখা যায় সমাজের এক বিশেষ শ্রেণীরই প্রভাব-প্রতিপত্তি। আমাদের সমস্যা হোলো, কিভাবে মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজনে এই শিক্ষার ভাবাদর্শ ও আদর্শকে কোটি কোটি মানুষের উপযোগী করে তোলা যায়।

এইজন্য প্রয়োজন একটি সামগ্রিক জাতীয় কর্মসূচী। আমাদের দেশের অর্থনৈতিক ও অনগ্রসর আবহাওযায় এই শিক্ষাকে সার্বজনীন করে তুলতে গেলে প্রাথমিক বিদ্যালয়কেই কেন্দ্র করে তা গঠন করা যেতে পারে। গ্রামে বাঁশ, কাঠ, খড, গাছপালা ইত্যাদি উপাদানের কোনো কিছুরই অভাব নেই। অভাব আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির। সেই সঙ্গে রুচিশীল সংস্কৃতিমুখী তথা ঐতিহ্যবাহী মানসিক প্রবণতার। খুব অল্প খরচে নিটোল ও পরিচ্ছন্ন গ্রাম্য পার্ক ও হলি-ডে হোম গঠন করা যায। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকরীর একটি অত্যাবশ্যক জাতীয় কোড তৈরি করে স্বল্প প্রশিক্ষণ দিযে বাধ্যতামূলকভাবে তাঁদেরও এই কর্মসূচীতে কাজে লাগানো যায়। আসলে দরকার রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ প্রেরণা, উৎসাহ ও সচেতনবোধ।

প্রাথমিক শিক্ষাব পূর্বস্তরে কি ধরনেব শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়া উচিত সে সম্পর্কে শিক্ষাবিদ্ ও অভিভাবকগণ ক্রমশই আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, যা শুভলক্ষণ। অথচ এমন এক সময় ছিল যখন এই পর্যায়ের শিক্ষা সম্পর্কে কোনো চেতনাই ছিল না। দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই নীতি স্বীকৃত হয়েছে যে, শিশুরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসার পূর্বে তাদের শারীরিক নৈতিক ও মানসিক দিকটির এক সম্যক বিকাশ সাধন প্রয়োজন হবে। এক সময় নার্সারী বিদ্যালয় নিছক শ্রমিক অঞ্চলের পিতামাতার রোজগারের পথে সাহায্যকারী রক্ষণাবেক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে গণ্য হোতো। কিন্তু রুচির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সার্বজনীন সত্য হিসেবে স্বীকৃত হচ্ছে যে, শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পূর্বে

তার বুনিয়াদ শক্তভাবে গড়ে তোলার জন্য একটি উপযুক্ত শিক্ষায়তন বা ক্ষেত্র চাই। একদিন শ্রমিক অঞ্চলের পিতামাতার প্রয়োজনে যে বিদ্যালয় পরিকল্পনা দেখা দিয়েছিল, এখন তা সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য প্রয়োজন হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

আমাদের দেশের অনেক গ্রামাঞ্চলেও নার্সারী বিদ্যালয় ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। এইসব বিদ্যালয়ে সবচেয়ে বড় করে দেখা হয় পরিবেশকে। পরিবেশ এমনভাবে গড়ে তোলা হয় এই পরিকল্পনায়, যাতে করে শিশুরা তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপন ও খেলাধূলার মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে অভিজ্ঞতা আহরণ করতে পারে এবং পরবর্তী জীবনের পক্ষে কাজে লাগে এমন সব অভ্যাস রপ্ত করতে পারে। কোনো নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচী ও নির্দিষ্ট গ্রন্থ অধ্যয়নের প্রয়োজন হয় না। কতকগুলি সুনির্বাচিত স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গড়ে তোলাই এই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য। পেষ্টালজী বলেছিলেন, শিক্ষাব অর্থই হোলো মানুষের বুদ্ধিগত, শারীরিক ও নৈতিক সর্বপ্রকার শক্তিরই স্বাভাবিক, প্রগতিশীল এবং সুষ্ঠু বিকাশ ঘটানো এবং শিক্ষার্থীর উপযোগী করেই তা করা উচিত। নার্সারী বিদ্যালয়ে এই সার্বজনীন বিকাশের ভিত্তিভূমি সুদৃঢ় করে তুলতে সাহায্য করা হয় এইমাত্র। গোড়ায় গলদ রয়ে গেলে সারা জীবন আর সংশোধন করা কঠিন বলে এই পর্যায়ে কিছু সুনির্বাচিত অভ্যাস গড়ে তোলাই শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচিত হওয়াই সুস্থ নীতি।

শিশুর একটা নিজস্ব প্রকৃতি আছে। সে তার নিজস্ব প্রকৃতিকে অনুসরণ করেই শিক্ষা পেতে চায়। ফ্রোয়েবেলের 'কিণ্ডার-গার্টেন' পরিকল্পনায় শিশুর আপন প্রকৃতির নিয়মে বেড়ে ওঠার তাগিদে অনুকূল পরিবেশ ও যোগাযোগের উপর জোর দেওয়া হয়। খেলাধূলা ও আনন্দজনক কর্মবৃত্তির মধ্য দিয়েই শিশু যাতে গড়ে ওঠে সেইদিকে ছিল তাঁর দৃষ্টি। তিনি বলেছিলেন, খেলাধূলাকে একটা ফালতু জিনিস মনে করা উচিত নয়। বরং এর গভীরতম তাৎপর্য আছে, খেলাধূলার মধ্য দিয়ে শিশু নিজেকে সম্প্রসারিত করে, ঠিক যেমন কুঁড়ি থেকে বেরিয়ে আসে ফুল তেমনি। শিশুর কাছে আনন্দই তার সবরকম কাজকর্মের অন্তরাত্মা। ফ্রোয়েবেল এইভাবে শিশু প্রকৃতির প্রতি জানিয়েছেন অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা। শিশুর বিকাশ সাধনের যে নীতি তিনি স্বীকার করেছিলেন, সেই অনুযায়ী 'কিণ্ডার গার্টেন' প্রথা গড়ে উঠলেও আধুনিক শিক্ষা-বিজ্ঞানের অনেক

নতুন নতুন সূত্রের বাস্তব প্রয়োগ সম্বন্ধে সে যুগে অভিজ্ঞতা ছিল না। আধুনিক যুগে আরো নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে শিশু শিক্ষাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করার সংগঠিত প্রয়াস হয়েছে। এ বিষয়ে মাদাম মন্তেসরী ফ্রোয়েবেলের চেয়ে আরো এক ধাপ অগ্রসর হয়েছিলেন। মন্তেসরী ফ্রোয়েবেলের শিক্ষানীতিকে গ্রহণ করে আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাকে এক বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

এই প্রসঙ্গে ফ্রোয়েবেল ও মন্তেসরীর শিক্ষা-দর্শনের মৌলিক সাদৃশ্য ও পার্থক্য সম্বন্ধে কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ফ্রোয়েবেল ছিলেন আদর্শবাদী দার্শনিক। কাণ্ট, ফিকটে, শেলিং, হেগেল প্রমুখের দ্বারা প্রভাবান্বিত। এঁদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন জীবনের ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে কিভাবে বাস্তবকে মেলানো যায়। তিনি দেখেছিলেন, শৃঙ্খলার মধ্য দিয়েই প্রকাশিত হয় মানুষের আত্মা। প্রত্যেক ব্যক্তি এবং বস্তু এই আত্মার দ্বারা আবৃত। এর পশ্চাতে আছে ভগবানের অনির্দেশ্য হাতছানি। হেগেলের দ্বন্দ্বমূলক নীতিকে শিক্ষায় প্রয়োগ করে তিনি দেখিয়েছেন, মানুষ একাধারে প্রকৃতির সন্তান, মানুষের সন্তান এবং ভগবানের সন্তান। প্রকৃতি, সমাজ ও আধ্যাত্মিকতার বৈশিষ্ট্যকে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন। দুই বিপরীত ধর্মী বস্তুর মধ্যে আপাত বৈচিত্র্য অনুসন্ধান করে শেষ পর্যন্ত তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন ঐক্যকে। শিক্ষাক্ষেত্রে তিনি স্বাধীনতার নীতিকে স্বীকার করে নিয়ে প্রকৃতি, সমাজ ও আধ্যাত্মিক সম্পদকে এক ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করতে চেয়েছিলেন। ব্যক্তির আভ্যন্তরীণ শক্তির ওপর বাইরের পরিবেশের প্রভাবকে গুরুত্ব দিয়ে শিশুর বিকাশ সাধনের বিভিন্ন পর্যায়কে তিনি মূল্য দিয়েছিলেন। শিশু শিক্ষায় তিনি 'পুরস্কারদান' ও 'খেলাধূলা'কে গভীর মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্য দিয়ে দেখিয়েছিলেন, শিশুর অন্তর্নিহিত ক্ষমতার বিকাশ সাধনে, তাদের সাহায্য করার জন্য, ভালোবাসার জন্য, সমাজের কি কর্তব্য। তাই, জন ডিউই তাঁর এই শিক্ষানীতিকে আধুনিক শিক্ষানীতির এক মূল্যবান শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। মাদাম মন্তেসরী ফ্রোয়েবেলের প্রবর্তিত আদর্শ পরিবেশের উপর গুরুত্ব না দিয়ে দিতে চেয়েছেন বিশেষ ধরনের নির্বাচিত পরিবেশের গুরুত্বকে মর্যাদা। শিশুর শিক্ষা তাঁর মতে এমনভাবে হবে যে, সে অনেক সাধারণ অভ্যাস অপরের সাহায্য না নিয়ে করতে পারবে। শিশু শিক্ষায় তিনি

বুদ্ধিগত চর্চাকে প্রাধান্য না দিয়ে দিয়েছেন ইন্দ্রিয়ানুভূতির শিক্ষাকে প্রাধান্য। ইন্দ্রিয়ানুভূতির মধ্য দিয়েই চিরন্তন জগতের আলো মনের গহন প্রদেশে পৌছুতে পারে। তাই, তাঁর শিক্ষানীতিতে "স্পর্শ শিক্ষা"র একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। শিক্ষার উপযুক্ত সময় হোলো যখন সজ্ঞানভাবে শিশুর মনে শিক্ষার জন্য এক মনস্তাত্বিক মুহূর্ত দেখা দেবে। শিশুর নিজস্ব দায়িত্ব সম্পর্কে অনুভূতি এবং সেই অনুযায়ী কাজ করবার ক্ষমতা অর্জনই শিশুর কাছে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পাওনা। কল্পনাকেও তাই তিনি বাস্তবধর্মী করতে চেয়েছেন, এবং শিক্ষার বিশেষ পরিবেশে চেয়েছেন 'স্বতঃস্ফূর্ত শিক্ষার' পরিমণ্ডল। শিশু শিক্ষা মন্তেসরীর কাজে এক-ধরনের 'ব্যক্তিকেন্দ্রিক' শিক্ষা। শ্রেণী-শিক্ষার তিনি চেয়েছেন অবলুপ্তি। শিক্ষকের ভূমিকা তাঁর শিক্ষাব্যবস্থায় একজন নীরব দর্শকের মতো। তাঁর 'শিশু নিকেতনে' শিশুর শিক্ষা স্পর্শানুভূতির মাধ্যমে শারীরিক ও মনস্তাত্বিক ধরনের শিক্ষা, যা রাস্কের মতো শিক্ষাবিদের ভাষায় 'আধ্যাত্মিক বাস্তবতার' শিক্ষা।

ফ্রোয়েবেল চেয়েছিলেন শিশু শিক্ষার জন্য আদর্শ পরিবেশ গঠন। মন্তেসরী এই নীতির বাস্তব প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন কিভাবে বিশেষ ধরনের এক নির্বাচিত পরিবেশ গড়ে তোলা যায় শিশু-নিকেতনে। মন্তেসরীর পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দেশ-বিদেশে বহু নতুন নতুন চিন্তাধারা গড়ে উঠেছে। এর ফলে আজ সর্বজন গ্রাহ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, শিক্ষার ভিত্তিভূমি সংগঠিত না হলে শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন সঠিকভাবে গড়ে উঠতে পারে না।

শিশু শিক্ষার প্রথম পর্যায়ে অবহিত হওয়া দরকার যে, পরিবেশের মধ্যে কোথাও যেন এমন ফাঁক না থাকে যার ফলে শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক বিকাশ গতিরুদ্ধ হতে পারে। শিশু তার আপন স্বভাবের প্রেরণায় কতকগুলি বাচন-ধ্বনি শুরু করে। এই বাচন ধ্বনি যাতে সত্যিকারের ভাষা সমৃদ্ধ হয়ে উঠে, কোনো অবাঞ্ছিত সামাজিক প্রভাবে সে যাতে মূক না হয়ে যায়, মেলামেশার মধ্য দিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ ও উদ্দীপনায় যাতে তার মধ্যে শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সাধন হয় এবং তার ভাষাজ্ঞান ও অন্যান্য আচরণে যাতে সামাজিক বৈশিষ্ট ফুটে উঠে, সেজন্য যত্ন নেওয়া দরকার হয়। নার্সারী পর্যায়ের শিক্ষা খেলাধুলার মধ্য দিয়ে হওয়া চাই। খেলাধুলার উপকরণ শিশুর কাছে এমন সব হাজির করে দিতে হবে, যেগুলি উদ্দেশ্যমুখী। খেলাধুলা শিশুর একটি আদিম প্রবৃত্তি।

এই খেলাধূলার প্রবৃত্তিকে যথাযথ পথে পরিচালিত করার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা নিতে হবে। শিশুর মানসিক ক্ষমতা, বুদ্ধিবৃত্তি, শারীরিক ক্ষমতা, বিচার-বুদ্ধি, কল্পনা, দৃষ্টিশক্তি প্রভৃতি গুণাবলী যাতে সম্যকভাবে বিকশিত হয়, সেজন্য খেলাধূলার উপকরণগুলি মনস্তাত্ত্বিকভাবে সুনির্বাচিত উপায়ে ব্যবহাব করতে হবে। খেলাধূলাব মধ্য দিয়ে শিশুব মানসিক জড়তা কেটে যায়। কোনো অস্বাভাবিক সামাজিক অবস্থায় তার বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হলে খেলাধূলাই তাব শক্তিবৃদ্ধির স্ফুরণে সাহায্য করে তাকে এক নতুন অভিব্যক্তি দান করতে পারে। বাল্যাবস্থায় যদি শিশুর কোনো শক্তিব স্ফুরণে বাধা পড়ে, তাহলে সেই শক্তি আর কোনোদিনই প্রকাশ পায় না।

শিশুর ভাষাজ্ঞান শুরু হয় নার্সারী পর্যায়ে। তাই, কোনো বাধা বা জড়তা দেখা দিলে তা সংশোধনেব উপযুক্ত সময় এই শৈশবকাল। তার মানসিক জীবন ও ভাবগত জীবনের ক্ষেত্রে যা-কিছু অসংগতি বা ত্রুটিবিচ্যুতি তা এই স্তরেই সযত্নে সংশোধিত করে নিতে হবে। শিশুর ভাবপ্রবণতা শৈশবে দুর্বার গতিতে প্রকাশ পায়। মন তার কচিকাঁচা। শিশু চায় নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে তার কল্পনাপ্রবণ মনের চরিতার্থতা। কিন্তু যদি এই ভাবপ্রবণতার পথে অবিরত বাধা বিপত্তি আসে, সাহায্য ও সহযোগিতা না মেলে, তাহলে তার পরিণাম হয়ে ওঠে ভয়াবহ। তার প্রতি অবহেলার ফলে নানারকমের বিকৃতি দেখা দিতে বাধ্য। অসংলগ্ন ভাবপ্রবণতার ফলে সে ক্রমশ উচ্ছৃঙ্খল, স্বেচ্ছাচারী ও দুর্বিনীত হতে পারে।

মনে রাখতে হবে, শিশুর এই জীবনে আসে কল্পনার অসম্ভব জোয়ার। সেই কল্পনা চায় নানা সামাজিক অবস্থার ভেতর দিয়ে পূর্ণতা বা সার্থকতা। তাই, এই বয়সের শিক্ষার্থীদের জন্য চাই নানা রকমের খেলাধূলার গতিশীল উপকরণ ও সাজসরঞ্জাম, রঙবেরঙের ছবি, নানারকমের ছড়া ইত্যাদি। শিশুর সংবেদনশীল মনের জন্যে চাই উপযুক্ত খোরাক।

শিশুর প্রকৃত বিকাশ সাধনের জন্য চাই এমন এক ব্যবস্থাপনা যার ফলে সকল সামাজিক পর্যায়ের শিশুর পক্ষে দেহ-মন-আত্মার প্রকৃত সহজ, স্বাভাবিক ও সুন্দর বিকাশ সাধন সম্ভব হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের দেশে ধনীদের গৃহে যে আবহাওয়া আছে তার ফলে অস্বাভাবিক আদর যত্নে ও অভিজাত পরিবেশের দৌরাত্ম্যে শিশুদের মধ্যে নানাকিছু বিভ্রান্তিকর আচার আচরণ গড়ে

ওঠে। গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার পক্ষে এই জিনিস আদৌ সমীচীন নয়। অপর পক্ষে বস্তি অঞ্চলে বা গ্রামাঞ্চলে শিশুরা অস্বাস্থ্যকর ও অশোভন অবস্থায় লালিত পালিত হয়। যার ফলে তারা জীবনের উপযুক্ত আস্বাদ পায় না। পায় না কোনো প্রকৃত জীবন ধর্মী দিগ্‌দর্শন।

এইজন্য গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় কি ধনী কি গরীব সকল শিক্ষার্থীদের পক্ষে একটি সাধারণ ক্ষেত্র প্রয়োজন, যেখানে একটি নির্দিষ্ট জাতীয় মান অনুসারে শিক্ষার্থীদের দেহ-মন-আত্মার সুষম বিকাশ সাধন সম্ভব হয়।

শিশুর জীবনের প্রথম পাঁচ বৎসর একটি বিরাট মনস্তাত্ত্বিক সময়। এ সময় তার মানসিক দিক, চরিত্রগত দিক, আধ্যাত্মিক দিক এমন-ভাবে গড়ে উঠে যা আর অন্য কোনো পর্যায়ে হয় না। তাই, এই সময়টি তার জীবনের একটি সম্ভাবনাপূর্ণ বিরাট সংগঠন পর্যায়। এমন সুযোগ শিশুর জীবনে আর কখনো আসবে না বলেই এই সময়টির পূর্ণ সদ্ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন বিখ্যাত শিশু মনোবিজ্ঞানী মহামতি গেসেল। অনেকে একথাও বলেন, 'জাতির সমগ্র শক্তি প্রাইমারী শিক্ষার চাইতে নার্সারী শিক্ষার দিকে নিয়োজিত হলে ব্যষ্টি ও সমষ্টির কল্যাণ সাধিত হবে (কে. ডি. ঘোষ—আমাদের শিক্ষা—নার্সারী শিক্ষা দ্রষ্টব্য)। এই চিন্তাধারা সত্যই তারিফ করার মতো। কতখানি শিশুপ্রেম থাকলে এই নীতির কথা বলা যায় তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।

নার্সারী শিক্ষার কাল সাধারণতঃ তিন বছর থেকে পাঁচবছর ধরা হয়। কিন্তু অনেকের মতে এই কাল আরো বাড়িয়ে দিয়ে সাত বছর করা উচিত। নার্সারী পর্যায়ের শিক্ষা দীর্ঘস্থায়ী করে প্রাথমিক শিক্ষার আরম্ভ পর্যায় আরো বিলম্বিত করলে ফল ভালো হবে বলে কারো কারো ধারণা। ইংলণ্ডের নার্সারী স্কুল এসোসিয়েসনের মতে নার্সারী শিক্ষা সাত বছর বয়স পর্যন্ত হওয়া সমীচীন। কারণ, শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক পর্যায়ের বিকাশ এই স্তর পর্যন্ত উন্নীত হলে তবে তার শারীরিক ও মানসিক বিকাশের পর্বটি সুষ্ঠুভাবে গড়ে উঠে। নার্সারী পর্যায়ের শিক্ষা দুবছর বয়স থেকে শুরু হলে ভালো হয়। কেন না, এই সময় থেকে শিশুর কৌতুক প্রবণ মন অত্যন্ত সবুজ ও সতেজ হয়ে উঠে। বৈজ্ঞানিকের মতো পৃথিবীর সব কিছুকে সে বুঝে নিতে চায় জিজ্ঞাসু মন নিয়ে পরখ করে। এইভাবে সে অভিজ্ঞতা অর্জন করে ক্রমশ। শিশুর এই বিকাশ সাধন পর্বে

লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, সে একদিকে মায়ের স্নেহ ও ভালোবাস থেকে বঞ্চিত হতে চায় না, অন্যদিকে বাইরের দুরন্ত আকর্ষণে ে দুর্বার দুর্নিবার হতে চায়। একদিকে স্বাধীনতার অনিবার্য আকর্ষণ অন্যদিকে স্নেহপ্রবণতার অপূর্ব শৃঙ্খল বা নাগপাশ, এরই ভেতর দিয়ে শিশু চায় তার ভাবী জীবনের সার্থকতা। এই রকম পর্যায়ে নার্সার শিক্ষা আরম্ভ হলে শিশু একদিকে পেতে পারে সঙ্গীসাথীদের সান্নিধ্যে অফুর ক্রীড়ামোদ, অন্যদিকে পাবে শিক্ষয়িত্রীর গভীর মাতৃস্নেহ। নার্সারী বিদ্যালয়ে একজন শিক্ষয়িত্রীর উপরে অনেক শিশু একসঙ্গে মাতৃভাব আরোপ করলে প একটা গভীর মনস্তাত্ত্বিক সংকট সৃষ্টি হয়—শিশুদের মধ্যে মাতৃস্নেহ পাবার জন একটা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ঈর্ষাভাব ইত্যাদি জাগতে পারে। সেইজন শিক্ষয়িত্রীকে খুব সতর্কভাবে আড়াল থেকে পরিদর্শিকা ও পরিচালিকার মতো ভূমিকা নিয়ে শিশুদের মাতিয়ে দিতে হবে সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে নানা গতিশী খেলাধূলায়। শিশুরা নিজস্ব উদ্দীপনা ও উন্মাদনা নিয়ে শিশু উদ্যানে কচি কাঁচ ফুলের মতোন লুটোপুটি করা, রোলার নিয়ে গড়ানো, কাঠের বাক্স সাজি খেলা, পাল্কি বানানো, রান্নারান্না খেলা, কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওঠা নামা, রিং ধ টানাটানি, মাটি খুঁড়ে পুকুর বানানো, পুলিশ পুলিশ খেলা ইত্যাদি নানা কি আনন্দে মেতে উঠুক। শিশুদের এই পর্যায়ে এমন প্রশিক্ষণ দেওয়া যায় যা ফলে তারা কাগজের নৌকা, টুকরো কাগজের বল, মাটির পুতুল ইত্যাদি নান কিছু সৃষ্টি করতে পারে—যেগুলি বাস্তব জীবনেরই জিনিস। দৈনন্দিন জীবনে কতকগুলি অভ্যাস তারা সুষ্ঠুভাবে আয়ত্ত করতেও পারে যেমন, বিছান পরিষ্কার রাখা, একসঙ্গে খেতে বসা, জামার বোতাম সুন্দর করে পরা টিপটা রাখা, চুল আঁচড়ানো ইত্যাদি। নার্সারী বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মনে সর্বদ এই ভাবটি জাগিয়ে দিতে হয় যে, তারা একটি পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। আনন্দে উপাদান এই স্তরে যত বেশি করা যাবে, ততই শিশুরা সবকিছু ভুলে গিয়ে এব নতুন চেতনায় ও আনন্দে মশগুল হতে পারবে। এইভাবে শিশুর ব্যক্তিত্ব ও সমাজবোধ গঠন করা নার্সারী বিদ্যালয়ের লক্ষ্য ও আদর্শ হওয়া উচিত বলে শিক্ষাবিদেরা মনে করেন।

নার্সারী বিদ্যালয় যদিও একটি নির্দিষ্ট পরিসরে গড়ে ওঠে, তবুও এখানে শিক্ষার্থীদের বাইরের জীবনেও স্বাধীনভাবে মেলামেশা ও আনন্দ অর্জনের ক্ষেত্র

গড়ে দেওয়া যায়। তাদের বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে গিয়ে ক্যাম্প, হলিডে, বনভোজন, খেলাধুলা প্রভৃতিতে অংশ গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া যায়। বিদ্যালয়ের বাগানে তাদের নিয়ে গিয়ে নানা রং বেরঙের ফুল, গাছপালা, কীটপতঙ্গ, পশুপাখীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া যায়। তারা সে সব দেখেশুনে বিস্মিত, রোমাঞ্চিত ও পুলকিত হয়। বিদ্যালয়ের বাগানে নানা জাতীয় খেলাধূলার আয়োজন করা যেতে পারে যেমন—চাকাওয়ালা গাড়ী চালানো, শুট থেকে গড়িয়ে নীচে পড়া, সিঁড়ি বেয়ে ওঠা, ধাপ তৈরি করে ওঠা-নামা, রিং ধরে লাফালাফি ও ঝোলা, দড়ির মই দিয়ে যাওয়া, ছোট ছোট গাছে ওঠা ও পা দোলানো, কাঠের সাহায্যে ব্যালান্স খেলা, দড়ি লাফানো, দোল দোল দুলুনি খেলা, জলাশয়ে ক্রীড়া, লুকোচুরি খেলা, সৃষ্টিধর্মী নানা কাজ করা যেমন,—কাগজের পুতুল, নৌকা, বাস, উড়োজাহাজ, রেল গাড়ী ইত্যাদি বানানো, চলন্ত ক্রীড়া উপকরণ নিয়ে খেলা ইত্যাদি ইত্যাদি। এইসব বিষয়ে নার্সারী বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাগণ নিজেদের কল্পনাশক্তি, বিচারবুদ্ধি বিবেচনা করে আরো নানাভাবে কর্মসূচী তৈরি করে নিতে পারেন।

নার্সারী বিদ্যালয়ে বাগান করা একটা আর্ট বা ফ্যাশানের মতো ব্যাপার করে তোলা যায়। শিশুরাই নিজেরা মজা করে গাছপালা লাগাতে পারে, জল দিতে পারে এবং গাছপালার দেখাশোনা করতে পারে। তাদের উপযোগী ছোটো ছোটো কোদাল, কুঠার, বালতি ইত্যাদি দেওয়া যেতে পারে। বাগান করার ভেতর দিয়ে শিক্ষার্থীরা প্রকৃতিকে ভালবাসতে শেখে, মানবিক অনুভূতি জাগে। সমবেদনার প্রবৃত্তি তাদের মধ্যে এত সুন্দরভাবে জাগে যেন তার ফলে তাদের মধ্যে একটা কমনীয় একাত্মভাব ও ভগবদ্ভক্তির উন্মেষ সাধন সম্ভব হয়। ফ্রোয়েবেল 'প্রকৃতি, মানুষ ও, ভগবানের' যে নীতির কথা বলেছিলেন, নার্সারী বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জীবনে সেই নীতি বাস্তবসম্মতভাবে কার্যকরী করা সম্ভব।

নার্সারী বিদ্যালয়ের পরিবেশ এমনভাবে গড়তে হবে যার ফলে শিক্ষার্থীদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির চর্চা সুষ্ঠুভাবে হতে পারে। ইন্দ্রিয়ানুভূতির চর্চার জন্য মন্তেসরী প্রবর্তিত 'গতিশীল সাজসরঞ্জাম' খুবই উপযোগী। তাছাড়া, নানাধরনের সুদৃশ্য উপকরণ বিদ্যালয়ের আলমারীতে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা যেতে পারে। যেমন—রবারের পুতুল, কাঠের ইট, সেলুলয়েডের নানারকমের খেলনা, চীনা মাটির

পুতুল ইত্যাদি। তবে সেগুলি এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যাতে সহজে না ভেঙেচুরে যায়। কিছু কিছু যন্ত্রচালিত খেলনা মধ্যে মধ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে। এইসব খেলনা দেখে শুনে কিনতে হয়। শিশুরা এইসব দেখে খুবই কৌতুক অনুভব করে। কেউ কেউ যন্ত্রচালিত খেলনা সদা সর্বদা ব্যবহার পছন্দ করেন না। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য ছোট ছোট আলমারীতে সখের জিনিস সাজিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা যায়। বিভিন্ন উৎসবের দিনে তারা যাতে বন্ধু-বান্ধবদের এবং গুরুজনদের নানা উপহার দিতে পারে সেদিকে নজর রাখা দরকার এবং সেই সঙ্গে তাদের উপহার পাওয়া জিনিসগুলির মধ্য দিয়ে একটা সামাজিক মধুর সম্পর্কের ভাব গড়ে তোলা যায়।

নার্সারী বিদ্যালয়ের খেলাধূলার আয়োজন সব সময় শিক্ষার্থীদের বয়স, মেজাজ ও অন্যান্য দিক বিবেচনা করে ব্যবস্থা করা দরকার হয়। দেখতে হবে এইসব খেলাধূলার যেন সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে। যেমন, দেহগঠন, সৌষ্ঠব বৃদ্ধি, রুচিশীলতার বিকাশ, সৃজনীশক্তির প্রকাশ, কল্পনার নানা বিলাস ইত্যাদি। শিক্ষার্থীর বয়স যতই বাড়বে ততই তার খেলাধূলার সাজসরঞ্জামের প্রকৃতিও বদলে যাবে। উন্নতমানের খেলাধূলার আয়োজন করতে হবে যাতে শিক্ষার্থী নিত্যনতুন আনন্দের সন্ধান লাভ করে। খুব বিচিত্র ধরনের আয়োজন চাই—একঘেঁয়ে খেলাধূলা ও তার উপকরণ কোনো কাজের নয়। শিক্ষার্থীর বহুমুখী প্রবণতার দিকে তাকিয়ে সেইসব ব্যবস্থা নিতে হবে, যা আকর্ষণীয় ও ফলপ্রসূ।

আমেরিকার শিক্ষাবিদ্ বুহ্‌লার এক সমীক্ষায় বলেছিলেন, শিক্ষার উপকরণ ও আয়োজন বেশি না থাকার জন্য গরীব শিক্ষার্থীরা আস্তাকুঁড় বা জঞ্জাল থেকে উপাদান আহরণ করে ভাল ফল দেখিয়েছে অথচ সুপরিচালিত ও সুনিয়ন্ত্রিত অনাথ আশ্রমের শিশুরা নির্দিষ্ট নিয়মে পরিচালিত হয়েও উপকরণ ও আয়োজনের অভাবে ভালো ফল দেখাতে পারেনি। গরীব সাধারণ শিক্ষার্থীরা বুদ্ধিবৃত্তির পরীক্ষায় ভালো করেছিল। এই সমীক্ষার ফলাফল থেকে শিক্ষা নেওয়া যায়, খেলাধূলার উপকরণের প্রাচুর্য চাই। উপকরণ যেন সুনির্বাচিত হয়। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত খেলার পক্ষে তা যেন আনন্দ আহরণের প্রকৃত উপাদান বলে বিবেচিত হয়। খেলাধূলার উপকরণ নিয়ে শিক্ষার্থী নিজেই উদ্‌বুদ্ধ হয়ে সৃষ্টিশীল হয়ে উঠুক। খেলাধূলা ও কাজের মধ্যে এইজন্য চাই যথেষ্ট স্বাধীনতা। এইভাবে যে ধরনের অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীরা অর্জন করবে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে আরো উন্নতমানের উপকরণ

নিয়ে, খেলা ও কাজের মধ্য দিয়ে, তারা গড়ে তুলবে পরবর্তী জীবনেরই প্রস্তুতি। তাদের প্রত্যেকটি অভ্যাস ও প্রবণতা সম্পর্কে শিক্ষিকার পক্ষে রিপোর্ট রাখা দরকার।

শিশু তার কল্পনা বিলাস চরিতার্থ করার জন্য নানারকম স্বপ্নকে হাতের মুঠোয় পেতে চায়। অতএব তার কল্পনাবৃত্তি যাতে ব্যাহত না হয়, সেদিকে প্রখর বাস্তব দৃষ্টি প্রয়োজন। শিশুরা রান্নাবান্না করে, যন্ত্র নিয়ে খেলে, জীবজন্তু নিয়ে আনন্দ পায়। এইসব খেলা ও কাজের মধ্য দিয়েই তাদের অন্তরে গভীর সহানুভূতি ও মমত্ববোধ সৃষ্টি করা যায়। অনুকরণ স্পৃহা তাদের মধ্যে খুবই ক্রিয়াশীল হয়। তারা নানা আওয়াজ করে, ভ্যাংচি কাটে, জীবজন্তু গাড়ী ঘোড়ার শব্দের অনুকরণ করে। কু-অভ্যাস ত্যাগ করে যাতে তারা সদর্থক অনুকরণে অনুপ্রাণিত হয়, সেজন্য চাই নার্সারী শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ ও যত্ন পরিচর্যা। পরিবেশ থেকে উদ্দীপনা না পেলে তারা অবদমিত হতে পারে। শিশুকে সমাজ জীবন ও ব্যক্তিগত জীবনের কিছু নীতি শিক্ষা দিতে হবে হাতেকলমে।

নার্সারী বিদ্যালয়ে কোনো নির্দিষ্ট পাঠ্যতালিকা ও বাঁধাধরা রুটিনের প্রয়োজন নেই। চাই একটি বাস্তবধর্মী কর্মসূচী, আবাসিক বিদ্যালয়ের খেলা ও কাজের দিনরাত্রির কর্মসূচী। শিক্ষিকার ব্যক্তিগত উদ্যম, যত্ন ও পরিচর্যাই এখানে সবচেয়ে মূল্যবান।

সমাজ জীবনের দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শহর ও শিল্পাঞ্চল শুধু নয়, গ্রাম্যজীবনেও নার্সারী বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে। কারণ, বর্তমান যুগ নানাদিক থেকে জটিল হয়ে পড়েছে। এইজন্য সর্বত্র সংহত পরিকল্পনা অনুসারে নার্সারী শিক্ষার সম্প্রসারণ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। নার্সারী শিক্ষাকে শিক্ষা-ব্যবস্থার অবশ্য নির্দিষ্ট বা অনিবার্য স্তর হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

সার্জেণ্ট পরিকল্পনায় এক সময় বলা হয়েছিল, দেশের নার্সারী শিক্ষার সংখ্যা খুবই কম, তাই, দশ লক্ষ শিশুর শিক্ষাদানের জন্য নার্সারী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হয়েছিল। আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ উদ্‌যাপিত হয়েছে, শিশুর শিক্ষা পুষ্টি ও সামাজিক জীবন সম্পর্কে ধীরে ধীরে চেতনা বিস্তৃত হচ্ছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও নার্সারী শিক্ষা গুরুত্ব পেয়েছে।

ভারতবর্ষে গান্ধীজী তো জন্ম থেকে মৃত্যুকালীন সময় পর্যন্ত এক অব্যাহত ধারার শিক্ষার কথা চিন্তা করেছিলেন। ইংলণ্ডের মতো নার্সারী বিদ্যালয়ের

পবিবর্তে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু শ্রেণী চালু রাখা আমাদের দেশের পক্ষে অনেক কম ব্যয়সাধ্য হতে পারে তবে শিশুশ্রেণীর মেয়াদকাল অন্তত তিন বছব হওয়া চাই।

এইজন্য পৃথকভাবে শিক্ষিকা নিয়োগ এবং কর্মসূচীব রূপায়ণ করতে হবে প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন পরিবেশেই। নার্সারী স্তরের শিক্ষা পরিকল্পনার সার্থকতা নির্ভর করছে সরকাব, অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষিকা, জনগণ সকলের ঐকান্তিক উৎসাহের উপর। শিক্ষার প্রাথমিক ভিত্তি তৈরিব ব্যাপারে অবহেলা বা কার্পণ্য দেখালে জাতির পক্ষে তা আদৌ শ্লাঘার বিষয় নয়।

## ॥ ৩ ॥

## প্রাথমিক শিক্ষা : লক্ষ্য ও কর্মপ্রণালী

সামাজিক পুনর্গঠনের ব্যাপারে এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, ভারতের গণতন্ত্রেব প্রকৃত কার্যকরী রূপের জন্য নিরক্ষবতা দূরীকরণ চাই আর চাই ৬ বছর থেকে ১৪ বছর বয়সের শিক্ষার্থীর জন্য সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা।

আমাদের সংবিধানে এই বিষয়টি বিশেষ মর্যাদা পেলেও এবং বাস্তবক্ষেত্রে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা পরাধীন ভারতের চেয়ে অনেক অনেক গুণ বৃদ্ধি পেলেও শিক্ষার প্রকৃত সুযোগ সুবিধা ও ফলাফলের ব্যাপারে গুণগত ফলাফল বিচাব করলে দেখা যায়, জাতির শক্তি উপযুক্ত মর্যাদা পায়নি। অথচ সংবিধানের ৪৫ ধারায় দ্ব্যর্থবিহীন ভাষায় বলা হয়েছিল—'চোদ্দ বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বয়ঃসীমায় প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষার সুযোগ সুবিধার জন্যে রাজ্য প্রচেষ্টা নেবে।' এই নির্দেশ অনুসারে বিভিন্ন রাজ্যে অষ্টমমান পর্যন্ত শিক্ষাকে সর্বজন সহজলভ্য করার প্রয়াস অবশ্যই হয়েছে, পরাধীন ভারতের মতো অবস্থায় বর্তমান ভারতবর্ষ নেই, তবে ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত (অর্থাৎ দশম শ্রেণী পর্যন্ত) শিক্ষাকে সার্বজনীন, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা যায়নি। পশ্চিমবঙ্গে উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক হয়েছে যা প্রশংসার ব্যাপার। জাকির হোসেন কমিটি এক সময় আট বছর বয়স পর্যন্ত বুনিয়াদী ধরনের শিক্ষার কথা বলেছিলেন। বর্তমানে এই পর্যায়ের শিক্ষাকে সৃষ্টিশীল কাজের মধ্য দিয়ে সামাজিক প্রয়োজনীয় শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

প্রাথমিক তথা বুনিয়াদী শিক্ষাপর্বে উৎপাদনাত্মক কাজকে মূল বিষয় হিসেবে ধরে নিয়ে শিক্ষাসূচীর পঞ্চাশভাগ সময় এইজন্য ব্যয় করতে বলা হচ্ছে—বাকীটা ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, অহিংসা, সামাজিক ন্যায়, ধর্মনিরপেক্ষতা তথা সর্বধর্ম সমন্বয়ের আদর্শ ইত্যাদি গুণাবলী চর্চার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এইগুলি করতে গেলে অবশ্যই ভাষা, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, অঙ্ক, স্থানীয় ভূগোল, স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা ও চিকিৎসা জাতীয় বিষয়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত না করে পারা যায় না।

গ্রামে ও শহরে অষ্টমমান পযন্ত প্রাথমিক শিক্ষার ধাঁচ একধরনের করতে গেলে একটা অসুবিধে এই যে, উৎপাদনাত্মক কাজের বিষয়গুলি ও সুযোগ শহরে ও গ্রামে একরকমের নয়। এক্ষেত্রে একই আদর্শ সামনে রাখতে হবে, তা হোলো কর্মের মধ্য দিয়ে শিক্ষা। গ্রাম ও শহরের বিশেষ পরিবেশের দিকে লক্ষ্য রেখে কর্মের মধ্য দিয়েই এই শিক্ষা দিতে হবে। কিভাবে এদেশে একই ধরনের বিদ্যালয় প্রকল্প সর্বত্র চালু করা যায় তা শিক্ষাবিদদের কাছে একটা মস্তবড়ো চ্যালেঞ্জের মতো ব্যাপার।

জাতীয় শিক্ষা গবেষণা সংস্থার তৃতীয় সার্ভে রিপোর্ট থেকে জানা যায়, এদেশে গ্রামাঞ্চলে ৯৫ ভাগ শিক্ষার্থী প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে এবং ১'৪৫ কিলোমিটার দূরত্ব এলাকার মধ্যে ৯৭% ভাগ শিক্ষার্থী এসেছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আওতায়। তবে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত উৎকর্ষের সঙ্গে এই শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপকতার সামঞ্জস্য নেই। অনুসন্ধানে জানা যায়, নানারকম মনস্তাত্ত্বিক-সামাজিক অর্থনৈতিক কারণে, প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার সাংগঠনিক ও পরিচালনার ত্রুটির জন্য অভিভাবকরা অনেকাংশে নির্বিকার, শিক্ষার্থীরা পারিবারিক কাজকর্মে মশগুল, শিক্ষকদের মধ্যে উদ্দীপনা নেই, বিদ্যালয়ের নিজস্ব অবস্থানের মধ্যে নানা ত্রুটি ও অসামঞ্জস্য, উপযুক্ত সঙ্গতির অভাব প্রভৃতি কারণে প্রাথমিক শিক্ষার চিত্র যেন দৈন্যদশায় আক্রান্ত। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সের সমস্ত শিক্ষার্থীকে টেনে আনা এবং শিক্ষা সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তাদের ধরে রাখার সমস্যাটি বিভিন্ন রাজ্য বেশ গুরুত্ব সহকারে, উপলব্ধি করতে পেরেছেন।

প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করার কাজে যে সব প্রচেষ্টা আজ পর্যন্ত প্রয়োগ করা হয়েছে তা বিশ্লেষণ কবে দেখা যেতে পাবে। সেগুলি হোলো নিম্নলিখিত ধরনের :—

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার আইন প্রবর্তনের চেষ্টা হয়েছে। শিক্ষকদের হাজিবা ও ছাত্রদেব হাজিরা লক্ষ্য করার জন্য নজরদারীব ব্যবস্থা হযেছে। বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় নিত্য নতুন নতুন বিদ্যালয় খোলা হয়েছে। শিক্ষার্থীদেব বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক ও সাজসরঞ্জাম দেবার চেষ্টা হয়েছে, এমন কি অনেক জায়গায় মধ্যাহ্ন ভোজের ব্যবস্থা করা হয়েছে, কোথাও কোথাও বিনা ব্যয়ে শিক্ষার্থীদের যাতায়াতেব ব্যবস্থা হয়েছে, থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, নিয়মিত বিদ্যালয়ে হাজিবার জন্য স্কলারশিপ, দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। বিদ্যালযকে আর্থিক অনুদান ও সাজসরঞ্জাম দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। আংশিক সময়ের শিক্ষণ ব্যবস্থা, বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কাজের জন্য কর্মসূচী, শিক্ষকদের যোগ্যতা বৃদ্ধিব চেষ্টা, বিদ্যালয়কে আরো উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা, শিক্ষাদান পদ্ধতি, পরীক্ষাব্যবস্থা, পাঠ্যসূচীকে স্থানীয় চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেপে বিন্যাস করা, শিক্ষাদানের উপাদান উন্নত করা, গ্রামবাসীকে শিক্ষার কাজে এগিয়ে আসতে উৎসাহিত করা, বিদ্যালয় সংলগ্ন নার্সারী বিদ্যালয় খোলা, নারীদের জন্য পৃথক প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলা, নারী শিক্ষক ও কর্মী নিয়োগ করা, রেডিও, টেলিভিসন প্রভৃতি কর্মসূচীকে শিশুদের কাছে টেনে আনা, খেলাধূলা, শরীরচর্চা ইত্যাদি কর্মসূচীর আওতায় শিক্ষার্থীদের আনা ইত্যাদি নানারকম প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার সার্বজনীন বিস্তারের চেষ্টা হয়েছে। ফলে, প্রাথমিক শিক্ষাব অগ্রগতি নিঃসন্দেহে স্বাধীন ভারতবর্ষে অনেক বেশি প্রশংসাব দাবী রাখে। কিন্তু তবুও তা আমাদের প্রয়োজনেব তুলনায় অকিঞ্চিৎকর বলে আত্মসন্তুষ্টির কোনো কারণ নেই। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অসংখ্য ত্রুটিবিচ্যুতি বা ফাঁক রয়ে গেছে যা ভরাট করা দরকার সংহত পরিকল্পনা নিয়ে। একটি বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সমকালীন সমাজের সমস্যার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে নতুনভাবে দার্শনিক ভিত্তিভূমি দেওয়ার জন্য বিশেষভাবে প্রচেষ্টা দরকার। এই কাজটি করতে গেলে পরাধীন ভারতের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা, স্বাধীন ভারতের তিন দশকে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি ও ত্রুটিবিচ্যুতি সামনে রেখে পর্যালোচনা করে নতুন দিগন্তের সন্ধানে প্রবৃত্ত হতে হবে সকলকে।

প্রাথমিক শিক্ষার ঐতিহাসিক বিবর্তন পর্যালোচনা করে দেখা যেতে পারে। স্যার অ্যাডামস্-এর রিপোর্টে ( ১৮৩৮ ) জানা যায়, এক সময় বাংলা দেশে এক লক্ষ পাঠশালা ছিল। তবে সেইসব বিদ্যালয়ে যে ধরনের শিক্ষা চালু ছিল, এযুগের মাপকাঠিতে তা নিশ্চয় আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত ছিল না। তবে জনগণস্তরে শিক্ষাপ্রসারের এক আন্তরিক স্বাক্ষ্য বহন করেছে এই রিপোর্ট। কিন্তু ইংরেজ শাসনকালে প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ তেমন উল্লেখযোগ্যভাবে হয়নি। নিতান্ত গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গির আশ্রয়ে লিখতে-পড়তে পারা অঙ্ক কষার পারদর্শিতা অর্জন স্বাক্ষরতার মাপকাঠি হিসেবে গৃহীত হয়েছিল। শিক্ষার্থী কি কি গুণের অধিকারী হতে পারলো, তার শারীরিক মানসিক বুদ্ধিগত চাহিদাই বা কি ধরনের, কিভাবে সেই চাহিদা মেটানো যায়, এসব দৃষ্টিভঙ্গি একেবারেই ছিল না। ফলে, প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা যেটুকু গড়ে উঠেছিল তা নিতান্তই গতানুগতিক, একঘেয়ে, বিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্ব বিরোধী এবং সামাজিক চাহিদা বিরোধী একধরনের শিক্ষা।

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এই দৈন্যদশা আমাদের জাতীয় নেতাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষার লক্ষ্য ছিল উচ্চস্তরের শিক্ষার প্রভাব কিছুটা আপনি আপনি থিতিয়ে পড়বে নীচুর স্তরে। প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা চালু হলেও প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি হয়নি। এই পটভূমিকায় মহামতি গোখেল 'প্রাথমিক শিক্ষা বিল' নিয়ে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে সোচ্চার হয়েছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার ন্যূনতম দাবী জানানো হয়েছিল ভারতের জনগণকে অন্তত সাধারণভাবে শিক্ষিত করে তোলার জন্য। ভারতের জনগণের এই ঐতিহাসিক দাবীর দিকে জাতীয় চেতনা ধীরে ধীরে জেগে উঠে। গোখেল প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়বরাদ্দকে সেনাবিভাগ ও রেল বাজেটের সমপর্যায়ভুক্ত করার দাবী জানিয়েছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে জাতীয় কর্তব্য পালিত হয়নি। শিক্ষার সার্বিক আবহাওয়ায় অনেক পরিবর্তন এলেও জনগণের সার্বিক নিরক্ষরতার অপবাদ মুছে যায়নি। অথচ ইংলণ্ড দশ বছরের মধ্যে তার সমগ্র শিক্ষার্থীকে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় এনেছিল, জাপানের লেগেছিল বিশবছর। মহামতি গোখেল প্রাথমিক শিক্ষাকে নিছক স্বাক্ষরতার শিক্ষা মনে করেন নি। তাঁর মতে, প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য জনজীবন থেকে অশিক্ষার অভিশাপ

দূর করা। এই অভিশাপ স্বাধীন দেশেও যদি বজায় থাকে, তাহলে তার জন্য দায়ী নিছক আর্থিক অক্ষমতা নয়। দায়ী উপযুক্ত পরিকল্পনা ও নেতৃত্ব। জাতীয় আন্দোলনের মতো দুর্বারগতিতে গঠনমূলক কাজের আবহাওয়া তৈরির অভাব। পরাধীন দেশে গোখেল অনুভব করেছিলেন, প্রাথমিক শিক্ষা হবে এমন ধরনের যা দিয়ে জীবনের আনন্দবোধ অর্জনের বুনিয়াদ সৃষ্টি হয়। তিনি চেয়েছিলেন উন্নততর জীবন যাপন প্রণালীর মাধ্যমে সামাজিক-অর্থনৈতিক বুদ্ধিগত দাসত্ব থেকে মুক্তি। এই উপযোগিতাকে অস্বীকার করা মানে তাঁর কাছে ছিল স্বাস্থ্যের উপযোগী আলো-বাতাসকে অস্বীকার করা। গোখেলের এই দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিকে মেনে নিয়ে সর্বপ্রকার উন্নয়নমূলক কাজ ও জাতীয় অর্থনীতির মূল বুনিয়াদ গঠনে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে যথাযথ মর্যাদা ও গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। উপর থেকে খিতিয়ে পড়া কিছু ছিটে ফোঁটা জনগণের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে, সমাজের মুষ্টিমেয় কিছু লোককে শিক্ষিত বানিয়ে এবং উপরতলায় যাওয়ার রাস্তা বানিয়ে দিয়ে দেশের ব্যাপক জনগণস্তরে দারিদ্র্য, বুভুক্ষা, অশিক্ষা, অসাম্য জিইয়ে রেখে শ্রেণী-বৈষম্যমূলক প্রাথমিক শিক্ষার স্থিতিশীল রেওয়াজের বিরুদ্ধে স্বাধীন দেশের গণচেতনা ধীরে ধীরে প্রসারিত হচ্ছে তা খুবই লক্ষণীয়।

পরাধীন ভারতে রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, শ্রীশ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ শিক্ষা-দার্শনিকরা তাঁদের মূল্যবান শিক্ষাচিন্তার মধ্য দিয়ে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে নতুনভাবে শিক্ষাচিন্তার যেসব সূত্র নির্দেশ করেছিলেন, সেইসব চিন্তাধারার মধ্যে পারস্পরিক মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ও বৈচিত্র্য সত্ত্বেও তাঁরা এক জায়গায় দৃষ্টিভঙ্গিতে ঐক্যমত হয়েছিলেন যে, শিক্ষা হবে সমাজপ্রদ, কর্মভিত্তিক, সৃষ্টিশীল, পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ববোধের চাবিকাঠি। পাশ্চাত্যের জ্ঞানবিজ্ঞানের সারসত্তাকে স্বীকার করে নিয়ে তাঁরা চেয়েছিলেন মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার বিস্তার। শিক্ষাকে গণস্তরে সার্বজনীন করার এই হোলো উপায়।

গান্ধীজীর ওয়ার্ধা পরিকল্পনা পরে 'নঈতালিম' নামে যা পরিচিত, সেখানে তিনি জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অব্যাহত ধারার যে শিক্ষার কথা বলেছিলেন তার সব-চেয়ে মোদ্দা কথা, শিক্ষার মূল কেন্দ্রবিন্দু হবে শিক্ষার্থী, অন্য কেউ নয় এবং তার

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশকে নিয়েই হবে শিক্ষার যাবতীয় ব্যাপার-স্যাপার। তিনি ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাথমিক তথা বুনিয়াদী স্তরে প্রকৃত মানুষ গড়ে তোলার কথা বলেছিলেন এবং এই দরিদ্র দেশের অর্থনৈতিক চিত্রটি তাঁর জানা ছিল বলেই শিক্ষাকে অর্থনৈতিক মুখী তথা কর্মমুখী বা উৎপাদনমুখী প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষাসূচীতে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া অনুযায়ী বৃত্তিকেন্দ্রিক শিক্ষার সঙ্গে মাতৃভাষা, অঙ্ক, সমাজপাঠ, সাধারণ বিজ্ঞান, চিত্রাংকন, সঙ্গীত, নৃত্য, চারুকলা প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত ছিল। মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিল্পকেন্দ্রিক প্রাথমিক বা বুনিয়াদী শিক্ষা তিনি চেয়েছিলেন। রাষ্ট্রের প্রতি তাঁর পরামর্শ ছিল শিক্ষার জন্য ব্যয়বরাদ্দ অনেকখানি করতে। 'গ্রামে ফিরে চলো' এই স্লোগানের মধ্য দিয়ে তিনি কোটি কোটি অধিবাসী অধ্যুষিত গ্রামীন সমাজকেই সভ্যতার ভিত্তিভূমি হিসেবে চাঙ্গা করে তুলতে চেয়েছিলেন। তাঁর মতে, যে সব শিক্ষার্থী প্রতিভা সম্পন্ন, কেবল তাদের জন্যই চাই উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা। গ্রামীন সমাজের গণতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিকায় তিনি চরকাকে মূল শিল্প হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন সত্যি কথা, কিন্তু আসলে এই নীতিকে গোঁড়ামির আকারে না দেখে কর্মকেন্দ্রিক ও উৎপাদনাত্মক নীতি হিসেবে দেখাই সমীচীন। স্বাধীন দেশে যুগের মূল্যবোধ বহুবিস্তৃতভাবে অনুভূত হচ্ছে। তাই, কর্মকেন্দ্রিক তথা উৎপাদনমুখী শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষাকে নানা বৈচিত্র্যমূলক সৃষ্টিশীল সামাজিক দিক দিয়ে ফলপ্রদ শিল্পশিক্ষায় রূপান্তরিত করে নেওয়াই আসল জিনিস। গান্ধীজী শ্রমের ভিতর দিয়ে, কর্মের ভিতর দিয়ে, নানা বৈচিত্র্যমূলক কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে, বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সমন্বয় সম্বন্ধ স্থাপনের মধ্য দিয়ে যা চেয়েছিলেন তার খুঁটিনাটি ত্রুটিবিচ্যুতি বাদ দিয়ে বলা যায়, আসলে তা জীবনভিত্তিক শিক্ষা এবং তাঁর এই শিক্ষানীতি রবীন্দ্রনাথ, রুশো, জন ডিউই প্রমুখ শিক্ষা-দার্শনিকদের চিন্তার পরিপন্থী নয়। সত্যকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বাস্তবে প্রয়োগ করার যে কথা তিনি বলেছিলেন তা এই জটিল সভ্যতার যন্ত্রযুগে, মূল্যবোধের অবক্ষয়ের যুগে, নতুন মূল্যবোধ গড়ে তোলার কাজে, নিঃসন্দেহে চিন্তাভাবনার খোরাক জুগিয়েছে। ফলে, তাঁর চিন্তাধারা বদ্ধ জলাশয়ের মতো অস্বচ্ছ নয়।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেই রাধাকৃষ্ণণের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন ( ১৯৪৯ ) গান্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষার ভেতরে লক্ষ্য করেছিলেন শিক্ষাচিন্তার ক্ষেত্রে পৃথিবীর এক অসামান্য অবদান। কেননা, গান্ধীজী চেয়েছিলেন মানুষের ব্যক্তিত্বের ও মনুষ্যত্বের পূর্ণ উদ্‌বোধন, শিক্ষাকে তিনি চেয়েছিলেন দৈনন্দিন জীবনের জীবন-ধারা ও কাজের সঙ্গে যুক্ত করতে এবং সেজন্য তিনি সার্বজনীন শিক্ষাপ্রণালীর সবচেয়ে প্রয়োজনীয় উপাদানকে চিহ্নিত করেছিলেন। শিক্ষা অবশ্যই হবে জীবনধর্মী, আত্মনির্ভরশীল, হাতের কাজের ভেতর দিয়ে হৃদয় ও মগজের বিজ্ঞান-সম্মত ও মনস্তত্ত্বসম্মত বিকাশ। প্রাথমিক ও প্রাথমিকোত্তোর শিক্ষার কর্মসূচীতে তিনি অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন—(১) মাতৃভাষা (২) স্বাস্থ্য ও সামাজিক শিক্ষা (৩) সাধারণ বিজ্ঞান (৪) বৃত্তিমূলক শিক্ষা (৫) অঙ্ক (৬) সঙ্গীত, নৃত্য ও অঙ্কন (৭) বাগানের কাজ, ব্যায়াম ও সৌন্দর্যচর্চা। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য আদিম মানবসমাজের গল্প, প্রাচীন সভ্যতায় মানুষের জীবন ও কর্মধারা, দেশদেশান্তরের মানুষের জীবন কাহিনী, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস, সামাজিক অভ্যাস, দায়িত্ববোধমূলক কাজ, হাতের কাজ, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, ব্যক্তিগত ও সহযোগিতামূলকভাবে শিল্প ও বৃত্তিমূলক কাজ, খেলাধূলা, পরিবেশ পরিচিতি, পরিবেশ সুন্দর রাখার অভ্যাস, গার্হস্থ্য জীবনের প্রতি মমত্ববোধ, সাধারণ বিজ্ঞানের জ্ঞান প্রভৃতি অনুশীলনের কথা বলেছিলেন এবং এইভাবেই তিনি গতানুগতিক পুঁথিসর্বস্ব শিক্ষার পরিবর্তে সত্যিকার আনন্দজনক, সামাজিক দিক থেকে ফলপ্রসূ, যুগোপযোগী, গণতন্ত্র সম্মত শিক্ষার কথা বলেছিলেন।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশের নেতারা গান্ধীজীর আন্তরিকতায় আকৃষ্ট হয়ে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তনে অগ্রণী হয়েছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁর কাছে ছিল আরেকটি অভিজ্ঞতার নমুনা—'ভারতে যুদ্ধ-পরবর্তী কালীন শিক্ষার বিকাশ ( ১৯৪৪ ) সম্পর্কে স্যার জন সার্জেণ্টের মতামত। সার্জেণ্ট মহাত্মাজীর বুনিয়াদী শিক্ষা মেনে নিয়ে তাকে চিরাচরিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভেতরেই স্থাপন করতে চেয়েছিলেন এবং দেখিয়েছিলেন ৬ থেকে ১৪ বছরের সার্বজনীন শিক্ষাকে ২০০ কোটি টাকা ব্যয় করে চল্লিশ বছরের মধ্যে সুসম্পন্ন করতে। এই সঙ্গে বি. জি. খেরের নেতৃত্বে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গোখেল ও পারুলেকারের বিকল্প প্রস্তাব ছিল। সব মিলিয়ে আমাদের সংবিধান বিশেষজ্ঞরা হিসেব কষে ৪৫ নং ধারায় ১৯৬০ সালের মধ্যে ৬ থেকে ১৪ বছরের শিক্ষাকে সার্বজনীন করার প্রস্তাব

সংযোজন করেছিলেন। শিক্ষাবিদেরা গান্ধীজীর পরিকল্পনার সঙ্গে সার্জেণ্টের পরিকল্পনার একটি সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলার পরামর্শ দিয়েছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে গান্ধীজী তৎকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থায় একটি বিশেষ ধরনের শিক্ষাদর্শন উত্থাপন করেছিলেন তবে তিনি কোনো স্থিতিশীল বাঁধাধরা পেটেণ্ট চালু করার পরামর্শ দেন নি। মৌলানা আজাদ সে সময় বলেছিলেন—'বুনিয়াদী শিক্ষা একটা মহান পরীক্ষা। আমরা তাকে আরো সম্প্রসারিত করে কৃষি ও শিল্প এলাকার জন্য, গ্রাম ও শহরের জন্য কাজে লাগাতে চাই।' পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর বক্তব্য ছিল—'শিক্ষার প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কোনমতে যান্ত্রিক হবে না বরং তা হবে স্বাধীনভাবে পরীক্ষামূলক। আমাদের সামাজিক ও শিল্পগত যুগ চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে তার বিন্যাস চাই। যে কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অবশ্যই বৈচিত্র্যের স্থান থাকবে। অত্যন্ত গোঁড়ামি করার বিপদ আছে আর সেই বিপদ আমাদের স্বাভাবিক কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসার পক্ষে মারাত্মক ও ক্ষতিকারক।'

সার্জেণ্ট পরিকল্পনা একটু বিস্তৃতভাবেই রচিত হয়েছিল এবং এই পরিকল্পনায় প্রাক-প্রাথমিক পর্যায় থেকে উচ্চ শিক্ষা পযন্ত শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি মূল্যবান কথা বলা হয়েছিল বলে এই পরিকল্পনাকে কেউ কেউ তুলনা করেছিলেন শিক্ষাক্ষেত্রের ম্যাগনাকার্টার হিসেবে। গান্ধীজী চেয়েছিলেন ৭ বছর থেকে বুনিয়াদী শিক্ষা, সার্জেণ্ট সেই ক্ষেত্রে ৬ থেকে বুনিয়াদী প্রাথমিক শিক্ষার কথা বলেছিলেন। এর পূর্বে প্রাক্-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একটি সংহত অথচ অবৈতনিক অ-বাধ্যতামূলক শিক্ষাস্তর সম্পর্কে সার্জেণ্টের দৃঢ় পরিকল্পনা ছিল যা শিক্ষাবিদ্‌দের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে। সার্জেণ্ট প্রাথমিক শিক্ষাকে ভাগ করেছিলেন দুইটি পর্যায়ে—নিম্নবুনিয়াদী ও উচ্চবুনিয়াদী হিসেবে ( ৬-১১ এবং ১১ থেকে ১৪ বছর বয়সের জন্য )। এই শিক্ষা হবে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক। নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষায় জোর দিতে হবে হাতের কাজের উপরে, উচ্চ বুনিয়াদী পর্যায়ে বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপরে যার দ্বারা পরবর্তী পর্যায়ে বৃত্তি নির্বাচনের সুযোগ হয়। গান্ধীজীর পরিকল্পনায় যে আত্মনির্ভরশীল উৎপাদনাত্মক অর্থনৈতিক শিক্ষানীতি ছিল, সার্জেণ্ট তা হুবহু গ্রহণ না করে উচ্চ বুনিয়াদী পর্যায়ে আংশিকভাবে গ্রহণের

সুপারিশ করেছিলেন। সার্জেণ্ট পরিকল্পনার একটি বিশেষত্ব এই, যে, তিনি পুঁথি সর্বস্ব শিক্ষার পরিবর্তে শিশুর চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে এবং নাগরিকত্ব উন্মেষ-সাধনের প্রস্তুতি হিসেবে গানবাজনা, খেলাধুলা, নাচ, অভিনয়, বিতর্ক, শিল্প ও হাতের কাজ, বাগান করা, চাষবাস করা প্রভৃতি কর্মসূচীকে আনন্দজনক কর্মবৃত্তি হিসেবে গ্রহণের সুপারিশ করেছিলেন। উল্লেখযোগ্য, সার্জেণ্ট নিম্ন বুনিয়াদী পর্যায়ে ইংরেজি শিক্ষার উপর জোর দেন নি, উচ্চ বুনিয়াদী পর্যায়ে ইংরেজির উপর জোর দিয়েছিলেন। গান্ধীজীর পরিকল্পনায় উচ্চ বুনিয়াদী স্তর পর্যন্ত মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের কথা ছিল।

স্বাধীন দেশে বিশেষ করে আমাদের মতো উন্নয়নশীল নিরক্ষরতার অভিশাপে ভরা দারিদ্র্যে জরাতুর দেশে গোড়ার শিক্ষাকে গণমুখী ও গণতান্ত্রিক করতে হলে সবচেয়ে প্রধান সমস্যা হোলো ভাষার প্রশ্ন। বিদেশী ভাষা হিসেবে ইংরেজি ভাষা আমাদের স্বাধীন চিন্তাধারা প্রকাশের ভাষা নয়। জাগতিক জগতে এই ভাষার অবশ্য কার্যকারিতা আছে সন্দেহ নেই এবং যারা জ্ঞানবিজ্ঞানের সপ্তসিন্ধু মন্থন করে দিকপাল হবেন তাদের এই ভাষা জানতে পারলে খুবই ভালো হয়। কিন্তু, এই কার্যকারিতা ও বিশেষ প্রয়োজনের জন্যে উপায় আলাদা হতে পারে। তাই বলে শিক্ষার মূল প্রাণকেন্দ্রে মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন হবে না কেন? শিক্ষাকে সত্যিকারের গণমুখী, কর্মকেন্দ্রিক স্বাস্থ্য ও সমাজপ্রদ করতে হলে মাতৃভাষার ভিত্তিভূমি অবলম্বন করেই তা করতে হবে। অবশ্য মানুষের ভাষা যেহেতু নিয়ত ক্রমবিকাশশীল, কোনো এক মূল পাঠ্যগ্রন্থ নির্ভর করে মাতৃভাষা শিক্ষা দেওয়া যায় না—কাজের ভেতর দিয়ে স্থান-কাল-সমাজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বস্তু পরিচয়ের মধ্য দিয়েই ভাষা আয়ত্ত করতে হয়—কারণ, ভাষা গতিশীল, তার মনন চিন্তন এমন কি শব্দ সম্ভারের মধ্যেও যুগের প্রতিফলন আনে। এই জিনিসটিকে পাওলোফেরিয়ার ভাষায় বলা যেতে পারে উৎপাদন মুখী প্রসঙ্গ বা জেনারেটিভ থিম। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার ক্ষেত্রে মনন-চিন্তন, শব্দ সম্ভার নির্বাচন, কথোপকথন প্রভৃতি সবকিছুই অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে, কাজের ভেতর দিয়ে গড়ে তুললে তবেই চিন্তা ও মননের মৌলিক সাজসরঞ্জাম সুসংগঠিত হতে পারে। এই ভাবেই একটি জাতির স্বাধীন মৌলিক সত্তার বিকাশ গড়ে উঠতে পারে জনগণস্তরে। এই রূপান্তরের বিরুদ্ধে স্থিতিশীল দূরদৃষ্টিহীন মানুষেরা জোট বদ্ধ হয়ে শিক্ষার গণতন্ত্রীকরণের কাজে বাধা সৃষ্টি করেন, কারণ

তাঁরা শিক্ষার ক্ষেত্রে চান বুদ্ধিজীবির কৌলিন্য, জনস্বার্থের সার্বিক তাগিদের বিনিময়ে।

আমাদের পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নানা বিচিত্র শ্রেণী-চরিত্র লক্ষ্য করা যায়। যেমন—(১) নার্সারী বিদ্যালয় (২) নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় (৩) চিরাচরিত প্রাথমিক বিদ্যালয় (৪) এক শিক্ষক সমন্বিত বিশেষ বিদ্যালয় (৫) সাংগঠনিক বিদ্যালয় (৬) উচ্চ, উচ্চতর ও জুনিয়ার হাইস্কুলের পঞ্চমশ্রেণী (৭) সরকারী স্পনসর্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় (৮) বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয় (৯) কর্পোরেশন ও মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয় (১০) শিল্প সংস্থা পরিচালিত বিদ্যালয় (১১) রেলওয়ে পরিচালিত বিদ্যালয় (১২) ইংরেজি মাধ্যমের বিশেষ বিদ্যালয় প্রভৃতি। গণতান্ত্রিক দেশে প্রাথমিক শিক্ষাকে গণমুখী না করে এইভাবে নানা বিচিত্র শ্রেণী-চরিত্রের জাল সৃষ্টি করে শিক্ষার মধ্যদিয়েই জাতীয় চরিত্রের অনৈক্যের বীজ পোঁতা হয়েছে বৈচিত্র্যের নামে এক সৌখিন বিলাসিতায়। শুধু আর্থিক বা পরিচালনার দিক দিয়ে নয়, গণতান্ত্রিক-সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ ঐক্যপূর্ণ জাতীয় নীতি নিয়ে শিক্ষাকে বিজ্ঞানসম্মত ও সুবিন্যস্ত করার চেষ্টা হয়নি। ১৯৫০ সালে 'স্কুল এডুকেশন কমিটি' হরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও ডঃ কে. ডি ঘোষের সম্পাদনায় নতুন পাঠক্রম রচনার সুপারিশ করেছিলেন গণমুখী উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু তা রূপায়িত হয় নি। এঁদের পাঠক্রমে ছিল—(১) শরীর চর্চা (২) স্বাস্থ্যরক্ষা, খেলাধূলা (৩) সামাজিক ও নাগরিক শিক্ষা (৪) সৃষ্টিশীল কাজ ও কারু শিল্প (৫) গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, কৃষি সহ গৃহস্থালীর শিক্ষা (৬) ভাষা ও সাহিত্য (৭) পরিবেশ পরিচিতি—ইতিহাস, ভূগোল, প্রকৃতি বিজ্ঞান (৮) সাধারণ অঙ্ক (৯) শিল্প, সংগীত, নৃত্যকলা (১০) নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা। সম্প্রতি শ্রীহিমাংশু বিমল মজুমদারের নেতৃত্বে প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রম নতুনভাবে বিন্যাস করার চেষ্টা হয়েছে এবং প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে সুচিন্তিত শিক্ষা-দর্শনের যে ছায়াপাত করা হয়েছে তা শিক্ষাবিজ্ঞানের নিয়মসম্মত ও শিক্ষার গণতন্ত্রীকরণ আদর্শের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। পাঠ্যসূচীর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলা হয়েছে এই পাঠক্রমের প্রস্তাবনায়: (১) পাঠক্রমে আধুনিকতম চিন্তাধারা গ্রথিত হয়েছে, সেইজন্য প্রাথমিক শিক্ষাকে শিশুর এবং সমাজের সর্বতোমুখী বিকাশের সহায়করূপে

দেখা হয়েছে। (২) বিভিন্ন বিষয়ের লব্ধ অভিজ্ঞতার সাঙ্গীকরণের জন্য 'প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজ' শীর্ষক কর্মসূচী পর্যবেক্ষণ-ধর্মী একটি নতুন বিষয় সংযোজিত হয়েছে। (৩) পাঠক্রমকে প্রয়োগসাধ্য, ব্যবহারধর্মী ও পরিবেশ অনুসারে প্রাসঙ্গিক ও নমনীয় করার উদ্দেশ্যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। (৪) যুগোপযোগী কর্মক্ষম নাগরিক গড়ে তোলার জন্য উৎপাদনাত্মক ও সৃজনাত্মক কর্মের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং অনুসন্ধিৎসা, আবিষ্কার ধর্মিতা ও পর্যবেক্ষণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।'

প্রাথমিক শিক্ষাকে গণমুখী, সৃষ্টিশীল, বাস্তবধর্মী, সমাজ-সচেতন ও সার্বজনীন করার জন্য প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে মানুষ গঠনের ভিত্তিমূলে নতুন ধরনের পাঠক্রম রচনা করা এবং নতুনভাবে ভাষানীতি অনুসরণের এই প্রচেষ্টার মধ্যে একমাত্র শিক্ষারই ব্যাপার-স্যাপার আছে, অন্য কিছু নয়। নতুন পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে— (১) খেলাধুলা, শরীরচর্চা (২) সৃজনাত্মক ও উৎপাদনাত্মক কাজকর্ম (৩) প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজকর্ম (৪) মাতৃভাষা (৫) গণিত (৬) পরিবেশ পরিচিতি— প্রাকৃতিক পরিবেশ, ভূগোল, বিজ্ঞান, সামাজিক পরিবেশ এবং ইতিহাস। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার কোনো বিশেষভাবে চিহ্নিত রূপ এই পাঠক্রমে নেই সত্যি কথা কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজকর্মের মধ্য দিয়েই তো শিশু জানতে পারবে সংস্কৃতি ও যুগমূল্যবোধ। ভাষা ও অন্যান্য শিক্ষা জীবন-চর্চার সঙ্গে মিলিয়েই হওয়া ভালো। তাহলে তা যান্ত্রিক হয় না, কৃত্রিম হয় না, বিজাতীয় হয় না। এই দিক দিয়ে নতুন পাঠক্রমের ভেতর একটি বলিষ্ঠ চিন্তাধারা প্রকাশ পেয়েছে, আর লক্ষ্য করা গেছে এক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সাহসী পদক্ষেপ। গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে এই কাজ সম্পন্ন হলে আগামী দিনের লক্ষ লক্ষ শিশু প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রত্যক্ষ লব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে যে রোজনামচা লিখবে তা হবে রবীন্দ্রনাথের সহজ পাঠের লক্ষ লক্ষ সংযোজন। এইভাবেই শিক্ষা সম্প্রসারিত হয়।

## ॥ ৪ ॥

## মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও প্রণালী

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রত্যেকটি ধাপেরই একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে—মাধ্যমিক শিক্ষা সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার এমনি এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্তর অথচ এই স্তরটি নিদারুণভাবে উপেক্ষিত হয়ে এসেছিল পরাধীন ভারতে। রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের চোখে এই বিরাট ত্রুটি সকলের আগে ধরা পড়েছিল এবং সেই থেকে ক্রমাগত মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও প্রণালী নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চিন্তাভাবনা চলে এসেছে, যার নীট ফল মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ গুণগত পরিবর্তন।

সত্যি কথা বলতে কি, মাধ্যমিক শিক্ষা সহ উচ্চ শিক্ষার লক্ষ্য ও কার্যক্রম নির্ণয়ের জন্য সেই ১৮৫৪ সালের উডের ডেসপ্যাচের যুগ থেকে শুরু করে পরপর অনেক কমিশন ও কমিটি হয়েছে যেমন—ভারতের শিক্ষা কমিশন (১৮৮২), শিক্ষা কমিশন ( ১৯০২ ), স্যাডলার কমিশন ( ১৯১৭ ), হার্টগ কমিটি ( ১৯২৯ ), সাপ্রু কমিটি ( ১৯৩৪ ), উড ও অ্যাবট কমিটি (১৯৩৬-৩৭), সার্জেণ্ট রিপোর্ট (১৯৪৪)। স্বাধীন ভারতেও দেখা গেছে রাধাকৃষ্ণণ কমিশন ( ১৯৪৮ ), মুদালিয়র কমিশন (১৯৫২), কোঠারি কমিশন ( ১৯৬৪ ), জে. পি. নায়েকের চার্টার (১৯৭৫), এবং এছাড়া কেন্দ্রীয় শিক্ষা পর্ষদের নানা পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত। লক্ষ্য করার বিষয় এঁরা সকলেই, এক বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেছিলেন যে, প্রচলিত শিক্ষার বিন্যাস ত্রুটিপূর্ণ, চাই দ্রুত শিক্ষার সংস্কার, তা না হলে জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকার। রাধাকৃষ্ণণ কমিশন স্পষ্টতই বলেছিলেন পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ মেনে নিয়ে জরুরিভাবে দরকার সমগ্র শিক্ষার একটি সংহত পরিকল্পনা ও নীতি। প্রকৃতপক্ষে উচ্চ শিক্ষা স্তরের সমস্ত গলতির জন্য দায়ী নিম্নমানের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা। মাধ্যমিক শিক্ষা প্রাথমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের সংযোগ বিন্দু হয়েও অত্যন্ত অবিন্যস্তভাবে দুর্বল হয়ে থাকায় শিক্ষার সঙ্গে জাতীয় জীবনের সংযোগটুকু অত্যন্ত দুর্বল ও অসহায় হয়ে আছে। এই হুঁসিয়ারির পর মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে দেশে অনেক বেশি করে সংহত চিন্তাভাবনা ও উদ্যোগ আয়োজন লক্ষ্য করা যায়।

একথা অনস্বীকার্য, শিক্ষার্থী যখন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আসে তখন তার শিক্ষা একটি বিশেষ অর্থবহ হয়ে উঠে। কারণ, এই সময়টা বয়ঃসন্ধির কাল। সে যে

অভিজ্ঞতা আহরণ করে এবং বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচিত হয়ে যে জ্ঞান অর্জন করে তার দ্বারা সে বিভিন্ন জটিল বিষয়ের মধ্যেও সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষমতা রাখে। উচ্চ পর্যায়ের মানসিক ক্রিয়া এই সময় থেকে ধাপে ধাপে আরম্ভ হয় বলে এই সময়ের শিক্ষার মধ্যে একটা পরিচ্ছন্ন ঐক্য ও সংহতি বিশেষভাবে প্রয়োজন হয়। এই সময় শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক প্রবণতা ও ঝোঁক এবং ভবিষ্যৎ জীবনের সম্ভাবনা অনেকখানি বুঝতে পারা যায় এবং সেই অনুযায়ী তাদের গড়ে তোলার প্রয়োজন দেখা দেয়। এইসব বিবেচনা করে বলা যায়, আমাদের দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজন অনুসারে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার একটি বিশেষ মর্যাদা আছে। ইংরেজ আমল থেকে যে ধরনের মাধ্যমিক শিক্ষা চালু ছিল, তা নিতান্তই একমুখী, উদ্দেশ্যহীন, দেশের চাহিদা মেটানোর পক্ষে, শিক্ষার্থীর জীবন ও জীবিকার তাগিদের পক্ষে একান্তই অনুপযুক্ত ছিল। ফলে, স্বাধীন ভারতের বিভিন্ন কমিশন ও কমিটি গভীরভাবে অনুসন্ধান করে মাধ্যমিক শিক্ষার কাঠামো সঠিকভাবে নির্ণয়ের জন্য চিন্তাভাবনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছেন। ইংলণ্ডের মাধ্যমিক শিক্ষার কাঠামো পরিবর্তনে কিভাবে রাজনৈতিক নিরপেক্ষভাবে ধীরভাবে অথচ গতিশীল পরিবর্তন এসেছে বিভিন্ন যুগের মধ্য দিয়ে সে কথা আমরা ডঃ আর বির্লের মন্তব্যের মধ্য দিয়ে জানতে পারি। আমাদের দেশের পক্ষেও এই ধরনের ধীর অথচ গতিশীল পরিবর্তনের নীতি অনুসৃত হয়ে আসছে।

মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে বলা হয়, শিক্ষার্থীর সুসম্পূর্ণ ও সুসঙ্গত বিকাশ সাধনের মধ্য দিয়ে তাকে গণতান্ত্রিক নাগরিকত্বের চেতনায় এক বিস্তৃত, জাতীয়তাবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে সমৃদ্ধ করাই আসল কাজ। এই লক্ষ্য মনে রেখে মাধ্যমিক শিক্ষার মূল কাঠামো বিন্যাসের জন্য যেসব চিন্তাভাবনা হয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বিতর্কবহুল প্রশ্ন, মাধ্যমিক শিক্ষা দশবছরের বা একাদশ বছরের বা দ্বাদশ বছরের হবে। মুদালিয়র ও কোঠারি কমিশন উভয়েই এবিষয়ে একমত যে, পুরানো ধারায় পরিবর্তিত যুগের চাহিদা মিটবে না, সেজন্য প্রয়োজন এক ধরনের শিক্ষাগত বিপ্লব। কেননা, ভারতে লোকসংখ্যার হার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ৬ থেকে ১৪ বছরের শিক্ষার্থীই শুধু শিক্ষার আওতায় আসছে ২০০০ সালে ১২০ লক্ষ এবং একশো ভাগ স্বাক্ষরতার শিক্ষা অর্জনের কর্মসূচীতে প্রয়োজন হবে জনসংখ্যার শতকরা ১% ভাগ শিক্ষক, যা এক ভয়াবহ মানবিক সমস্যা। এতবড়ো একটা জাতের শিক্ষা সমস্যা সমাধানের পক্ষে

শিক্ষার কাঠামো একেবারেই বেসামাল হতে বাধ্য এবং সেইজন্য শিক্ষাবিদেরা সমগ্র জাতিকে শিক্ষিত করার জন্য বিধিবহির্ভূত শিক্ষা পরিকল্পনার কথা বলেছেন।

শিক্ষা কাঠামোর পুণর্বিন্যাসে জাতীয় স্তরে নীতি হিসেবে মেনে নেওয়া হয়েছে ১০+২+৩ সূত্র। এই সূত্র মেনে নেবার পূর্ব অবস্থা একটু বিশ্লেষণ করা দরকার।

ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর—জুনিয়ার বা নিম্ন মাধ্যমিক এবং সিনিয়ার বা উচ্চ মাধ্যমিক। জুনিয়ার স্তরকে কোনো কোনো প্রদেশে মাধ্যমিক বিদ্যালয় বা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় বলা হয়। এই স্তরের বিদ্যালয় ও উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় একই পর্যায়ভুক্ত, যদিও পাঠ্যসূচী বিভিন্ন। কোনো কোনো প্রদেশে এই স্তর তিন বছরের, কোথাও আবার চার বছরের। উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় কোনো প্রদেশে তিন বছরের, কোথাও আবার দু বছরের। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মিড্‌ল স্কুল বা মাধ্যমিক বিদ্যালয় চার বছরের (দু বছরের নিম্নপর্যায়, দুবছরের উচ্চ পর্যায়)। এইভাবে সর্বভারতীয় মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কোনো সার্বিক ঐক্য নেই। এইজন্য জাতীয় নীতি গ্রহণ করে মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে একটি সুসংগত পরিকল্পনায় আনার চেষ্টা হয়েছে। ভারতের কোনো কোনো প্রদেশে যেমন দিল্লী, মাদ্রাজ প্রভৃতিতে পূর্ব থেকে একাদশ বা দ্বাদশ শ্রেণী সম্বলিত মাধ্যমিক বিদ্যালয় চালু আছে। কোথাও কোথাও কলেজে জুনিয়ার কোর্স হিসেবে দ্বাদশ শ্রেণী যুক্ত মাধ্যমিক স্তর আছে। মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে একটি সার্বিক জাতীয় ঐক্য স্থাপনের জন্য মুদালিয়র কমিশন একাদশ শ্রেণীযুক্ত বহুমুখী ও উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা চালু করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে দশম শ্রেণীর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও একাদশ শ্রেণী সম্বলিত মাধ্যমিক বিদ্যালয় (কলেজে প্রি-ইউনিভার্সিটি কোর্স) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। স্বয়ং মুদালিয়র হিন্দুস্থান টাইমস্‌ পত্রিকায় (১৯৫৬) যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তা থেকে জানা যায় তিনি স্বীকার করেছিলেন মাধ্যমিক বিদ্যালয় একাদশ বা দ্বাদশ বছরের হবে সে নিয়ে অনেক রাজ্যে বিতর্ক আছে এবং শেষ পর্যন্ত তিনি নীতিগতভাবে স্বীকার করেছিলেন যে, বিদ্যালয়ের শিক্ষা ১২ বছরের দীর্ঘমেয়াদী হওয়া সমীচীন, তার মধ্যে ৮ বছর ব্যাপী শিক্ষা (জুনিয়ার হাইস্কুল বা উচ্চতর প্রাথমিক) বাধ্যতামূলক ও সার্বজনীন করে বাকী চার বছর উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা হওয়াই সমীচীন। কার্যক্ষেত্রে একাদশ সম্বলিত বহুমুখী সর্বার্থসাধক বিদ্যালয় চালু

হয়েছিল কিন্তু নবম শ্রেণীতেই শিক্ষার্থীদের মেধা প্রবণতা দক্ষতা অনুযায়ী বিষয় ও বৃত্তি নির্বাচনের সিদ্ধান্ত পাকাপাকিভাবে নিয়ে ফেলার মধ্যে নিদারুণ ঝুঁকি থাকায় এবং দেশের সর্বত্র বহুমুখী পাঠক্রম চাহিদা অনুযায়ী চালু করা সম্ভব না হওয়ায় এই পরিকল্পনা বাতিল হয়ে যায় কোঠারি কমিশনেব সুপারিশে।

বারো ক্লাসের মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের বক্তব্য ছিল, ইউরোপের বিভিন্ন দেশেই বারো বছরের শিক্ষাদান হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পূর্বে এবং আমাদেব দেশে ইণ্টাবমিডিয়েড স্তরে যা হয় তা প্রকৃতপক্ষে প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ। দে কমিশন বারো ক্লাসের মাধ্যমিক পযায় সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু সরকার এগারো শ্রেণী মেনে নিয়ে যে ব্যবস্থা কবেন তাতে ঐ বয়সে শিক্ষার্থীদের পক্ষে ভবিষ্যৎ জীবনের সঠিক সিদ্ধান্ত সম্ভব নয় এবং অত অল্পবয়সে বিষয়ের গুরুভাব চাপিয়ে দেওয়া সঠিক নয়। কোঠারি কমিশন দেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিজ্ঞানভিত্তিক দুনিয়ায শিক্ষাকে উন্নয়নের অভিমুখী, কল্যাণধর্মী, প্রগতি ও নিরাপত্তার হাতিযার হিসেবে গণ্য করে বলেছিলেন, শিক্ষার নীতি নতুন করে নিতে হবে এবং কোনো বাঁধাধবা বাঁধুনির পবিবতে চাই কিছুটা এমন সংযোগবিন্দু যা নিত্য পরিবর্তনশীল বিজ্ঞানভিত্তিক দুনিয়ার সঙ্গে খাপ খাইযে নেওযা যায়—বর্তমান যুগ পবীক্ষা-নিরীক্ষার যুগ—নিত্য নূতন নূতন পরিবর্তন আসছে—কাল কি হবে আজ কেউ জানে না—এই অবস্থায় শিক্ষার ভেতর দিয়েই চাই বিপ্লব—বর্তমান শিক্ষা কাঠামোর বজ্রবাঁধুনি থেকে তাই বেরিয়ে আসতে হবে নতুন ছকে। ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা কাঠামোর কিছু রং পালিশ করে এতদিন যা করা হযেছে তার ফলে সমাজে সৃষ্টি হযেছে নানা শ্রেণী-বৈষম্য, যার ফলে সামাজিক লক্ষ্য হিসেবে সমান সুযোগের নীতি কার্যকরী হয়নি। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা তো সমাজের মধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত এবং ধনীদের করায়ত্ত, গণতান্ত্রিক হয়নি, পেশাদাবী কাজ সীমাবদ্ধ হযে আছে উচ্চ শিক্ষিতদের মধ্যে, শিক্ষার সঙ্গে দেশের ব্যাপক জনগণের অর্থনৈতিক যোগসূত্র যা দাঁড়িয়ে আছে তাব নীট ফল অর্থনৈতিক অসাম্য ও বেকারত্ব। একদিকে উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে দেশের ধনী সম্প্রদায়ের যোগসূত্র ঘটেছে শিল্প বিজ্ঞান প্রযুক্তির এলাকায়, অন্য দিকে গ্রামের বিরাট জনগণের অংশ শিক্ষার প্রকৃত সুযোগ থেকে বঞ্চিত। তাই, প্রশ্ন দেখা দিতে বাধ্য, কিভাবে বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে গণমুখী এবং সমাজপ্রদ করা যায় এদেশের গ্রামীণ অর্থনীতি ও শ্রেণী চরিত্রের দিকে লক্ষ্য

রেখে। কোঠারি কমিশন এই দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ১০+২+৩ সূত্রের শিক্ষা কাঠামো সুপারিশ করেন। ১৯৭৭ সালে শ্রীমন্নারায়ণ একটি সেমিনার ডেকেছিলেন তাতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য ছিল শিক্ষার কাঠামোকে ১০+২ সূত্র হিসেবে না গ্রহণ করে ৮+২+২ হিসেবে গ্রহণ করতে। অর্থাৎ নিম্নমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত অষ্টম শ্রেণীর বাধ্যতামূলক সার্বজনীন শিক্ষা সমাপনের পর ৪ বছরের উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা। আমাদের দেশের অর্থনৈতিক ও শ্রেণী-চরিত্রের কাঠামোয় ৮+৪ ধরনের শিক্ষাকাঠামোর পক্ষে অনেকে যে যুক্তি উত্থাপন করেন তা ভেবে দেখার জিনিস। তবে সরকার ১০+২+৩ সূত্র মেনে নিয়েছেন সাধারণভাবে। কোঠারি কমিশনের যুক্তিকে সাধারণভাবে মান্য করে এই নতুন শিক্ষাসূত্র গ্রহণ করা হয়েছে তবে ভবিষ্যতে শিক্ষাতন্ত্রের কাঠামো ৮+৪ স্তরেই শেষ পর্যন্ত দাঁড়াবে।

সরকারের উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা সংক্রান্ত পর্যালোচনা কমিটি অধ্যাপক ম্যালকম এস. আদিশেশিয়ার নেতৃত্বে গঠিত হয় এবং এই কমিটির সুপারিশে মাধ্যমিক শিক্ষাকে বৃত্তিমুখী করার দিকে লক্ষ্য রেখে মাধ্যমিক স্তরে দুই ধরনের পাঠক্রমের সুপারিশ করেছেন—এক, সাধারণ স্তরের, দুই, বৃত্তিমুখী। উভয় পর্যায়েই শিক্ষাদানের সময়কাল এক রকমের। যথা—ভাষাসমূহ ১৫%, সামাজিক ফলপ্রদ উৎপাদনাত্মক কাজ/সাধারণ ভিত্তিমূলক পাঠক্রম ১৫%, ঐচ্ছিক বিষয় ৭০% সময় নির্ধারণের কথা বলা হয়েছে। এই পরিকল্পনায় এমন চোদ্দ রকমের কর্মবৃত্তি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা বৃত্তিমুখী ও সাধারণ পর্যায়ের সকল শিক্ষার্থীই গ্রহণ করতে পারে। যেমন, স্বল্পসঞ্চয় প্রকল্প, ফিল্ম প্রদর্শনী সংগঠন, শিশু পরিচর্যা, বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্প প্রভৃতি। তেমনিভাবে বৃত্তিমূলক পরীক্ষার প্রথম পর্যায়ে গান্ধীজীর শিক্ষাদর্শন, কৃষি, কৃষি উন্নয়ন, শহরের জঞ্জাল সাফ ও স্বাস্থ্যরক্ষা, পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য প্রকল্প ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে কুটীর শিল্প, প্রচেষ্টা ও সংগঠন, সমবায় ও ঋণ, মার্কেটিং, বিক্রয়, বেকার সমস্যা, মানবিক শক্তির ব্যবহার, বিশ্বের প্রবণতা ও পরিবর্তিত চিন্তাধারা, পরিবেশ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ ইত্যাদি। এই পরিকল্পনার ভেতর দিয়ে মাধ্যমিক শিক্ষার যে রূপটি পরিস্ফুট হয়েছে তা তিন ধরনের—এক, এমন বিদ্যালয় যেখানে শুধু সাধারণ ভিত্তিভূমির শিক্ষা ও ঐচ্ছিক বিষয় পড়ানো যায়। দুই, এমন বিদ্যালয় যেখানে শুধু বৃত্তিমূলক ভিত্তিভূমির শিক্ষা ও ঐচ্ছিক বিষয় পড়ানো যায়। তিন, এমন

বিদ্যালয় যেখানে সাধারণ ও বৃত্তিমূলক ভিত্তিভূমির উভয়বিধ শিক্ষাসূচী অনুসরণ করা যায়। মাধ্যমিক শিক্ষার এইভাবে দুই অলিন্দ যুক্ত ব্যবস্থা মুদালিয়র কমিশনের "প্রবণতামুখী" বিষয়গোষ্ঠীর কথা স্মরণ করিয়ে দিলেও পরবর্তী এই ব্যবস্থা মৌলিক দিক দিয়ে পৃথক সন্দেহ নেই। গ্রামীণ এলাকায় যাতে কৃষির উপর এবং তৎসংলগ্ন আনুষঙ্গিক বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে সাধারণ শিক্ষাকে অনেকখানি পরবর্তী বৃত্তি বা সাধারণ শিক্ষার উপযোগী একটা 'ঝোঁক' সৃষ্টি করা যায়, শিক্ষা চলাকালীন 'কর্মভিত্তিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে অর্জিত অভিজ্ঞতা নিয়ে কিছু কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষা নিয়ে ব্যবহারিক জগতের প্রয়োজনীয় জীবিকা অথবা উচ্চ শিক্ষা যাওয়া যায়, সেজন্য গ্রামাঞ্চলে মিশ্র পদ্ধতির মাধ্যমিক শিক্ষা চালু করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

পল গুডম্যান বলেছিলেন, আমাদের সমাজের মুখ্য সমস্যা হোলো আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ত্রুটি যার ফলে উচ্চ মধ্যবিত্তদেরই সুবিধে. নীচু শ্রেণীর পক্ষে সুবিধে নয়। এর ফলে গ্রামাঞ্চলে ও শহরে দরিদ্র ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীরা শিক্ষার সমান সুযোগের অধিকার থেকে বঞ্চিত। একদিকে ধনবিলাস ও মগজের ভীষণ চাতুরি, অন্যদিকে গণস্তরে সর্বনাশা বুভুক্ষা। তাই সামাজিক বিপ্লব সমাধা করতে গেলে বিদ্যালয়ের কর্মসূচীর মধ্য দিয়েই তা করতে হবে। এইজন্য পর্যালোচনা কমিটি মাধ্যমিক শিক্ষার দুটি বিস্তৃত শিক্ষাংশ তৈরি করেছেন যার নাম সাধারণ শিক্ষার অলিন্দ ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার অলিন্দ সাধারণ শিক্ষার লক্ষ্য শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব গঠন, ভাষা, সমাজবিজ্ঞান বা মানবিক বিজ্ঞানের মাধ্যমে তাকে পরবর্তী কলা, বিজ্ঞান বা পেশাদারী বিদ্যার জন্য তৈরি করা এবং এই শিক্ষা মূলত হবে সামাজিক দিক দিয়ে ফলপ্রসূ উৎপাদনাত্মক কাজকর্মকে মূল কেন্দ্র হিসেবে ধরে। ফলে, এই সাধারণ শিক্ষা নিছক পুঁথিসর্বস্ব শিক্ষার ব্যাপার নয়, আসলে প্রত্যক্ষমূলক অভিজ্ঞতার ব্যাপার। বৃত্তিমূলক অলিন্দের উদ্দেশ্য হোলো শিক্ষার্থীকে এমন দক্ষতার পটভূমিকা তৈরি করে দেওয়া যা সে প্রযুক্তিবিদ্যার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিজ্ঞান, খামার ও অন্যান্য বাস্তব পরীক্ষামূলক কাজের মধ্য দিয়ে শিখে নেবে। এই শিক্ষা কারিগরী বা পেশাদারী বিশেষ ধরনের বিদ্যালয়ের বিশেষভাবে কোনো বিষয়ে অর্জিত দক্ষতার সঙ্গে মৌলিক পার্থক্য হবে। ইউনেস্কোর ভাষায় এই শিক্ষাকে ব্যাখ্যা করে বলা যায়, এই শিক্ষা এমন ধরনের সাধারণ শিক্ষাসমন্বিত শিক্ষা যার সঙ্গে প্রযুক্তি ও তৎসংলগ্ন

বিজ্ঞানের বাস্তব দক্ষতা, প্রবণতা, অনুরাগ, বোধ, জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করবে এবং জানবে আমাদের সমাজ ও অর্থনৈতিক জীবনের নানা পেশার খবরাখবর যার সাহায্যে একটা সাধারণ ভিত্তিভূমি অর্জন করে শিক্ষার্থী যেতে পারবে জীবিকা অর্জনের দিকে এবং অব্যাহত ধারায় শিক্ষার দিকে। পঞ্চাশভাগ শিক্ষার্থীর পক্ষেই এই ধরনের মাধ্যমিক শিক্ষা হয়ে উঠবে শিক্ষা সমাপ্তির কাল। বৃত্তিমূলক এই মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য বিশেষজ্ঞ তৈরি নয়, আসলে শিক্ষার্থীকে এমন একটা মানসিক প্রস্তুতি দেওয়া যা অর্জন করে সে নিজেই উদ্যোগ নিয়ে কোন কিছু করতে পারে এবং এই জন্য গ্রামীণ অর্থনীতির দিকে তাকিয়ে যাতে শিক্ষার্থীরা কৃষি ও তৎসংলগ্ন শিল্প ও বিজ্ঞানে নিজেরাই একটা শক্তির আকারে আত্মপ্রকাশ করে দেশের অর্থনীতিকে ও সমাজ মানসিকতাকে চাঙ্গা করে তুলতে পারে সেইজন্য একটা প্রস্তুতি দেওয়াই এই শিক্ষার উদ্দেশ্য।

পাঠক্রমের প্যাটার্ন বা স্বরূপ কি ধরনের হওয়া উচিত এ বিষয়ে যে দিগ্‌দর্শন নির্ণীত হয়েছে তা তুলে ধরা যেতে পারে :—

## সাধারণ শিক্ষার পাঠক্রম

(ক) শিক্ষা সময়ের ১৫% ভাগ সময় ব্যয় করা হবে ভাষা গোষ্ঠীর জন্যে। একটিমাত্র ভাষা ( মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা—বিদ্যালয়ের সুযোগমতো ) শিখতে হবে আর দ্বিতীয় ভাষা যাবতপক্ষে বিদেশী ভাষা শিখতে হবে তবে এ ক্ষেত্রে কাযকারিতার বিচার কৃতিত্বের স্বাক্ষর বলে গণ্য হবে অতিরিক্তভাবে।

(খ) সামাজিক দিক দিয়ে প্রয়োজনীয় উৎপাদনাত্মক কাজ : এখানেও শিক্ষার সময়ের ১৫% ভাগ ব্যয় করা হবে। সামাজিক দিকে প্রয়োজনীয় এইসব উৎপাদনাত্মক কর্মবৃত্তির লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থীর মধ্যে কাজ করার সদর্থক মনোভাব সৃষ্টি করা। সমাজ ও পরিবেশ প্রকল্পের মাধ্যমে নিজেরা যাতে পরিবেশের সঙ্গে একাত্ম হতে পারে, সমবায়মূলক কাজের অভ্যাস অর্জন করতে পারে, সমাজকে যাতে বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্বন্ধে ধ্যান-ধারণা দিয়ে বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গির প্রবর্তন করতে পারে, শ্রেণীকক্ষে এবং বৃত্তিগত জ্ঞানের ক্ষেত্রে অর্জিত অভিজ্ঞতা দিয়ে যাতে সমাজের দৈনন্দিন সমস্যা সমাধান করতে পারে, জাতি গঠনের কাজে অংশ নিতে পারে, উন্নয়নমূলক রাষ্ট্রীয় কাজের সারবত্তা অনুধাবন করতে পারে সেইভাবে শিক্ষা দেওয়া হবে এই পর্যায়ের কাজ। গ্রামীণ উন্নয়ন ও সমাজসেবার,

ক্ষেত্রে যাতে উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় এমনভাবে প্রত্যক্ষ শিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষক, ছাত্র ও সমাজের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের জন্য শিক্ষককে 'সবজান্তা' বিশারদ করে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে, শিক্ষার্থীকেও প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে সমাজসেবায়, গ্রামীণ সমাজের জনগণ ও অভিভাবকদের বিদ্যালয়ে এনে কাজকর্মের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত করা হবে এমনভাবে যার নীট ফল হবে এই, হাতের কাছে পাওয়া সবরকম রসদ বা উপাদানকে কাজে লাগিয়ে একটা বিরাট কর্মযজ্ঞের ব্যবস্থা করা যাবে, যদিও আর্থিক বাহুল্য দরকার নেই। একটা সাধারণ কর্মসূচীতে থাকবে চোদ্দ রকমের কর্মতালিকা, যদিও তা ঐচ্ছিক, যার যা ভালো লাগে সেইভাবে বেছে নেবে—(১) তথ্যানুসন্ধান (২) বৃক্ষরোপণ (৩) পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য (৪) পুষ্করিণী খনন, বাঁধ মেরামতি, সমাজকেন্দ্র স্থাপন, রাস্তা তৈরি (৫) স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্প (৬) স্বাস্থ্য ও পুষ্টির শিক্ষা (৭) জাতীয় দিবস ও উৎসব পালন (৮) ফিল্ম প্রদর্শনী (৯) পাঠাগার ও ভ্রাম্যমান ল্যাবরেটারী পরিচালনা (১০) হাসপাতালের কাজ (১১) খেলাধূলা গানবাজনা (১২) শিশুদের কোচিং (১৩) বয়স্ক শিক্ষা (১৪) ক্যাম্প পরিচালনা।

সাধারণ শিক্ষার ভিত্তিভূমিতে ভাষা চর্চার ভূমিকা হবে ছোটো ছোটো গল্প ও প্রতিবেদন লেখ, বক্তৃতা ও বিতর্কের মধ্য দিয়ে নেতৃত্ব গঠন, শিল্প সৌন্দর্য সুষমার প্রতি অনুরাগ, জাতীয় সংহতি অর্জন, দৈনন্দিন জগতের খবরাখবর সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন, বয়স্ক শিক্ষার প্রসার, শিশুদের পরিচর্যা করা। ইতিহাস শিক্ষার ভিত্তি হবে ঘটনার নাট্যরূপ দেওয়া, ঐতিহাসিক ফিল্ম বাছাই, ঐতিহাসিক পুস্তিকা ও প্রচারপত্র প্রকাশ, প্রদর্শনী করা, দেশের রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে বক্তৃতা বিতর্ক প্রতিযোগিতা, স্থানীয় উপাদানের ব্যবহার ও উপযোগিতা, নানারকম কৌতুক ও খেয়াল অনুষ্ঠান। ভূগোলের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু হবে আবহাওয়া সম্পর্কে বেতার সংবাদ শোনা, গ্রামবাসীকে সেইসব সংবাদের তাৎপর্য বোঝানো, ভূমিকম্প অগ্ন্যুৎপাতের মডেল তৈরি, ভূমি ও রাস্তার নক্সা তৈরি, পঞ্চায়েতের সভাসমিতিতে যোগদান প্রভৃতি। অঙ্কের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের বোঝানো চলতি দুনিয়ায় অঙ্কের কি প্রয়োজনীয়তা, নিয়ন্ত্রিত দরে জিনিসপত্র সমবায় বিপণির মাধ্যমে কেনা-বেচা, মডেলের সাহায্যে জ্যামিতিক রেখাচিত্র বা নক্সা আঁকা, দেশী বিদেশী মুদ্রারীতি জানা, ওজন ও পরিমাপ সম্পর্কে জ্ঞান যার ফলে তারা দোকান হাটে মূল্যমান ব্যাপারে প্রতারিত হতে পারবে না। পদার্থবিদ্যার মধ্য দিয়ে জানবে কিভাবে

বৈদ্যুতিক সংঘাত থেকে আত্মরক্ষা করা যায়, বজ্র বিদ্যুৎ সম্পর্কে ধারণা ও তার নিরোধের ব্যবহার, রেডিওর যান্ত্রিক জ্ঞান, সূর্যশক্তি থেকে তাপ সৃষ্টি, কৃত্রিম বৃষ্টিপাত, জল ও বাষ্প থেকে বিদ্যুৎ সৃষ্টি, বৈদ্যুতিক কুকার ও অন্যান্য দৈনন্দিন সাজসরঞ্জামের ব্যবহার, বিভিন্ন রকমের শব্দযন্ত্র ব্যবহার। রসায়নের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা জানবে সাবান ও সোডার ব্যবহার, ডেটল, ফেনাইলের কার্যকারিতা, টিংচার, রং, ব্লিচিং পাউডার, গোবর গ্যাস প্ল্যাণ্ট, অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, পোকামাকড়ের প্রতিষেধক ঔষধ, জল শোধন ইত্যাদি সম্পর্কে বাস্তব হাতেকলমের কাজ। জীবন বিজ্ঞানের মধ্য দিয়ে হাতেকলমে জানবে কিভাবে পোকামাকড়ের হাত থেকে ফসল রক্ষা করা যায়, প্রজনন, পশুপালন, হাঁস-মুরগী পালন, হরমোন ব্যবহার করে ফুল ফোটানো, চামড়ার ব্যবহার, অর্থনৈতিক জীবন বিজ্ঞানের কার্যকারিতা, একই জমিতে অধিক ফলন ও বারংবার চাষবাস, নাইট্রোজেনের ব্যবহার, পরিবেশ দূষণ প্রভৃতি সম্পর্কে ধারণা। গার্হস্থ্য বিজ্ঞান শিক্ষা দেবে কিভাবে রান্নাবান্নার শাকসব্জি ফলানো যায়, হাঁস মুরগী; মৌমাছি পালন করা যায়, সস্তায় খাদ্য পরিবেশন করা যায়, সার তৈরি করা যায় ইত্যাদি।

আভ্যন্তরীণভাবে এইসব সম্পৃক্ত কার্যাবলীর জন্য মূল্যায়নের নির্দেশ ধরা হয়েছে নিম্নলিখিতভাবে—

| বিচার্য বিষয় | মূল্যায়ন |
|---|---|
| ব্যক্তিগত গুণাবলী | ২০ |
| নিয়মমতো হাজিরা | ১০ |
| মানবিক সম্পর্ক | ১০ |
| দক্ষতা | ২০ |
| অর্জন | ১০ |
| কাজের বিবরণী | ৩০ |

ঐচ্ছিক বিষয়ের তালিকায় সাধারণ পাঠ্যক্রমে ধরা হয়েছে নিম্নলিখিত বিষয় :—

(১) বাধ্যতামূলক মাতৃভাষা ছাড়া অন্যান্য ভাষা

(২) অঙ্ক

(৩) অর্থনীতি

(৪) রাজনৈতিক বিজ্ঞান
(৫) রসায়ন
(৬) ভূগোল
(৭) জীবনবিজ্ঞান
(৮) সমাজ বিজ্ঞান
(৯) ইতিহাস
(১০) দর্শন
(১১) নন্দনশাস্ত্র
(১২) শরীরচর্চা
(১৩) ব্যবসা বাণিজ্য হিসাবশাস্ত্র
(১৪) মনস্তত্ত্ব
(১৫) পদার্থবিদ্যা
(১৬) গার্হস্থ্য বিজ্ঞান

এইসব বিষয়াবলী একেবারে সুনির্দিষ্ট বা সুনির্ধারিত করা হয়নি, বরং স্থানীয় অবস্থানুযায়ী বা চাহিদা অনুযায়ী এর হেরফের ঘটানোর স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীরা যে কোনো তিনটি ঐচ্ছিক বিষয় নিতে পারে, বেশিও নিতে পারে।

## বৃত্তিমুখী পাঠক্রম

এই পাঠক্রমে ভাষাগোষ্ঠীর জন্য ১৫ % ভাগ সময়, সাধারণ ভিত্তিভূমির শিক্ষার জন্য ১৫% ভাগ সময় এবং ঐচ্ছিক বিষয়ের জন্য ৭০% ভাগ সময় ধরা হয়েছে। একটি ভাষা শিক্ষাই হবে আবশ্যিক এবং এর বিষয়বস্তু বা উপাদান হবে বৃত্তিমুখী ধরনের। সাধারণ ভিত্তিভূমির শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীকে জীবন ও ইতিহাস সম্পর্কে একটা বিস্তৃত ধরনের পশ্চাদ্‌ভূমি তৈরি করে দেওয়া হবে যার ফলে শিক্ষার্থী একটা দূর বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে তার নির্বাচিত বিষয় ও বিষয়ান্তর জ্ঞানের ক্ষেত্রে নিজেকে তৈরি করতে হবে। বৃত্তিমূলক শিক্ষার যেটুকু ফাঁকফোকর তা ভরাট করে দেবে এই সাধারণ ভিত্তিমূলক শিক্ষা, সে জানবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ইতিহাস, ভারতের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য, বৃত্তির সঙ্গে সংযুক্ত দেশ-বিদেশের আধুনিক প্রবণতা ইত্যাদি। গ্রামীণ অর্থনৈতিক পুণর্গঠনের দিকে

লক্ষ্য রেখে বৃত্তিমূলক ও সাধারণ শিক্ষার উপাদান নির্বাচন করতে হবে। দশম শ্রেণীর পর +২ শ্রেণীতে এই শিক্ষা দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, তার প্রথম ভাগ সকল শিক্ষার্থীদের জন্যই, দ্বিতীয় ভাগ বিশেষভাবে নির্বাচিত শিক্ষার্থীর নিজ বৃত্তিমূলক ক্ষেত্রের জন্য নির্ধারিত। প্রথমাংশে থাকবে গান্ধীদর্শন, জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষি, গ্রামীণ পুণর্গঠন, শহরের বস্তি উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, পরিচ্ছন্নতা। দ্বিতীয়াংশে নয়টি ঐচ্ছিক তালিকা থেকে যে কোনো একটি নির্বাচন করতে হবে। এই তালিকায় রাখা হয়েছে—(১) কুটীর শিল্প (২) প্রচেষ্টা ও সংগঠন (৩) সমবায় ও ঋণ প্রকল্প (৪) বাজার (৫) বিক্রয় কেন্দ্র (৬) বেকার, আধাবেকার ও ভারতে মনুষ্যশক্তির ব্যবহার (৭) মানবিক সম্পর্কসমূহ (৮) পৃথিবীর নানা প্রবণতা ও পরিবর্তনশীলতা (৯) পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন। এই ঐচ্ছিক বিষয়ের অন্তত পঞ্চাশভাগ সময় ব্যয় করতে হবে হাতেকলমের কাজে। গ্রামীণ অর্থনীতি, গ্রামীণ পুণর্গঠন, কৃষি, বেকার সমস্যার সমাধান লক্ষ্য রেখেই এই পাঠক্রম। যে সব পাঠক্রম দুবছরের মেয়াদের পূর্বেই শেষ করা যায়, সেগুলি বিধিবহির্ভূত কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে অব্যাহত রাখা যাবে। কৃষিখামার ও কৃষি-জীবনকে শিক্ষার অপরিহার্য প্রয়োজন হিসেবে ধরে নিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা এবং আধুনিক জ্ঞানের ব্যবহারে গ্রামীণ জীবনকে চাঙ্গা করার জন্য এই কর্মসূচীর প্রবর্তন। কৃষিমুখী বৃত্তিশিক্ষা ছাড়াও অ-কৃষি বৃত্তিমুখী শিক্ষার ও নানা অলিন্দের বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন জাতীয় পর্যালোচনা কমিটি।

আপাতদৃষ্টিতে মাধ্যমিক শিক্ষার উচ্চ পর্যায়ে যদিও সাধারণ শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার দুই অলিন্দ খুলে দেওয়া হয়েছে কিন্তু তবুও এই দুই গোষ্ঠীকে বিচ্ছিন্নভাবে চিন্তা করা হয় নি। মুদালিয়র কমিশনের প্রবণতামুখী বিষয়তালিকা থেকে এই পরবর্তী চিন্তার একটি সূক্ষ্ম মৌলিক পার্থক্য আছে। বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এবং শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এই স্বাধীনতাই দেওয়া হয়েছে যে, তাঁরা পৃথক পৃথক ভাবে এই দুই অলিন্দ অথবা দুই অলিন্দ একত্রভাবে গ্রহণ করতে পারবে। প্রকৃতপক্ষে তিনটি আদর্শ নির্দেশিকা বিদ্যালয় ও শিক্ষার্থীর কাছে থাকছে—(১) যারা সাধারণ ভিত্তিমূলক শিক্ষা ও ঐচ্ছিক বিষয় নিয়ে অধ্যয়ন করবে (২) যারা বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও ঐচ্ছিক বিষয় নিয়ে অধ্যয়ন করবে এবং (৩) যারা উভয় পাঠক্রম ও ঐচ্ছিক বিষয় নিয়ে অধ্যয়ন করবে। তৃতীয় আদর্শ নির্দেশিকার দিকেই বেশি করে জোর দেওয়া হবে গ্রামাঞ্চলে। বৃত্তিমুখী এই শিক্ষাক্রম

এইখানেই শেষ নয়। সাধারণ ভিত্তির শিক্ষাও তাই। পরবর্তী স্তরের সাধারণ ও বিশেষ শিক্ষার অব্যাহত ধারা লক্ষ্য রেখে ১০+২ শ্রেণী সম্বলিত এই শিক্ষা পরিকল্পনা পরিবর্তিত পটভূমিকায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য গৃহীত হয়েছে, যা পূর্ব প্রচলিত রাধাকৃষ্ণণ কমিশন ও মুদালিয়র কমিশনের বিষয়সূচী তালিকা প্রণয়নের পদ্ধতির একেবারে বিপরীত বলা যায়।

শ্রীমন্নারায়ণ এক সময় বলেছিলেন—'মাধ্যমিক শিক্ষা কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষা বা শিক্ষার মধ্য দিয়ে কাজের হওয়া উচিত। কি দরকাব শিক্ষার্থীদের শুধুমাত্র জ্ঞানের কিছু তথ্য শিক্ষা দেওয়া যার সাহায্যে তারা জীবনের কোনো সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করতে পারে না। সেইজন্য মাধ্যমিক শিক্ষায় এমন কর্মকেন্দ্রিক যন্ত্রশালা তৈরি করা দরকার যেখানে শিক্ষার্থীরা হাতেকলমে কিছু শিখতে পারে এমন কি তাদের তৈরি জিনিস বাজারে পাঠিয়ে কিছু রোজগার করে নিতে পারে। যে দেশে জনগণস্তরে ব্যাপক নিরক্ষরতা, দারিদ্র্য ও বুভুক্ষা, শিক্ষিত লোকেরা বেকার, অর্ধবেকার, ধনবৈষম্যের দারুণ দাপট, সেখানে জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়টাকে জীবন-পর্বের প্রকৃত প্রস্তুতিপর্ব করে তোলাই হবে শিক্ষাক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো মূলধনের ব্যবহার, এই কথাই আমরা বলতে চাই। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও প্রণালীর উদ্দেশ্য প্রণয়ন করা করা যেতে পাবে ত্রিবিধ উপায়ে—এক, শিক্ষার কাঠামো এমনভাবে সুবিন্যস্ত হবে যার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী প্রকৃত গণতান্ত্রিক নাগরিকত্বের অভ্যাস, ধ্যানধারণা, কর্মক্ষমতা, দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করবে এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গি হবে নিঃসন্দেহে জাতীয় স্তরের, ধর্ম-নিরপেক্ষ, বিজ্ঞানসম্মত, প্রগতিশীল, যুক্তিবাদী, জাতীয় উন্নয়নের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। দুই, মাধ্যমিক শিক্ষা হবে এমন এক বাস্তব হাতিয়ার যার সাহায্যে সমাজজীবনের ফলপ্রসূ উৎপাদনাত্মক যোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে এবং জাতীয় সম্পদের প্রকৃত ব্যবহারের ফলে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে। তিন, মাধ্যমিক শিক্ষা এমন ধরনের হবে তা যেন যান্ত্রিক মানুষ তৈরি করবে না বা জ্ঞানের সংকীর্ণতায় বিচ্ছিন্ন মানুষ গড়ে তুলবে না বরং গড়ে তুলবে সংস্কৃতিমুখী এমন মানুষ যে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির রসায়ন করে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নব জাগরণের নতুন স্রষ্টা হবে।

এই উদ্দেশ্যগুলি পূরণের জন্য সর্বতোমুখী বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ধর্মী গ্রামীণ উন্নয়ন-

ধর্মী অর্থ নৈতিক ভিত্তিভূমিতে সুপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষার সাধারণ ও বৃত্তিমূখী মিশ্র প্রক্রিয়ায় মাধ্যমিক শিক্ষাকে নূতন করে রূপায়ণ করা সত্যই শিক্ষাক্ষেত্রে এবং জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক কাজ। এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে শিক্ষাদান প্রণালী, মূল্যায়ন, পরীক্ষা পদ্ধতি সবকিছুকেই একেবারে নতুনভাবে বিন্যাস করতে হবে—তবেই আমরা প্রকৃত প্রগতিশীল মাধ্যমিক শিক্ষাকে বাস্তবে রূপায়িত হতে দেখবো।

॥ ৫ ॥

## উচ্চতর শিক্ষা

উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রেও সর্বভারতীয় স্তরে কিভাবে একটা ঐক্যবোধ আনা যায়, এমন কি 'কমন সিস্টেম' গড়ে তোলা যায় সেজন্য শিক্ষাবিদেরা অনেক চিন্তাভাবনা করেছেন। কোঠারি কমিশন এই দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে 'স্বয়ংচালিত কলেজ' গঠনের সুপারিশ করেছেন। ঐক্যবোধ বজায় রেখে গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্বাধীন সুযোগের সদ্‌ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য রেখে 'কমন সিস্টেম' ও 'অটোনোমাস' পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে। এই একই নীতি মাধ্যমিক বিদ্যালয়েণ ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে।

কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পর্ষদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক পর্যায়ে তিন বছরের ডিগ্রী কোর্সকে ভাগ করতে চেয়েছেন দুভাবে—দুবছরের পাশকোর্স এবং তিনবছরের অনার্স কোর্স। তবে এজাতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকেই স্বাধীনভাবে বিবেচনা করার কথা বলা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা এমন হবে তা যেন নিছক সাদা কলারের চাকরীর উমেদারীর ব্যাপার না হয়। জোর দিতে হবে পেশাদারী শিক্ষার উপরে এবং তাকে গড়ে তুলতে হবে জাতীয় উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর সঙ্গে সংগতি রেখে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যেন এক বিশেষ ধরনের বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রশিক্ষণ লাভ করতে পারেন। আমাদের দেশে একদিকে সীমাহীন শিক্ষিত বেকার, অন্যদিকে বহু উন্নয়ন সমাপ্ত হয় না যোগ্য লোকের অভাবে। এর কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে উন্নয়নশীল প্রোজেক্টের সমন্বয় ঠিকমতো নেই। এই ফাঁক অবশ্যই পূরণ করতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে শিক্ষার্থী ভর্তির ব্যাপারটি বাছাই-পদ্ধতিতে হওয়া দরকার। পাঠাগার, ল্যাবরেটারী, উপযুক্ত শিক্ষক সংখ্যার সঙ্গে সংগতি রেখে ভর্তির ঝাড়াই-বাছাই পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। নতুন মাধ্যমিক শিক্ষার ফলে শতকরা পঞ্চাশ জন শিক্ষার্থী আত্মনির্ভরশীল পথে বা অন্য কোনোভাবে কোনো না কোনো জীবিকার দিকে যাবে—সুতরাং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় যাদের নেওয়া হবে তারা যেন বিশেষভাবে উপযুক্ত শিক্ষার্থী হয়। উপযুক্ত যোগ্যতা ও দক্ষতা বা পারদর্শিতা যাচাই করে তবেই কলেজে শিক্ষার্থীদের নেওয়া উচিত। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে তো এ ব্যাপারে আরো কঠোরভাবে নির্বাচনী পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত। দেশের প্রকৃত যোগ্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বিশেষজ্ঞের চাহিদা মতো শিক্ষার্থীদের সুযোগ সুবিধা দেওয়া উচিত, এমন কি এজন্য অটোনোমাস পোস্ট-পোস্ট গ্র্যাজুয়েট রিসার্চ ট্রেনিং সেণ্টার খোলা দরকার। অন্যথা এই দরিদ্র দেশে উচ্চশিক্ষার নামে বিলাসিতা চালিয়ে এবং পরিশেষে বিদেশে মস্তিষ্ক পাচার করে দেওয়ার ব্যবস্থা করে কোনো লাভ নেই। জাতীয় স্বার্থের দিকে তাকিয়ে এবং দেশ গঠনের প্রকৃত চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি মান্য করে উচ্চশিক্ষার গুণগত উৎকর্ষের দিকে নজর দিতে হবে—যেখানে মেধা, প্রতিভা, যোগ্যতা, দক্ষতারই মূল্য থাকবে, ধনবৈষম্যের উৎকেন্দ্রিকতা নয়। দেশের অগণিত দরিদ্র ও অবহেলিত শ্রেণীর মধ্যে প্রতিভা যাতে অবহেলিত না হয়, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও সমান সুযোগ ও অধিকারের নীতি অনুসরণ করতে হবে।

**উচ্চশিক্ষার শিক্ষাদানের মাধ্যম মাতৃভাষার মাধ্যমেই হওয়া সমীচীন (বিশেষ অসুবিধার ক্ষেত্রে তা আঞ্চলিক ভাষা হিসেবে গ্রহণযোগ্য) এবং সেইভাবে উন্নতমানের সাধারণ, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, কৃষি প্রভৃতি বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক রচিত হওয়া দরকার। যতদিন না মাতৃভাষায় উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক রচিত হচ্ছে এবং বিজ্ঞান প্রযুক্তি প্রভৃতি বিষয়ে উপযুক্ত প্রতিশব্দ তৈরি হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত উচ্চশিক্ষার বিশেষ ক্ষেত্রগুলিতে ইংরেজি পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করা যেতে পারে এবং ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনা ও পরীক্ষা মূল্যায়ন চলতে পারে কিন্তু তবুও লক্ষ্য রাখতে হবে কিভাবে দ্রুত মাতৃভাষার মাধ্যমেই উচ্চ-শিক্ষা অর্জন করা যায়। উচ্চশিক্ষাস্তরে ভাষাসূত্র হিসেবে গ্রহণ করা উচিত**

দ্বি-ভাষা সূত্র—একটি দেশি ভাষা, অন্যটি আন্তর্জাতিক ভাষা। দ্বি-ভাষার উপরে যদি কেউ কোনো সংযোগ রক্ষাকারী অপর ভাষা শিক্ষা করে তাহলে সে জিনিসটি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় সূচক হবে কিন্তু সেজন্য মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ এবং সহায়ক হিসেবে কোনো আন্তর্জাতিক ভাষার সাহায্য নেওয়া আদৌ অন্তরায় হবে না। কলা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি প্রভৃতি বিদ্যার আন্তর্জাতিক ব্যবহৃত প্রতিশব্দের বিকল্প না পেলে বিদেশী প্রতিশব্দকেই মাতৃভাষায় হরফে গ্রহণ করা যেতে পারে। যতদিন না কোনো ভারতীয় ভাষা যথার্থভাবে উচ্চমানের এবং সর্বজন গ্রাহ্য সংযোগ রক্ষাকারী ভাষা হিসেবে গড়ে ওঠে, ততদিন সরকারী যোগসূত্রের ভাষা হিসেবে ইংরেজি এবং হিন্দী ব্যবহৃত হতে পারে। নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ভারতের মতো বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশে ধর্মনিরপেক্ষ উদারতা নিয়ে বিভিন্ন ধর্মের শ্রেষ্ঠতত্ত্বের সমালোচনাধর্মী তুলনা উচ্চশিক্ষার বিষয়বস্তু হতে পারে। রাধাকৃষ্ণণ ও কোঠারি কমিশন স্কুল-কলেজে পর্যায়ক্রমে নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষাদানের পরামর্শ দিয়েছিলেন।

প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির যতোরকমের ত্রুটি আছে তাই শিক্ষাক্ষেত্রে পরিস্ফুট হয়েছে—দেখা গেছে শিক্ষা ব্যাপারটাই যেন এক ঘেঁয়ে, মুখস্থধর্মী, শরীর-মন-আত্মার উপর এক প্রচণ্ড পীড়ন, প্রচণ্ড জীবন ও জীবিকার প্রতিযোগিতায় যেন-তেন-প্রকারেণ ডিগ্রী নেবার মোহ, ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে নিদারুণ বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয়। এর সংস্কার সাধনের জন্য গ্রেড প্রথা চালু করাতেও কোনো ফল হবে না—আসলে দরকার সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থারই নতুন করে পুনর্বিন্যাস। একেবারে তলা থেকে উপর পর্যন্ত শিক্ষাক্ষেত্রে বিপুল রকমের বৈপ্লবিক পরিবর্তন চাই। রাজনৈতিক কারণে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা না করে শিক্ষাগত চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে জাতীয় নীতিতে নতুন নতুন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা-কেন্দ্র খোলা দরকার। উচ্চশিক্ষার জন্য বিপুল অর্থব্যয় করা হয় অথচ জনগণস্তরের ন্যূনতম শিক্ষাগত চাহিদা মেটানোর জন্য সেই অনুপাতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক ক্ষেত্রে ব্যয় করা হয় না। যদিও বিশেষজ্ঞ শিক্ষণের বিশেষ প্রয়োজনীয়তার পেছনে অর্থব্যয়েরও যুক্তি আছে, তেমনি দেখতে হবে সার্বজনীন শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য উপযুক্তভাবে সরকারী অর্থব্যয়। গণতান্ত্রিক দেশে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ তৈরি এবং নিম্ন পর্যায়ের শিক্ষায় সার্বজনীন স্বাক্ষরতা ও বৃত্তিমুখী শিক্ষার গণতন্ত্রীকরণ সমস্যাকে খুব পরিকল্পিত ভাবে বিন্যাস করতে

হবে যার ফলে যেন জাতির শক্তির অপচয় না হয় এবং দেশে শ্রেণী-বৈষম্য সৃষ্টি না হয়।

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য কাজ হবে সমাজ-সেবা প্রকল্প—শিক্ষার পাঠক্রমেও এই বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হওয়া চাই। এর দ্বারা শিক্ষার্থীদের চরিত্রগঠন, নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতা এবং সামাজিক দায়দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি পেতে পারে। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রযুক্তিধর্মী বিদ্যায়তনের শিক্ষার্থীদের তাই জাতীয় নানা-রকমের সেবা প্রকল্পে অংশ নিয়ে দেশ গঠনে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করতে হবে, মেধা দিয়ে, কর্মশক্তি দিয়ে এবং সেবা দিয়ে। দেশের বিপুলতম শিক্ষার্থীদের শিক্ষার গুণগত আওতায় আনার জন্য যুক্তরাজ্যের মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, আমেরিকার বিধি বহির্ভূত শিক্ষা, টেলিভিসিন, রেডিও প্রভৃতির ব্যবহার, করেসপণ্ডেন্স্ কোস চালু করা ইত্যাদির মাধ্যমে উচ্চশিক্ষাকেও প্রসারিত করে দিতে হবে এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্বাভাবিক ভীড় কমানোর জন্য বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বাস্তবক্ষেত্রে অর্জিত সামাজিক মূল্যকে যোগ্যতার নিরিখ বলে গণ্য করতে হবে। উচ্চশিক্ষাকে কেবলমাত্র একমুখী না করে তাকে বহুমুখী ধারায় বিস্তৃত করে দিতে হবে এবং তাকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে লাভজনক ও জাতিগঠনে সহায়ক হিসেবে কাজে লাগাতে হবে। এইজন্য উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষাকেই খুব মজবুতভাবে গড়ে তুলতে হবে। কেননা, এই পর্যায়ে দেশের বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর শিক্ষা-সময়কালের বিরতি ঘটে। উদ্দেশ্যহীন উচ্চশিক্ষার পথ সংকুচিত করে জাতির সমস্যার দিকে তাকিয়ে ১০+২+৩ ধরনের শিক্ষা কাঠামো গ্রহণ করার কথা সেইজন্য জোর দিয়েছেন সরকার। তবে ভবিষ্যতের স্থিতিশীল রূপ দাঁড়াতে পারে ৮ বছরের সার্বজনীন বাধ্যতামূলক শিক্ষা, ৪ বছরের উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা এবং দুই বছরের পাশ ও তিনবছরের অনার্স স্তরের কলেজীয় শিক্ষা।

## ॥ ৬ ॥

## স্বাক্ষরতার শিক্ষা

অ্যাডামস্-এর রিপোর্টে বাংলা দেশে একলক্ষ পাঠশালার অস্তিত্ব এবং প্রতি ৬০ জন শিক্ষার্থী পিছু একটি পাঠশালার যে বিবরণ পাওয়া

যায়, গুণগত উৎকর্ষের দিকে তা উৎকৃষ্ট না হলেও এদেশের শিক্ষাদীক্ষা সংস্কৃতির বিকাশের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ সন্দেহ নেই। পরবর্তী শতাব্দীতেও যে প্রাথমিক শিক্ষার লেখাপড়া অঙ্ক কষার সামান্যটুকু শিক্ষা ভালোভাবে হয় নি সে তথ্য জানা যায় ১৯৪৪-৪৫ সালের সরকারী রিপোর্টে। ইংরেজ রাজত্বকালে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার হয়েছিল নামমাত্র।

'রাশিয়ার চিঠি'তে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন, মাত্র কয়েক বছরের চেষ্টায় সেখানে নিরক্ষরতার অভিশাপ দূর হয়েছিল। ইংলণ্ড, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশে নিরক্ষরতার অভিশাপ দূর হয়েছে অনেক আগেই। মাতৃভাষাই সেখানে শিক্ষার বাহন, সাক্ষরতার মাপকাঠি। আমাদের দেশের কোন গৃহবধূ মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জন করলেও ইংরেজি জানা না থাকলে তাকে শিক্ষিত বলতে আমরা দ্বিধা করে এসেছি।

ভারতের মতো পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো গণতান্ত্রিক দেশে নিরক্ষরতার অভিশাপ দূর করার জন্য জনগণস্তরে ব্যাপক কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে কোনো সার্বিক চেষ্টা হয় নি। অথচ শিক্ষার চিন্তা-চেতনা এ দেশে কম নেই। গ্রামে গঞ্জে শহরে-বন্দরে এদেশের মানুষের বুদ্ধি বৃত্তি, বিবেচনা বোধ, সঠিক সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা, সাংস্কৃতিক জ্ঞান খুবই গভীর—খুব সাধারণ লোকও হিসাব-পত্র ভালোই বোঝে, জাগতিক সমস্যার সমাধানে খুবই সজ্ঞান, শুধু নাম লেখা এবং একটু পড়া ও অঙ্ক কষা হাতেকলমে জেনে নিলে এদেশের জনগণের শতকরা ১০০ ভাগকে শিক্ষিত বলে গণ্য করা কঠিন কাজ নয়। আসলে দূরদর্শিতার অভাবে এই জিনিস অবহেলিত হয়ে আছে।

সরকারী পরিসংখ্যানে সাক্ষর ও নিরক্ষরের যে সংখ্যা বেরোয় তা নির্ভুল নয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর অন্তত ১ কিলোমিটার এলাকায় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় অবশ্যই হয়েছে। প্রত্যেক প্রাথমিক বিদ্যালয়কেই জনগণের সাক্ষরতা কেন্দ্র অতি সহজেই রূপান্তরিত করা যায়। একটু আর্থিক সাহায্য পেলে এবং দূরদর্শী নীতিতে কাজ করলে প্রাথমিক শিক্ষকরাই সান্ধ্য বিভাগে আংশিক কাজ করে সাক্ষরতার পর্ব চুকিয়ে দিতে পারেন অল্প সময়ে। প্রাথমিক শিক্ষাকে যেমন সার্বজনীন, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা দরকার হয়েছে, বয়স্ক শিক্ষাকেও বাধ্যতামূলক, অবৈতনিক

ও সার্বজনীন করতে হবে। দেশে অসংখ্য রাজনৈতিক দলের কর্মী, সমাজসেবক, পঞ্চায়েত প্রভৃতিদের এ বিষয়ে কাজে লাগানো যায়। পরিবর্তিত সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক পটভূমিকায় দেশের প্রত্যেকটি এলাকা সমাজ সচেতন এবং আধুনিক সমস্যার মুখোমুখি। নিরক্ষরতার পাপাচার থেকে জনগণের সার্বিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা সর্বত্রই তীব্রভাবে অনুভূত। লোক-শিক্ষার যে সব উপাদান আছে—সিনেমা, থিয়েটার, যাত্রা, পুতুল নাচ, প্রদর্শনী, ম্যাজিক, সার্কাস, সভাসমিতি, উৎসব, খেলা, লোকরঞ্জন প্রভৃতি প্রতিটি কাজে জনগণের মধ্যে বেশ আগ্রহ, উৎসাহ ও চেতনার সঞ্চার হয়। জনগণ এইসব থেকে বেশ আগ্রহের সঙ্গে যে সব শিক্ষা ও উপাদান সংগ্রহ করছে তার নীট ফল তাদের জীবন ও সমাজসমস্যা সম্পর্কে শুধু কৌতূহল সৃষ্টি করেনি। তারা বেশ যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে এবং কোন্‌টা ন্যায় কোন্‌টা অন্যায় এই বোধ তাদের মধ্যে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বরং একদল শিক্ষাভিমানী জীবনধারণের জটিলতার ঘুরপাকে বিধ্বস্ত হয়ে আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর হয়ে উঠেছে এবং জনগণকে হেয় মনে করে তার থেকে তফাতে থাকার বেড়াজাল সৃষ্টি করছে।

ব্যাভিচার, অনাচার ভ্রষ্টাচার, চুরিজুচ্চুরি, ঘুষ, বদমায়েসি, নিকৃষ্ট ধরনের দলবাজি এইসব ক্ষেত্রে সমাজের সবচেয়ে তথাকথিত প্রতিষ্ঠালব্ধ বা প্রতিষ্ঠাকামী উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা ক্রিয়াশীল। এই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা সমস্যা হিসেবে সার্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রশ্নের সঙ্গে দেশের বৃহত্তম জনগণের সাক্ষরতা প্রশ্ন বিবেচনা করতে হবে। একটি সমস্যা আরেকটির সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সাক্ষরতাকে যে কোনো গণতান্ত্রিক সমাজের ব্যক্তিত্বের নিরিখ বলে গণ্য করতে হবে এবং সেজন্য নিরক্ষরতা দূরীকরণের অভিযানে চাই নিরলস সংগ্রাম। জনগণকে তৈরি করতে হবে যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের মূল্য বোধের চেতনায়। তারা যাতে সক্রিয়ভাবে জাতিগঠনের উদ্বুদ্ধ হয় সেই ভাবে প্রেরণা সৃষ্টি করতে হবে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে যারা অনগ্রসর, তাদের সাক্ষরতার দক্ষতা অর্জনের জন্য সম্ভাব্য সবরকম ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে জাতীয়

নীতি হিসেবে। বিদ্যালয়ের গতানুগতিক শিক্ষাদানের ধাঁচে এ জিনিস হবে না, চাই এমন সাক্ষরতার কর্মসূচী যার ভেতর দিয়ে জনগণের নিজের ভেতর থেকে আসে অনুপ্রেরণা। এজন্য কথোপকথন, লোক-কর্মসূচী, নানারকম লোকরঞ্জন অনুষ্ঠানের সাহায্য নিতে হবে। বয়স্ক শিক্ষার কর্মসূচীতে শুধু নিছক সাক্ষরতার ব্যাপার-স্যাপার থাকবে না। দেখতে হবে কিভাবে তাদের পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের চাহিদা মেটানো যায়। সময়, শিক্ষাসূচীর মেয়াদ, স্থান, শিক্ষার উপাদান, ইত্যাদি অবশ্যই হবে কড়াকড়ি নিয়মের বাইরের জিনিস। তবে বয়স্ক শিক্ষা পরিচালনার ব্যবস্থাপনাটি হবে নিঁখুত, পরিচ্ছন্ন অথচ উদার।

কেন্দ্রীয় সরকার বয়স্ক শিক্ষার ব্যাপারে জাতীয় বয়স্ক শিক্ষা পর্ষদ গঠন করেছেন—রাজ্যস্তরেও অনুরূপ পর্ষদ প্রয়োজন। যেহেতু এই কর্মসূচীর রূপায়ণ ব্যাপারটি জনগণস্তরের জিনিস, সেজন্য দরকার বিকেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা। তবে সেই বিকেন্দ্রীভূত ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় স্তর থেকে পর্যায়ক্রমে জনগণের স্তর পর্যন্ত সমন্বয় চাই। ৭১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যায়, দেশের প্রায় দশ কোটি লোক (১৫ থেকে ৩৫ বছর) নিরক্ষর এবং ১৪ বছর পর্যন্ত বয়ঃসীমায় নিরক্ষরের সংখ্যা প্রায় বিশ কোটি। সুতরাং এই বিরাট সংখ্যক নিরক্ষরকে স্বাক্ষর করতে হলে চাই দুর্দান্ত রকমের জনগণ পর্যায়ের আন্দোলন জাতীয় কর্মসূচী। এই বিশাল বিপুল কাজের লোকবল, অর্থব্যয় ও অন্যান্য সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসতে হবে সরকার, পঞ্চায়েত, শিল্প ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতিভূ থেকে শুরু করে মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, স্বায়ত্তশাসন সংস্থা, সেবা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিকে। পরীক্ষামূলকভাবে সারা পৃথিবীর সাক্ষরতা কর্মসূচী পালন করার অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়, খুব সুবিন্যস্তভাবে জনগণস্তরে কাজ করলে ফল ভালোই পাওয়া যাবে। এজন্য সারা দেশে একটা অনুকূল হাওয়া তৈরি করা দরকার। বয়স্ক শিক্ষাকে সর্বোচ্চ স্থান দেবার দাবী সর্বত্রই সোচ্চার। একে পরিপূর্ণ রূপ দিতে হলে সর্বস্তরের জননেতা, কৃষক ও শ্রমিক সংগঠন, রাজনৈতিক ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র, ব্যবসায়ী প্রভৃতি সকলকে কাজে লাগিয়ে, জন-মাধ্যমের বিষয়গুলি যেমন রেডিও, টি. ভি., ফিল্ম, সংবাদপত্র, প্রচার পুস্তিকা, বিজ্ঞাপন প্রভৃতির সদ্ব্যবহার করে বয়স্ক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম সম্পর্কে সারা

দেশে এক বিরাট গণচেতনা সৃষ্টি করতে হবে। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিশ্ব-সাক্ষরতা দিবস পালন করা দরকার।

বয়স্ক শিক্ষার কর্মসূচীতে একটা বড়ো সমস্যা এই যে, শিক্ষার উৎসাহ ও উদ্দীপনাকে বেশিদিন ধরে রাখা যায় না। নারী ও অনগ্রসর শ্রেণীর ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটি আরো প্রকট। এইজন্য বয়স্ক শিক্ষার কর্মসূচীতে উৎসাহ-উদ্দীপনার কাজকর্ম অব্যাহত ধারায় হওয়া উচিত। আন্দোলনে ভাঁটা পড়লে তাকে আবার জাগিয়ে তোলা কঠিন হয়।

বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচীকে স্থানীয় উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর সঙ্গেই সংযুক্ত করে দিতে হবে। দেশের পরিকল্পনার সঙ্গে জীবন ও জীবিকার কাজের ভেতর দিয়েই এই শিক্ষাকে এমন উৎসাহ ও উদ্দীপনার ব্যাপার করে তুলতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা আশার আলোকে উদ্দীপিত হয়, প্রেরণা পায়। সেইজন্য সুসংগঠিত গ্রাম্য উন্নয়ন কর্মসূচীতে বা তপশীলী এলাকার উন্নয়ন কর্মসূচীতে বা অনুরূপভাবে এই বয়স্ক শিক্ষার কর্মসূচীকে এমনভাবে জুড়ে দিতে হবে যা একটা ঘনীভূত এলাকার সার্বিক উন্নতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারে।

বয়স্ক শিক্ষাকে সার্থক করার জন্য জাতীয় ও রাজ্যস্তরে পর্যায়ক্রমে উপাদান কার্যকরী করার জন্য বিশেষভাবে নিযুক্ত কর্মী চাই। এই উপাদান কার্যকরী করার ব্যাপারটি একেবারে তলায় কর্মসূচী রূপান্তরিত করার স্তর পর্যন্ত যেন বিস্তৃত হয়। এজন্য চাই উপযুক্ত মানের মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে তৈরি শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের মাল-মশলা। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত একদল লোক বয়স্ক শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে উপাদান সরবরাহকারী, তদারকী, শিক্ষণ, গবেষণা প্রভৃতি কাজে সততই নিরত থাকবেন। কাজকর্মের উপযুক্ত পর্যালোচনা, মূল্যায়ন, সঠিক রিপোর্ট বা তথ্য সংগ্রহ প্রভৃতি কাজ খুব ভালোভাবে হওয়া চাই। বয়স্ক শিক্ষাদান কেন্দ্রে যাঁরা শিক্ষাদান করবেন তাঁরা বিদ্যালয়ের শিক্ষক, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, গ্রাম্য যুবক, অবসরপ্রাপ্ত বিভিন্ন সংস্থার কর্মচারী, সরকারী পর্যায়ের নানা স্তরের কর্মচারী, গ্রামসেবক প্রভৃতি হতে পারেন। নেহেরু যুবককেন্দ্রের মাধ্যমে বয়স্ক শিক্ষাকে রূপ দেবার প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। তবুও, সারা দেশ জুড়ে সংহত কর্মসূচীর মাধ্যমে পেশাদারী একদল ক্যাডার-ভিত্তিক প্রশিক্ষক বাহিনী দরকার। কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়িত্ব নিতে হবে আর্থিক সংস্থানের, রাজ্য সরকারকে নিতে হবে প্রকল্প কার্যকরী করা ও প্রত্যক্ষ তদারকীর

ভার। বয়স্ক শিক্ষার জন্য বরাদ্দ কোনো অর্থকে অন্য কোনো উন্নয়ন প্রকল্পে হস্তান্তরিত করা চলবে না। উপযুক্তভাবে বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচী সমাপ্তির পরবর্তী ফলাফল পর্যালোচনাও অর্জিত শিক্ষা অব্যাহত রাখার জন্য প্রয়াস পযবেক্ষণের ব্যাপারে তীক্ষ্ণ তদারকী দরকার। তা না হলে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেও ফল মিলবে না—ভস্মে ঘি ঢালা হবে মাত্র। বয়স্ক শিক্ষার কর্মসূচী রূপায়ণে ইউনেস্কোর অভিজ্ঞতা থেকে উপাদান আহরণ করতে হবে।

মহামতি গোখেল একসময় বলেছিলেন, জনগণের প্রাথমিক শিক্ষা মানে লেখা আর পড়ার চেয়েও আরো কিছু বেশি জিনিস। জনগণের কাছে এ জিনিস তাদের জীবনযাত্রা মান বৃদ্ধির উপায়, আনন্দ অর্জনের উপায়। এর সাহায্যে প্রত্যেক নাগরিক তার নৈতিক ও বুদ্ধিগত কর্মক্ষমতা বাড়িয়ে নিতে পারে এবং এর দ্বারা জনগণ তাদের বুদ্ধিবৃত্তির যৌথ বিকাশের ধারায় উন্নত হতে পারে। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা আর বয়স্ক শিক্ষা এই অর্থে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলা যেতে পারে। এই দুই কর্মসূচী সমান্তরালভাবে কার্যকরী হওয়া চাই, তা নাহলে অপচয় ও অবরোধের ফলে জাতির শক্তি দুর্বল হয়ে যায়। নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রাথমিক শর্ত সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, তেমনি সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার সার্থকতা বয়স্ক শিক্ষার গুণগত প্রভাবের ফলে।

জাতীয় আন্দোলনের সময় আন্দোলনের অঙ্গ হিসেবে গ্রামে গ্রামে শহরের পাড়ায় পাড়ায় নাইট ইস্কুল, বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র, যুব আখড়া, সমাজসেবা কেন্দ্র প্রভৃতি গড়ে উঠেছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সেই ধারা অব্যাহত রেখে কাজ করার চেষ্টা হয়নি। দেরি হলেও আবার বয়স্কদের জন্য শিক্ষার ব্যাপারে সর্বব্যাপী ও বিস্তৃত কর্মসূচী প্রবর্তনের চেষ্টা চলেছে। গ্রামেগঞ্জে যুব-কল্যাণকেন্দ্র ও অন্যান্য উন্নয়নশীল সংগঠনের অংশ হিসেবে নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। জনগণকে শুধু সাক্ষরতার শিক্ষায় নয়, তাদের উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা হচ্ছে কিভাবে জীবন ও জীবিকার কাজে লাগে এমন সব শিক্ষা উপাদান ব্যবহার করা যায়। গ্রামে তাই দেখা যায়, একজন সাধারণ চাষী চাষবাস সম্পর্কে, আবহাওয়া, বস্তুর মাপ ও ওজন প্রভৃতি সম্পর্কে যে জ্ঞানের পরিচয় দিচ্ছে, এমন কি প্রযুক্তি-বিস্তার নানা ব্যবহারিক শাখায় যে ধরনের কাজ করছে, তা এক লক্ষণীয় পরিবর্তনের সূচনা করেছে। যুগযুগ ধরে যেসব সামাজিক অন্যায় ও

পাপাচার, কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস মানুষকে অন্ধ কূপমণ্ডুক করে রেখেছিল, সেইগুলির উপর জোর আঘাত পড়ছে। ঐতিহ্যের মূল উপাদান ও যুগমূল্যবোধকে একই সূত্রে গাঁথবার এই নতুন যুগের তাগিদে অবক্ষয় ও পুণর্গঠনের পালা শুরু হয়ে গেছে। বেগার প্রথা, পণ প্রথা, মহাজনী ঋণ, ভূমিহীন চাষীর প্রতি নানা বৈষম্য ও অত্যাচার, জাতপাতের বেড়াজাল, ধর্মের নামে পাপাচার, ইত্যাদি নানারকম বৈষম্যমূলক পাপাচারের বিরুদ্ধে জনগণস্তরে যুক্তিসিদ্ধ ও আবেগ বর্জিত এক ধরনের বাস্তববোধ দানা বাঁধছে।

সমাজকল্যাণমূলক কাজে অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়ে, আনন্দজনক নানা কাজের ভেতর দিয়ে জীবনকে অনুভব করার তাগিদ নিয়ে মুদ্রাস্ফীতি ও ধনবৈষম্যের জ্বালা যন্ত্রণা থেকে পরিত্রান পেয়ে কিভাবে আমাদের জনগণ এক নতুন মুক্তির পথে পা দেবে, তার জোর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে। লোকশিক্ষায় সুশিক্ষিত জনগণ সাক্ষর জ্ঞান সহ বাইরের জগতের জ্ঞান নিয়ে বাস্তবমুখী পরিকল্পনায় অংশ নিয়ে যদি এগোতে পারে, তাহলেই জাতির নিরক্ষরতার অভিশাপ দূর হবে, কিন্তু সেইভাবে রাষ্ট্রীয় ও জনগণস্তরে প্রস্তুতি না থাকলে সকল প্রচেষ্টা ও আশা ব্যর্থ হয়ে যাবে, দুঃখ ও ক্ষোভের সীমা-পরিসীমা থাকবে না।

## ॥ ৭ ॥

## সার্বজনীন শিক্ষা

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার জন্য পরাধীন ভারতবর্ষে মহামতি গোখেলের আন্দোলন এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। তিনি চেয়েছিলেন প্রাথমিক শিক্ষা হবে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক এবং সার্বজনীন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, সারা পৃথিবীতে আট বছরের প্রাথমিক শিক্ষা গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিকত্বের প্রধান মাপকাঠি হিসেবে গৃহীত। কিন্তু ইংরেজ সরকার উচ্চশিক্ষার ক্ষতি করে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বিশেষ কিছু করতে চান নি।

শিক্ষা উপর থেকে আপনাআপনি নীচুতে চুইয়ে পড়বে এইরকম এক তত্ত্বের উপর ছিল বিশ্বাস। ইংরেজ নিজের দেশে শিল্প প্রসারে প্রভূত ব্যয় করেন, এদেশে ইংরেজ কর্মচারীদের ক্ষতিপূরণের জন্য ব্যয় করেন, নিজের দেশে

প্রত্যেক শিশুর জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করেন, তখন এদেশের জন্য তাঁদের কোনো গরজ নেই। গোখেলের অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বিল ( ১৯১০-১১ ) সে সময় কোনো আমল পায়নি। ইংরেজের যুক্তি ছিল, শিক্ষার গুণগত ও সংখ্যাগত উন্নতি পর্যায়ক্রমিক না হলে উচ্চশিক্ষার স্বার্থে প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা যাবে না।

অথচ গোখেলের যুক্তি ছিল খুবই জোরালো। তিনি বলেছিলেন, একটি সরকার ভালো কি মন্দ তা তার শিক্ষানীতি দিয়েই বিচার্য। ইংলণ্ডে দশ বছরের মধ্যে, জাপানে বিশ বছরের মধ্যে একশো ভাগ শিক্ষার্থী যখন প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় এসেছে, তখন ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষে মাত্র ১·২% থেকে ১·৯% ভাগ শিক্ষার্থী এসেছে প্রাথমিক শিক্ষার পর্যায়ে। গণশিক্ষার বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠার জন্যে গোখেল চেয়েছিলেন সাধারণ শিক্ষার বুনিয়াদ।

আমরা লক্ষ্য করেছি, ১৯৪৪ সালে স্যার জন সার্জেণ্ট আট বছরের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যকরী করার জন্য চল্লিশ বছর অপেক্ষা করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। অথচ হার্টগ কমিটি সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারে কেন্দ্রীয় সরকারের দায়দায়িত্ব সম্বন্ধে সুস্পষ্ট মতামত দিয়েছিলেন। বাংলাদেশে ১৯৩০ সালে বাংলা ( গ্রাম্য ) প্রাথমিক শিক্ষা বিলে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার কথা বলা হলেও ১৯৩৮ সালের পূর্বে এ জিনিস কোথাও কার্যকরী হয়নি। ১৯১৯ সালে মিউনিসিপ্যাল আইনের আওতায় কিছু নির্বাচিত মিউনিসিপ্যাল এলাকায় অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা চালু হলেও কোনো আশাপ্রদ ফল হয়নি। সার্জেণ্ট রিপোর্টের সময় পর্যন্ত দেশে প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষার্থী ১% ভাগও বাড়েনি।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমাদের সংবিধানের ৪৫ ধারায় বলা হয়েছিল, রাষ্ট্র চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার সুযোগ সকল শিক্ষার্থীদের জন্য করার সর্বতোভাবে চেষ্টা নেবে। এই নির্দেশ মতো, অধিকাংশ রাজ্য নীতিগতভাবে অষ্টম মান পর্যন্ত শিক্ষাকে প্রাথমিক শিক্ষার শেষ ধাপ বলে গ্রহণ করেছেন। জাকির হোসেন কমিটিও অষ্টমমান পর্যন্ত শিক্ষাকে জাতির প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি স্তর হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন।

সৃষ্টিশীল কাজের মধ্য দিয়ে সামাজিক দিক দিয়ে ফলপ্রসূ শিক্ষার মধ্য দিয়ে এই শিক্ষার মান অর্জনের কথা শিক্ষাবিদেরা বলে এসেছেন। প্রচলিত শিক্ষা-

ব্যবস্থা এত বেশি নিষ্ক্রিয় এবং তথ্যভিত্তিক, তার সঙ্গে জীবন ও জীবনচর্চার কোনো যোগ নেই। এক্ষেত্রে প্যাভলো ফ্রেয়ারের মত অনুযায়ী বলা যায়, শিক্ষক শিক্ষাদান করেন এমনভাবে যেন তিনি শিক্ষার্থীদের কিছু জমা দেন জিম্মাদারের মতো আর শিক্ষার্থীরা জিম্মাদারীর তল্পি বয়ে থাকে। উভয়েই পৃথক সত্তা নিয়ে থাকে, কারো সঙ্গে কারো আত্মার যোগ নেই।

এইরকম পরিস্থিতিতে দেশের কোটি কোটি শিক্ষার্থীকে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা দিতে গেলে যে ঝুঁকি, তা কি রাষ্ট্র একাই বহন করবে, না অন্য কোনো বিকল্প ব্যবস্থায় করা যাবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে আর্থিক সহযোগিতা পাওয়ার ক্ষেত্র প্রধানতঃ তিনটি, এক, রাষ্ট্রের সাহায্য, দুই, জনগণের দান ( ধনী সম্প্রদায় সহ ), তিন, বিদ্যালয়ের নিজস্ব শক্তিতে স্বয়ং নির্ভর হওয়া ( গান্ধীজী যা চেয়েছিলেন— কেননা, তাঁর মতে রাষ্ট্রশক্তিকে এ কাজে এগিয়ে দিলে তার ফল দাঁড়ায়, রাষ্ট্রীয় মত শিক্ষার উপর এসে পড়ে। ) শিক্ষার সার্বজনীন লক্ষ্য পূরণে রাষ্ট্র প্রধান ভূমিকা নিলে অর্থনীতির তত্ত্ব অনুযায়ী সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রের খবরদারী আসতে বাধ্য। গ্যালব্রেথ এই কথাই বলেছেন।

আমাদের সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের পেছনে কোন্ দর্শন কাজ করবে, সে প্রশ্ন সত্যই জটিল। রাশিয়ার শিক্ষা মার্কস্‌বাদ লেনিনবাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ইংরাজের শিক্ষা প্রগতিবাদ আর সংরক্ষণবাদের সমন্বয় দর্শন। সামাজিক দর্শনের দিক থেকে ভারতের শিক্ষা কি নিখাদ গান্ধী-দর্শনের অনুগামী হবে? তাত্ত্বিক বিতর্কে না গিয়ে বলা যায়, গান্ধীজীর দর্শন থেকে আত্মনির্ভরশীল, স্বাধীন, বিকেন্দ্রীভূত, শোষণহীন সমাজের চিন্তাধারা অবশ্যই অনুকরণীয়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে দেখা গেছে, প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে গান্ধীজীর নাম ব্যবহৃত হয়েছে বারংবার, কাজে কাজেই বজায় রাখা হয়েছে ইংরেজ সৃষ্ট ধন-বৈষম্যের প্রভাবে তৈরি নানা শ্রেণীর প্রাথমিক বিদ্যালয়। কোনোটা ইংরেজি মাধ্যমের কনভেন্ট স্কুল, কোনোটা রেল, রাষ্ট্র বা মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃক পরিচালিত, কোনোটা স্বয়ংশাসিত সংস্থার অধীন। এন-সি-আর-টির একটি সমীক্ষা থেকে জানা যায়, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ তেমন নেই। অথচ সকলেই একমত, ভারতের মতো গণতান্ত্রিক দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্বার্থেই এখানে দরকার নিরক্ষরতার সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন এবং ৬ থেকে ১৪ বছর বয়স

পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার সার্বজনীন রূপ। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে এবিষয়ে কিছু কাজ হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সমস্যার বিশালত্ব অনুযায়ী সে কাজ সম্পূর্ণ হয়নি।

ইংরেজ আমলের চেয়ে এখন ৯৫ ভাগ গ্রামে এক কিলোমিটার এলাকার মধ্যেই প্রাথমিক ইস্কুল অবশ্যই হয়েছে সর্বত্র। কিন্তু ইস্কুল খুললেই তো হয় না, প্রাথমিক শিক্ষাব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সামনে রেখে শিক্ষার স্বার্থে সুযোগ সুবিধার প্রসার তেমন হয়নি। হয়তো এর কাবণ, মনস্তাত্ত্বিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক এবং অনেকখানি ব্যবস্থাপনাব ত্রুটি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, অভিভাবকরা উদাসীন। শিশুরা ঘবেব কাজেই ব্যতিবস্ত হয়ে পড়ে আর্থিক ও অন্যান্য কারণে। শিক্ষকদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনার অভাব। বিদ্যালয়ের আকর্ষণ যোগ্য কোনো ক্ষমতা নেই। উপাদানের একান্ত অভাব। এইসব সমস্যার সমাধানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান অনেক বেশি তৎপর হয়েছেন সত্যি কথা এবং একথাও সত্যি, কয়েকটি রাজ্য বাদ দিলে ভারতের অনেক প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগটি এখন শতকরা একশো জনের নাগালের ভেতরে। তবুও দেখা যায়, শিক্ষার্থীর একটি ব্যাপক অংশ শিক্ষার আওতার বাইরে রয়ে গেছে, অনেকে বিদ্যালয়ে শিক্ষা অব্যাহত রাখতে পারেনি, যারা বিদ্যালয়ে পাঠ সম্পূর্ণ করেছে তাদের বুনিয়াদও তেমন কিছু নয়—ফলে, এ সব কিছুরই প্রতিফলন এসে পড়ছে পরবর্তী শিক্ষাস্তরেও।

ছয় থেকে এগারো এবং এগারো থেকে চোদ্দ পর্যন্ত বয়সের শিক্ষাকে কিভাবে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা হিসেবে জনগণের শতকরা একশো ভাগ অংশেই চালু করা যায়, কিভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে অপচয় ও অবরুদ্ধভাব দূর করে গ্রামে ও শহরে নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে দরিদ্র ও ধনী মধ্যবিত্ত নির্বিশেষে সকলের জন্য সমান সুযোগের নীতিতে একটি সাধারণ গ্রহণযোগ্য শিক্ষার ভিত্তিভূমির মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাকে একটি নির্দিষ্ট সময়-কালের মধ্যেই সার্বজনীন করা যায়, সে বিষয়ে সরকার ও শিক্ষাবিদ্‌গণ নানা চিন্তাভাবনা করে দেখেছেন এবং এই বিরাট কাজের সমস্যার গুরুত্ব চিন্তা করে বিধিমাফিক শিক্ষার পাশাপাশি বিকল্পভাবে বিধি-বহির্ভূত শিক্ষার

ধারা প্রবর্তনের কথা চিন্তা করেছেন। বিধি-বহির্ভূত শিক্ষার আওতায় ৬ থেকে ১৪ বছরের শিক্ষার্থী শুধু নয়, বয়স্কদেরও কিভাবে টেনে আনা যায় এবং কিভাবে শিক্ষার সার্বজনীনতা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমস্যার বাস্তব জনোচিত সমাধান করা যায়, সেজন্য চিন্তাভাবনা হয়েছে।

বিগত তিরিশ বছর ধরে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির জন্য অনেক চেষ্টা হয়েছে সন্দেহ নেই। বাধ্যতামূলক আইন পাশ, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর হাজিরা পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা, বিদ্যালয় বিহীন এলাকায় বিদ্যালয় স্থাপন, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সাজ সরঞ্জাম শিক্ষার উপাদান সরবরাহ, দুপুরে খাদ্যদানের ব্যবস্থা, বিদ্যালয়কে অনুদান দেওয়া, যাতায়াতের সুবিধার দিকে লক্ষ্য করা, মহিলা শিক্ষক নিয়োগ, পরীক্ষা-ব্যবস্থার সংশোধন, পাঠ্যসূচীকে স্থানীয় অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার ব্যবস্থা, মাতৃভাষাকে শিক্ষার প্রধান ও অপরিহার্য উপাদান বলে গণ্য করা, আংশিক সময়ের শিক্ষার ব্যবস্থা, নানারকম চিত্তাকর্ষক উপাদানের ব্যবহার, খেলাধুলা ও হাতের কাজ উৎসাহিত করা, প্রাক প্রাইমারী বিদ্যালয় সংযুক্ত করা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রাথমিক বিদ্যালয়কে ধীরে ধীরে জুনিয়ার ইস্কুলে উন্নীত করা ইত্যাদি। এইসব টুকিটাকি নানাধরনের কর্মসূচীর ফলে প্রাথমিক শিক্ষার পরিবেশে একটা গুণগত পরিবর্তন আনবার চেষ্টা হয়েছে। তবে প্রয়োজনের তুলনায় এইসব ব্যবস্থাপনা অকিঞ্চিৎকর। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই গুণগত অর্জন বজায় করে রাখা যায়নি। বরং নতুন নতুন সমস্যা এই শিক্ষাকে আরো জটিল করে তুলেছে।

আমাদের সংবিধান রচয়িতারা ৪৫নং অনুচ্ছেদে ৬ থেকে ১৪ বছরের সার্বজনীন ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করার সময়সীমা নির্ধারণ করেছিলেন ১৯৬০ সালকে ভিত্তিবর্ষ ধরে। এর পূর্বে ১৯৪৪ সালের যুদ্ধোত্তর ভারতের শিক্ষা উন্নয়ন পরিকল্পনায় স্যার জন সার্জেন্ট চল্লিশ বছরের মধ্যে প্রায় তিন শ' কোটি টাকা ব্যয়ে সার্বজনীন শিক্ষাকে বাস্তবমণ্ডিত করার সুপারিশ করেছিলেন। মহামতি গোখেল, পারুলেকার প্রভৃতির চিন্তাধারার সঙ্গে স্যার জন সার্জেন্টের পরিকল্পনা মিশিয়ে নিয়ে সংবিধানের বিশেষজ্ঞরা বি জি খেরের পরামর্শ মতো ১৯৬০ সালের মধ্যে ৬ থেকে ১৪ বছরের প্রাথমিক শিক্ষার সার্বজনীন পরিকল্পনা মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এই লক্ষ্য মাত্রা অর্জন করা যায়নি। ৬ থেকে ১৪ বছরের

শিক্ষার্থীদের অর্ধেক অংশও এই শিক্ষার আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। কেন এটা সম্ভব হয়নি তার কারণ অনুসন্ধান করে দেখা হচ্ছে। কোথাও না কোথাও পরিকল্পনার ত্রুটি রয়ে গেছে আর অভাব রয়ে গেছে এই শিক্ষার জন্য দরাজ হাতে সরকারী অর্থব্যয়ের। শিক্ষাব জন্য ৩% ভাগ অর্থও জাতীয় তহবিল থেকে ব্যয় করা হয়নি। এই কার্পণ্য ও দৈন্য উদাসীনতা ও অকর্মণ্যতার এক জাজ্বল্য প্রমাণ।

কোঠারি কমিশন শিক্ষার ব্যয় সম্পর্কে কৃচ্ছ্র সাধন করার অনেক সুপারিশ করেছিলেন। তবুও বাধ্যতামূলক সার্বজনীন শিক্ষার জন্য চাই প্রচুর অর্থ সম্পদ। ১৯৬৬ থেকে ১৯৪৮ সালের মধ্যে জাতীয় আয় দ্বিগুণ ধরে নিলেও এবং শিক্ষা খাতে ব্যয়বরাদ্দ দ্বিগুণ হলেও ( ৬% ) সমীক্ষায় দেখা গেছে তিন কোটির চেয়েও বেশি শিক্ষার্থীকে এই শিক্ষার আওতায় আনা সহজ হবে না, তারা বাইরে থেকে যাবে। এই ধরনের আকাশচুম্বী সমস্যার বিকল্প কি হতে পারে সেইজন্য প্রশাসক, শিক্ষাবিদ্ সকলেরই মাথা ব্যথার অন্ত নেই। একটা কিছু না করলেও নয়।

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মান হ্রাসের অন্যতম কারণ এই ঢিলে-ঢালা প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। প্রাথমিক শিক্ষার মান অত্যন্ত নিচুস্তরের—না আছে পর্যাপ্ত পরিমাণ সাজ সরঞ্জাম, বিদ্যালয়ের চেহারার উন্নতি, না আছে শিক্ষকদের গুণগত উৎকর্ষ, না আছে জনগণের মধ্যে সত্যিকারের উৎসাহ ও উদ্দীপনা। গ্রামীণ পরিকল্পনার সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষাকে অত্যাবশ্যক-ভাবে জুড়ে দেবার ঐকান্তিক প্রয়াসেরও অভাব। জনগণের আন্তরিকতা নেই, অধিকাংশ অভিভাবকের শিক্ষার প্রতি অনীহা বা নির্লিপ্ত মনোভাব, চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করে মানুষ এই ধরনের মনোভাব সম্পন্ন হয়ে গেছে। তার উপর বৈচিত্র্যহীন জীবন সম্পর্কহীন শিক্ষার পাঠ্যসূচী তো আছেই।

গত তিরিশ বছরে টুকিটাকি যেসব সংস্কার সাধন হয়েছে বা চেষ্টা করা হয়েছে তা এই স্তরের বিরাট শিক্ষা সমস্যার পক্ষে আদৌ যথেষ্ট নয়। মৌলিক শিক্ষা সংস্কার হয়নি। অথচ গ্রামীণ অর্থনীতি পরিকল্পনার সঙ্গে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রকল্প জুড়ে দিয়ে আন্দোলন মুখী জোরদার প্রচেষ্টা দরকার। নারী শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে চিত্র আরো ভয়াবহ। কত রকমের যে সামাজিক কুসংস্কার এই পথে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে আছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। সামাজিক স্তরে এইসব বাধা বিপত্তির বিরুদ্ধে তীব্র সামাজিক আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা আছে। শিক্ষাকে গণমুখী করে

তোলার জন্য জনসাধারণের ব্যবহৃত সবরকমের সাজ-সরঞ্জামকে বেশ পরিকল্পিত-ভাবে কাজে লাগানো দরকার। একমাত্র জন মাধ্যমের সুষ্ঠু ব্যবহারের দ্বারা সামাজিক বাতাবরণ সৃষ্টি হতে পারে এবং শিক্ষার দিকে জনগণের আগ্রহ দেখা দিতে পারে।

প্রাথমিক স্তরের সার্বজনীন শিক্ষা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের শিক্ষাকে গ্রামীণ ও বস্তি অঞ্চলের উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত করে প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষার ধ্যান-ধারণাকে একেবারে পালটিয়ে দিয়ে মৌলিক সংস্কার সাধনে ব্রতী হওয়ার জন্য চাই বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এই পরিকল্পনার জন্য সরকারকে ন্যায় সঙ্গত আর্থিক ব্যয় বরাদ্দ করতে হবে এবং সর্বপ্রকার টেকনিক্যাল জ্ঞানের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। ব্লকস্তরে শিক্ষা-সার্ভে করে প্রত্যেক গ্রামে এবং অধিক বসতি এলাকায় প্রত্যেক পাড়ায় প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু করা দরকার। সকালবেলা সেখানে প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশু উদ্যানে কিছু কর্মসূচী নিতে হবে এবং বৈকালেও সেখানে তাদের জন্য প্রমোদমূলক অনুষ্ঠান, খেলাধূলা, মেলামেশা ইত্যাদির সুযোগ রাখতে হবে। কিছু ইঁট, চুন, পাথর, রং ইত্যাদির ব্যবহার করে প্রচলিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে সুন্দর ও মনোরম করে তোলা কঠিন কাজ নয়। গ্রামে তো গাছপালা ও অন্যান্য রসদের অভাব নেই—অভাব এই কাজগুলি সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্য উদ্দীপনার রসদ। ব্লক পর্যায়ে যদি সরকারী অর্থের কিছু 'ব্লক টাকা' থাকে তা ব্যবহার করলে ভালো ফল পাওয়া যাবে। দুপুরে প্রাথমিক শিক্ষার সিফ্‌ট থাকবে দুরকমের—দশটা থেকে একটা পর্যন্ত ৬ থেকে ১১ বছরের এবং একটা থেকে ৪টা পর্যন্ত ১১ থেকে ১৪ বছরের শিশুদের জন্য সংহত শিক্ষাসূচী পালন করা যেতে পারে।

প্রচলিত একমুখী প্রাথমিক শিক্ষার পঠন পাঠনের পরিবর্তে বহুমুখী ধারায় যেকোনো বয়সের (৬—১৪ এর মধ্যে) শিক্ষার্থীকে যেকোনো সময় যেকোনো মেয়াদের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী সমাপনের সুযোগ দিয়ে ভর্তি করতে হবে এবং পাঠ্য সমাপ্তির সুযোগ দিতে হবে। সন্ধ্যাবেলায় এই প্রাথমিক বিদ্যালয়েই চলবে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কর্মসূচী এবং সেই সঙ্গে ক্লাব-ধর্মী নানারকম আনন্দজনক কাজকর্ম ও উৎপাদনমুখী কাজ। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে সারাক্ষণের জন্য কিছু কর্মীশিক্ষক থাকবেন, কিছু আংশিক শিক্ষক। এলাকার গণ্যমান্য বিভিন্ন পেশার চাকুরীরত এবং মাধ্যমিক ও কলেজের শিক্ষক ও ছাত্রদের নিয়ে

গঠিত 'পুলের' সাহায্যে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাকে কর্মমুখর রাখতে হবে একটি সুবিন্যস্ত প্রশাসনিক তৎপরতার সাহায্যে। প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র হবে একটি স্থায়ী গ্রামীণ-প্রকল্পের কর্মমুখর কর্মকেন্দ্র. যেখানে সারা বছর সমস্ত দিনই কোনো-না-কোনো কর্মসূচীর মাধ্যমে কাজেব আবহাওয়া সরগরম থাকবে। গ্রামের শিক্ষিতা নারী এমন কি গৃহবধূদেরও কাজে লাগাতে হবে এবং উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য কিছু যৎকিঞ্চিৎ সাম্মানিকের ব্যবস্থা করতে হবে। মোট কথা, সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রকল্প কার্যকরী করার জন্য গ্রামীণ কেন্দ্রগুলিকেই দিবারাত্রির শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে হবে এবং সেইগুলিই হবে নতুন যুগের ধ্যানধারণা ও সাংস্কৃতিক জাগরণের পীঠস্থান।

এই বিরাট দেশে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে শিক্ষার সমগ্র দায়-দায়িত্ব পরিচালনা করা সত্যই কঠিন। প্রাথমিক শিক্ষা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের মতো সামাজিক দায়দায়িত্বের প্রাথমিক কাজটুকু সুষ্ঠুভাবে করতে হলে রাজ্য সরকারের এলাকায় এই দায়িত্ব অর্পণ করে জনসংখ্যার ভিত্তিতে পশ্চাদ্‌পরায়ণ এলাকার গুরুত্বের ভিত্তিতে জাতীয় নীতিতে কেন্দ্রীয় অনুদান প্রদানের সহজ ব্যবস্থা থাকা দরকার। সুসংহত গ্রামীণ কর্মসূচীর মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, কুটীরশিল্প উন্নয়ন প্রভৃতি কর্মসূচীকে গ্রহণ করে গ্রামের সার্বিক স্তরের জনগণকে (নারী পুরুষ নির্বিশেষে) একটি সংহত প্রকল্পের আওতায় আনতে হবে এবং সেজন্য কিছু বাধ্যতামূলক বিধান থাকাও বাঞ্ছনীয়। বিধিমাফিক ও বিধি-বহির্ভূত শিক্ষাসূচীর মধ্য দিয়ে একদিকে অর্জন করতে হবে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, অন্যদিকে বয়স্কদের নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্তি। কোনো কোনো এলাকাকে চিহ্নিত করে পরীক্ষামূলকভাবে খুব সংহত পদ্ধতিতে এগিয়ে যেতে হবে। কেননা, বিধিমাফিক ও বিধিবহির্ভূত শিক্ষার কর্ম রূপায়ণে গাফিলতি হলে শিক্ষার নীট ফল মারাত্মক রকমের নীচু মানের হতে পারে এই আশঙ্কা আছে।

আমাদের জাতির শক্তি সামর্থ্য আছে অনেক বেশি, অথচ সেই শক্তি সামর্থ্যকে ঠিক মতো কাজে লাগানো হয় না বলেই যতো বিশৃঙ্খলা। গ্রামে-গঞ্জে তরুণ ও বয়স্ক শিক্ষার্থীদের বোধের ক্ষমতাও কম নয়। গণমাধ্যমগুলিকে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করে প্রত্যেক গ্রামীণ কেন্দ্রকে আনন্দমুখর, জীবনধর্মী, উৎপাদনমুখী করে তোলার জন্য সর্বপ্রকার শক্তির সুসমন্বয় দরকার। শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের

পদ্ধতিও একেবারে প্রচলিত পদ্ধতিকে বদলে দিয়ে করতে হবে এবং সেজন্য বাস্তববাদী পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন নতুন শিক্ষার্থী ভর্তির যেমন সমস্যা আছে, তেমনি সমস্যা আছে অধিকাংশ শিক্ষার্থী শেষ পর্যন্ত তার শিক্ষা অব্যাহত রাখতে পারে কি না। আর্থিক দারিদ্র্যের কারণ তো আছেই, তাছাড়া আছে গার্হস্থ্য অর্থনীতির চাপে যে কোনো একটা অন্য কাজে চলে যাওয়া, অভিভাবকদের অনিচ্ছা ও অক্ষমতা ইত্যাদি ছাড়াও আরেকটি বড়ো কারণ, শিক্ষার পাঠ্যসূচীতে কোনো বৈচিত্র্য নেই সেইজন্য। এই কারণে, বিধিমাফিক ও বিধিবহির্ভূত শিক্ষার পাঠ্যসূচীকে সমাজপ্রদ, প্রয়োজনীয়, জীবনধর্মী, আনন্দদায়ক, উৎপাদনমুখী করে তুলতে হবে। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা বড্ড বেশি একমুখী, একপেশে, একঘেঁয়ে, বিরক্তিকর। আমাদের দেশের যা অবস্থা, প্রচলিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি তিন ভাগের দুই ভাগ শিশুকে বিদ্যালয়ে টেনে এনেও শেষ পর্যন্ত প্রায় ৬০ ভাগ শিক্ষার্থীকে ধরে রাখতে পারে না অব্যাহত শিক্ষার সূচীতে। এই জন্যে বিধিবহির্ভূত বহুমুখী বিকল্প কর্মসূচীর আওতায় সেইসব শিক্ষার্থীকে টেনে আনা দরকার।

**পরীক্ষামূলকভাবে সমস্যাধর্মী কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে ব্লকস্তরে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের অঙ্গ হিসেবে বিধিবহির্ভূত শিক্ষার প্রকল্প চালু করার সুপারিশ করেছিলেন পরিকল্পনা কমিশন।** এই প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য হোলো বিধিমাফিক শিক্ষার ফাঁকগুলি পূরণ করা। সেইজন্য পাঠ্যসূচী নির্ণয়, সময়, পরবর্তী কর্মসূচী, স্থান, শিক্ষাদান প্রভৃতি বিষয়ে কোনো কঠোরতা পালন না করে কর্মসূচি এমনভাবে নেওয়া হয় যার উদ্দেশ্য হোলো, শিক্ষার্থীদের মধ্যে অক্ষর জ্ঞানের বিকাশ সাধন করা, কার্যকরী অঙ্ক শেখানো, প্রযুক্তিবিদ্যার কার্যকরী মনোভাব সৃষ্টি করা, বৈজ্ঞানিক অভ্যাস ধ্যানধারণা নেওয়া, শিল্প সঙ্গীত উপভোগ করা, সাংস্কৃতিক কাজে অংশ নেওয়া এবং শেষমেশ উচ্চশিক্ষার পথে এগিয়ে যাওয়ার মানসিক প্রস্তুতি গড়ে তোলা। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাভিত্তিক আনন্দজনক কর্মবৃত্তির মধ্য দিয়ে এই শিক্ষার ব্যবস্থাপনার উপর জোর দেওয়া হয়।

৬ থেকে ১৪ বছরের প্রাথমিক সার্বজনীন শিক্ষা এবং বয়স্কদের আক্ষরিক শিক্ষার কাজ যদি ভালোভাবে এগিয়ে যেতে পারে, তাহলে ভবিষ্যতে অষ্টম শ্রেণী

নয়, দশম শ্রেণী পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষাকে অত্যাবশ্যক সার্বজনীন অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক হিসেবে গড়ে তোলা যাবে।

উৎপাদনাত্মক ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজকে অগ্রণী ভূমিকা দিয়ে মাতৃভাষার মাধ্যমে এবং প্রাথমিক শিক্ষার দ্বিতীয় পর্যায়ে দ্বিতীয় একটি ভাষা শিক্ষাদানের সুযোগ দিয়ে বুনিয়াদী ধাঁচের সৃষ্টিশীল অষ্টম মান পর্যন্ত ভিত্তিভূমির শিক্ষাদানের নীতিকে মজবুত করে তোলা খুবই জরুরী। সেই সঙ্গে বিধিমাফিক ও বিধিবহির্ভূত শিক্ষার কর্মসূচীকে উন্নয়ন পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করে গ্রামীণ পুনর্গঠনের অত্যাবশ্যক কর্মসূচীতে অগ্রাধিকার দিয়ে সমস্ত রকমের গণমাধ্যম ও গণসহযোগিতাকে কাজে লাগিয়ে স্বল্প ব্যয়ে অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে দেশের সমস্ত নাগরিককে (তরুণ ও বয়স্ক) দ্রুত স্বাক্ষর তথা শিক্ষিত করতে হবে। কেবলমাত্র এক বিরাট কর্মযজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই এই কাজ সমাপ্ত করতে পারলে তবেই জাতির নতুন শক্তিতে অভ্যুদয় অবশ্যম্ভাবী হবে, নতুবা অন্য কোনো উপায় নেই।

॥ ৮ ॥

## সমাজসেবা প্রকল্প

ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে সমাজ নয়। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশ সাধন সম্ভব উপযুক্ত সামাজিক পরিবেশ ও সুযোগের মধ্য দিয়ে। **ব্যক্তি যেমন সমাজকে তার প্রতিভার শ্রেষ্ঠ ফসল উপহার দেবে, তেমনি সমাজকেও দিতে হবে প্রতিভা স্ফুরণের আবশ্যিক শর্তগুলির পূরণের ব্যবস্থা।**

আত্মকেন্দ্রিক ও আত্মসর্বস্ব সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তি-মালিকানাই প্রধান হয়ে ওঠে এবং তার ফলে সমাজের বুকে সংঘর্ষ, বিশৃঙ্খলা, পাপাচার প্রভৃতি ক্ষতের সৃষ্টি হয়। বাকেল বলেছিলেন, সমাজই নানা অপরাধের সৃষ্টি করে দেয়। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার ফলে আমাদের গণতান্ত্রিক দেশেও ধনবৈষম্যের ফারাকের জন্য সমাজের বুকে সৃষ্টি হয়েছে দুটি বিশেষ শ্রেণী—এক, সুবিধাভোগী, দুই, বঞ্চিত শ্রেণী। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই ফারাক লক্ষ্য করা গেছে সর্বস্তরে।

এই ধরনের শ্রেণী-বৈষম্য গণতান্ত্রিক আদর্শকেই কাগজে-কলমের প্রতিশ্রুতিতে পরিণত করছে এবং এর ফলে সামাজিক জীবনে নেমে আসছে নিত্য-নৈমত্তিক বিপর্যয় ও অশান্তি। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা খুবই গভীর স্তরের—সেইজন্য,

অভাব বা ঘাটতি বা ফাঁক পূরণের জন্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার ভেতরের ত্রুটিগুলি দূর করে রোগ প্রতিষেধের জন্য দাওয়াই দিতে হবে মায়ের মত যত্ন নিয়ে—লাঠি, জেল, গুলি, কাঁদানে গ্যাস ইত্যাদি এই সমস্যার সমাধান নয়। রাজনৈতিক দলবাজিও এই সমস্যার সমাধান হতে পারে না। সমাধানের রক্ষাকবচ নিহিত আছে সমাজসেবাধর্মী উন্নয়নমূলক প্রকল্পের মধ্যে। প্রকল্পের জন্য চাই সুস্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন কেন্দ্রীয় তথা জাতীয় নীতি। আর্থিক বরাদ্দের দিক দিয়ে চাই জনসংখ্যার আনুপাতিক হিসাব এবং অনগ্রসর এলাকার দিকে বিশেষ নজর। প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় চাই জনগণের সার্বিক অংশগ্রহণ—আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কোনো ফল মিলবে না। জনস্তরের নীচু পর্যায় থেকে চাই প্রকল্প এবং তা কার্যকরী করার তদারকী। সততা ও পরিচ্ছন্নতার জন্য চাই আবশ্যিক শর্তাবলী। নতুবা সেবাপ্রকল্পগুলি নামেই গালভরা সেবাপ্রকল্প হিসেবে পরিচিত হবে এবং পাইয়ে দেওয়া বা বাগিয়ে নেবার ক্ষেত্র হিসেবে পরিণত হবে। ফয়দা তুলবে সমাজের সুবিধাভোগী সমাজ, বঞ্চিতের হাহাকার অব্যাহত রয়ে যাবে চিরদিন। সকলের জন্য সমান সুযোগের সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি অরণ্যে রোদন হিসেবে রয়ে যাবে।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বুনিয়াদী শিক্ষাকে জনগণের পর্যায়ে জনপ্রিয় করে তোলার আগে দ্রুত অগ্রগতি লক্ষ্য করা গিয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের চোখে এই ব্যাপারটি ধরা পড়েছিল। কিন্তু ক্রমেই দেখা গেল, বুনিয়াদী শিক্ষার নামে একটা যেমন খুশি জগা-খিচুড়ি ব্যাপার। কারণ, যাঁরা শিক্ষাবিদ্ ও প্রশাসক তাঁদের নিজেদেরই বিশ্বাস নেই এই প্রকল্পে। শিক্ষকরা পরিশ্রমবিমুখ, গবেষণাধর্মী কোনো মনোভাব নেই। শিক্ষকদের সাহায্য করার মতো উপযুক্ত শিক্ষাদান উপাদান নেই। এর ফলে বুনিযাদী শিক্ষা আর প্রচলিত শিক্ষা যেন এক বিন্দুতে গিয়ে পরিণত হোলো, উৎসাহ ও উদ্দীপনার চিহ্ন রইলো না। বুনিয়াদী শিক্ষা শিল্পকেন্দ্রিক হবে অথবা কর্মভিত্তিক হবে এটা নিয়ে বৃথা আলোচনায় বিতর্কে কালক্ষেপ করা হোলো। অথচ আমাদের দেশের জনগণের স্তরের শিক্ষা তো অবশ্যই হবে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ ব্যাপার। সামাজিক দিক দিয়ে প্রয়োজনীয় উৎপাদনাত্মক ও সৃষ্টিশীল কাজকর্মই তো হবে শিক্ষার ভিত্তিভূমি। সমাজের কর্ণধারগণ এ জিনিস বোঝেন না তা নয়, আসল বাধা সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণী-চরিত্র। কারা প্রকল্প

রূপায়ণ করবেন, তদারকী করবেন, কাজের পর্যালোচনা করবেন, সেই ব্যাপারেই রয়ে গেছে মস্তবড়ো ত্রুটি। এই অবস্থা নিরক্ষর দূরীকরণের ব্যাপারেও ঘটে গেছে। যা হোক, দেরি হলেও এখন এটা সর্বজনগৃহীত ব্যাপার যে, দেশের বুনিয়াদ গঠনে চাই নতুন শিক্ষার ধারা, চাই সমষ্টিগতভাবে গ্রামীণ উন্নয়নের কর্মসূচী, সার্বিক-ভাবে চাই সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, গ্রামীণ পরিকল্পনার সবকিছুই হওয়া চাই একটি নিবিড় যোগসূত্রের মাধ্যমে।

দেশে ব্লক পর্যায়ে সমষ্টি উন্নয়নের কর্মসূচী গৃহীত হয়েছিল স্বাধীনোত্তর যুগে। কেন্দ্র থেকে শুরু করে রাজ্য পর্যায় ও জেলা এবং ব্লক স্তরে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে এক একটি এলাকাকে সর্বাত্মকভাবে উন্নয়নের কথা চিন্তা করা হয়েছিল। ব্যক্তি ও সমাজ যেখানে একাত্ম, সেখানে কোনো উন্নয়ন প্রকল্পই বিচ্ছিন্নভাবে রূপ নিতে পারে না। পরিকল্পনা কমিশন এইজন্য কেন্দ্রে সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের মারফৎ পর্যায়ক্রমে ব্লকস্তর পর্যন্ত কর্মসূচী গ্রহণে তৎপর হয়েছিলেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, বিভিন্ন বিভাগেব মধ্যে সমন্বয়ের একান্ত অভাব এবং উন্নয়নশীল বিভাগগুলি পরস্পর পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন। তার পরিণতিতে দেখা গেল, প্রশাসনিক একটা কাঠামো তৈরি করে তাকে দিয়ে অন্য কাজ করানো হয়েছে। ফলে, সমষ্টি উন্নয়নের সার্বিক কোনো প্রকল্প রূপায়িত হয়নি। কর্মসূচীকে সকলের সহযোগিতায় রূপ দেবার চেষ্টা নেই, কাজের তদারকী করার কোনো কর্মসূচী নেই। বিদ্যালয়গুলির নিজস্ব কোনো উন্নয়নশীল বিভাগও গড়ে ওঠেনি। বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন চেয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদাসম্পন্ন এক ধরনের গ্রামীণ শিক্ষাপীঠ, যেগুলি আসলে হবে উন্নয়নশীল প্রকল্পের নিয়ামক। কিছুটা কাজ এ বিষয়ে এগোচ্ছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর রূপান্তরিত হতে পারেনি। যেগুলি গ্রামীণ শিক্ষাপীঠ হিসেবে গড়ে উঠেছিল, সেগুলি প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার দাপটে শেষ পর্যন্ত সাবেক বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়ে গা বাঁচিয়েছে। কারণ, বিভিন্ন জীবিকার ক্ষেত্রে সাবেক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীরই মূল্য স্বীকৃত। গ্রামীণ বিদ্যাপীঠে শিক্ষণ নিয়ে বাইরের প্রতিযোগিতার মধ্যে শিক্ষার্থীরা কোনো মূল্য পায় নি। এর ফলে যা হবার তাই হয়ে গেছে।

কার্যকরী অক্ষর শিক্ষার জন্য এবং উন্নয়নশীল চাষবাসের জন্য প্রশিক্ষণের কর্মসূচী ক্রমশ এলাকা থেকে এলাকায় বিস্তৃত করা হচ্ছে এবং এই কাজে

শিক্ষাদপ্তর, কৃষিদপ্তর ও তথ্যদপ্তর পরস্পর সংযোগ রেখে সহযোগিতা করছে এবং কিছু লক্ষ্যণীয় ফলাফলও দেখা গেছে। তবে সব রাজ্যে সমান চিত্র নয়। এ বিষয়ে করণীয় অনেক কিছু রয়ে গেছে। সমাজসেবা প্রকল্পের দিক দিয়ে এই কর্মসূচীর বাস্তব উপযোগিতা উপেক্ষণীয় নয়।

সমাজসেবা প্রকল্প হিসেবে আরেকটি উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা হোলো গ্রামীণ যুবকেন্দ্র স্থাপনের চেষ্টা। কিভাবে জেলা প্রশাসন, উন্নয়ন বিভাগসমূহের সঙ্গে এইসব কেন্দ্রের সমন্বয় সংসাধক গ্রামীণ স্কুল-বর্জিত যুবকদের জন্য কিছু করতে পারেন, সেইভাবে চলবার জন্য একটি উদ্যম। শিক্ষার সুযোগ, দক্ষতা অর্জন করা, লোকরঞ্জনের ব্যবস্থাপনা করা ইত্যাদি কর্মসূচির মাধ্যমে সমগ্র সামাজিক পরিমণ্ডলে একটা আন্দোলনের আমেজ সৃষ্টি করা এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। নেহেরু যুবকেন্দ্র এইভাবে গড়ে উঠেছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এবং এদের কার্যকারিতা রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হতে পারলে জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী মাধ্যম হতে পারে সে রকম সম্ভাবনা আছে। কিছু কিছু বেসরকারী সংস্থা, মিশন জাতীয় প্রতিষ্ঠান নানাভাবে সমাজ প্রকল্প রূপায়িত করার জন্য স্বেচ্ছা-প্রণোদিত অনেক ভালো কাজ করছেন। যেমন, রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম, গান্ধী শান্তি সংসদ প্রভৃতি। রাজনৈতিক দলের প্রচ্ছায়ায়ও অনেক বেসরকারী সেবাপ্রতিষ্ঠান দেশে গড়ে উঠেছে। দুর্নীতির কালো হাত থেকে যদি এইসব স্বেচ্ছা প্রতিষ্ঠান বিমুক্ত থাকতে পারে তাহলে তা খুবই আশার কথা হবে।

কেন্দ্রের শিক্ষা মন্ত্রক ১৫ থেকে ২৫ বছরের শিক্ষার্থীদের জন্য বিধিবহির্ভূত শিক্ষার কর্মসূচী নিয়েছেন, উদ্দেশ্য স্কুল-কলেজ বিবর্জিত নিরক্ষর বা অর্ধশিক্ষিতদের এমন কিছু প্রশিক্ষণ দেওয়া যার ফলে গ্রামীণ পুণর্গঠনের কাজ এগোতে পারে। এই পরিকল্পনার দ্বারা সরকারী ও বেসরকারী সর্বপ্রকার মাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষাকে উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত করে কিছু সদর্থক ফল পাবার প্রত্যাশা করা হয়েছে।

সমাজসেবা প্রকল্প হিসেবে আরেকটি উল্লেখযোগ্য চেষ্টা হোলো, কিভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সমাজসেবা প্রকল্পের মাধ্যমে সমাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত করা যায়। শিক্ষার সমস্ত স্তরেই সমাজসেবাকে পাঠ্যসূচীর অপরিহার্য করার প্রস্তাব হয়েছে। এর প্রধান উদ্দেশ্য হোলো, নাগরিকত্বের বিকাশ সাধন, ব্যক্তির চরিত্র গঠন, জ্ঞানের নতুন নতুন দিগন্তের বিস্তার, সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে

চেতনাবোধ বাড়িয়ে দেওয়া। পাঠ্যসূচীতে সমাজসেবা প্রকল্প নিতান্ত দায়সারা ব্যাপার হবে না, তাকে অবশ্যই হতে হবে বাস্তব প্রয়োগের দিক দিয়ে সামাজিক-ভাবে ফলপ্রদ অভিজ্ঞতার ফসল। এইদিক লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে জাতীয় সেবা প্রকল্প চালু করার চেষ্টা হয়েছে। এইসব কর্মসূচীর মাধ্যমে জনগণকে বুভুক্ষার বিরুদ্ধে, নানারকম অসুখবিসুখ সম্বন্ধে চেতনা সঞ্চার করার চেষ্টা হচ্ছে—এমন কি কারিগরী শিক্ষায়তন এই প্রকল্পে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে যুবকদের জন্য স্বয়ংনির্ভর শিল্প সংগঠন ও শিল্পসৃষ্টির কাজে এগিয়ে এসেছেন।

এইসব সেবা প্রকল্প প্রচেষ্টার ভেতর দিয়ে বর্তমানে একটা পরিষ্কার চেতনা-বোধ আসছে যে, শিক্ষা বস্তুটি জীবন ও জীবিকাধর্মী না হলে চলবে না। তাকে অবশ্যই সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে একাত্ম হতে হবে। সামাজিক পুণর্গঠনের অংশীদার হতে হবে। সারা দেশের জন্য পর্যায়ক্রমে চাই সুসংহত সমন্বয় সংসাধনের নীতি। কাযকরী করার জন্য জরুরি কর্মসূচীগুলির বিশেষ তালিকা রূপায়ণের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ফিল্ড-ওয়ার্কার। কার্য পর্যালোচনা ও তদারকী এমন কি জবাবদিহির মতো কিছু খবরদারী ব্যবস্থা। বিদ্যালয়গুলিকেই হতে হবে স্থানীয় উন্নয়নশীল কাজের প্রধান যোগসূত্র। তার মাধ্যমে জনগণকে উন্নয়নশীল প্রকল্পে নিবিড়ভাবে যুক্ত করতে হবে। যার ফলে জনগণের ভেতর থেকে তাগিদ আসবে আন্তরিক ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেশ পুণর্গঠনের একটা জিদ।

ইংরেজ আমলে জাতীয় নেতাদের পৃষ্ঠপোষকতায় সারা দেশে স্বয়ংসেবক নানা সমাজসেবা প্রকল্প গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে কাজে লেগেছিল। সে সময় বিরাট উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে ব্রতচারী শিক্ষা, লাঠি খেলা, কুস্তি প্রভৃতি শারীর চর্চা, রেডক্রস প্রভৃতির মাধ্যমে জনগণের চিকিৎসা, নাইট ইস্কুল পরিচালনা, আগুন নেভানোর কাজ, কচুরীপানা নাশ, যুদ্ধবন্দীদের শিবির পরিচালনা, মন্বন্তরের সময় গ্রুয়েল কিচেন পরিচালনা করা প্রভৃতি কাজকর্ম হয়েছিল। তবে সে সময় স্বাধীনোত্তর গণতান্ত্রিক মেজাজ নিয়ে সমাজ প্রকল্প চালু হয়নি বটে, কিন্তু এইসব কাজকর্মের মধ্যে গভীর নিষ্ঠার পরিচয় ছিল সন্দেহ নেই। স্বাধীনোত্তর ভারতে সমাজসেবা প্রকল্পের গুরুত্ব অনেক বেশি—এর মাধ্যমে সমাজের যাবতীয় অনাচার, পাপাচার, কুসংস্কার থেকে মুক্তির বাস্তব পথনির্দেশ আসতে পারে। স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা এই প্রকল্পের সঙ্গে একাত্ম হয়ে কাজ

করলে গ্রামের সংস্কার, পুকুর খনন, রাস্তা বাঁধা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পশুপালন ও প্রজনন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, স্বাস্থ্যরক্ষা, শৃঙ্খলা রক্ষা, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন প্রভৃতি অসংখ্য কর্মসূচীর সার্থক রূপায়ণ অসম্ভব নয়। দেশের জনগণের মর্মস্থলে গঠনমূলক আবহাওয়ার মর্মবাণী গ্রথিত করার কাজে সমাজসেবা প্রকল্প একটি মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

এইজন্য চাই সরকারের আর্থিক আনুকূল্য, উপযুক্ত পরিকল্পনার ছক, রূপায়ণের জন্য সুনির্দিষ্ট ও সুনির্বাচিত কর্মীবাহিনী ও নেতৃত্ব, জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ, কাজকর্মের প্রতিটি ধাপের অগ্রগতি ও ত্রুটিবিচ্যুতির গঠনধর্মী তদারকী ও মূল্যায়ন। কথার সঙ্গে কাজের আন্তরিকতা না থাকলে সমাজসেবা প্রকল্প একটি নিছক গালভারী গল্প হিসেবে পর্যবসিত হতে কতোক্ষণ।

## ॥ ৯ ॥

## নারী শিক্ষা

নারী শিক্ষার ব্যাপারটি আমাদের সামাজিক সমস্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচনার যোগ্য। মৈত্রেয়ী-গার্গী-লীলাবতীর দেশে কোনো এক পৌরাণিক যুগে নারী-শিক্ষার যে মহিমা প্রচলিত ছিল, সে কথা স্মরণ করে আমাদের গর্বিত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু, সেই সঙ্গে সঙ্গে পরাধীন ভারতবর্ষে নারী সমাজের দুর্দশাপূর্ণ চিত্র স্মরণ করে লজ্জায় আমাদের মাথা নত হয়ে যায়। তবে একথাও স্মরণযোগ্য, সে যুগের আত্মগ্লানির ভেতর দিয়েই নারী শিক্ষার বিস্তার ও প্রসারের সম্ভাব্য প্রতিশ্রুতির জন্ম হয়েছিল পরাধীন দেশেই।

একটা সময় গেছে যখন নারীরা অন্তঃপুরে বন্দিনী, সতীত্বের পরাকাষ্ঠা দেখানোর জন্য স্বামীর চিতায় সহমরণের পথে পা দিতে হোতো স্বেচ্ছায় অনিচ্ছায় বাধ্যবাধকতায়। রামমোহন রায় প্রমুখ দেশবরেণ্য লোকনেতাদের প্রচেষ্টায় কুসংস্কারের ভিত্তিমূলে সেদিন এসেছিল আঘাত। ইংরেজি শিক্ষার সংস্পর্শের ভেতর দিয়ে এসেছিল এক নব জাগরণের অভ্যুদয়—তার ভেতর দিয়ে এসেছিল নতুন করে আত্মানুসন্ধানের পালা। রামমোহন বিদ্যাসাগর প্রভৃতির আন্তরিকতায় নারীসমাজের মুক্তির পথ একটু একটু করে খুলে গিয়েছিল। কিছু

বিদুষী নারী পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে সমুদ্ভাসিত হয়ে হাজির হয়েছিলেন আলোর দরবারে। নারী শিক্ষা প্রসারের সেই আদিলগ্নে আমাদের জাতীয় মনীষীরা রক্ষণশীলতার দাপট অগ্রাহ্য করে নানারকম বিরূপ সমালোচনা অগ্রাহ্য করে এক নতুন আলোকবর্তিকা প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন। সে সময় নারী শিক্ষার বিরুদ্ধে অনেক টপ্পা ও ছড়া রচিত হয়েছিল। বেথুন কলেজ স্থাপনের মধ্য দিয়ে এবং ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে নতুন যুগের নারী প্রগতির অগ্রগতি সূচিত হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীতে। ইংরেজ আমলে নারী শিক্ষার যেটুকু বিকাশ ঘটেছিল তারই নীট ফল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহ-শিক্ষার ব্যবস্থাপনা। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রথম প্রথম পৃথক নারী বিদ্যালয়ের নীতি স্বীকৃত হলেও অনেক উচ্চ বিদ্যালয়েও সহ-শিক্ষার প্রবর্তন হয়েছিল। কলেজীয় স্তরে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সহ-শিক্ষার প্রচলন ঘটেছিল এবং কিছু কিছু পৃথক মহিলা কলেজও গড়ে উঠেছিল। তবুও, জনসংখ্যার অর্ধেক এই নারী সমাজের সার্বিক অংশে শিক্ষার প্রসার ঘটেনি। সমাজের অর্ধেক অঙ্গ পঙ্গু রয়ে যাওয়ায় আমাদের জাতীয় লজ্জা দূরীভূত হয়নি। নারীরাই যে 'অর্ধেক পৃথিবী'—এই চেতনাবোধ যেন আমাদের নেই।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর নারী শিক্ষার অগ্রগতি দ্রুতভাবে বৃদ্ধি পায়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শিক্ষিত নারীরা পুরুষের সঙ্গে কোনো অংশে পশ্চাৎবর্তী নয়, তা জীবন ও জীবিকার নানা স্তরে একটি প্রতিযোগিতার মতো পরিবেশ ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। গৃহস্থালির কাজ ছাড়াও নারীরা অফিস আদালতে ও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে এগিয়ে এসেছেন যা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বিষয়টি অর্থ নৈতিক ও সামাজিক দিক দিয়ে গুরুত্ব পেয়েছে, যতই নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগতি ঘটছে।

গণতান্ত্রিক চেতনার সম্প্রসারণের ফলে নারী ও পুরুষের সমান মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি নারী সমাজকে উদ্দীপিত করেছে দারুণভাবে। নারীর প্রতি সামাজিক জীবনের নিদারুণ অবিচার ও অত্যাচারের কাহিনী একসময় শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন রচনার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছিল। গণচেতনার বিস্তারের ফলে জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার ও সমান সুযোগের দাবী ক্রমশ মুখর হয়েছে। শুধু সমান মৌলিক অধিকার নয়, নারী সমাজের বৃহৎ অংশ এখনও অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকায় নারী প্রগতির জন্য বিশেষ অধিকারের

দাবী খুবই ন্যায্য ও ন্যায সঙ্গত সামাজিক দাবী। মজুরির ক্ষেত্রেও নারী পুরুষের ন্যায্য অধিকার ও দাবী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গ্রামে-গঞ্জে শিক্ষিতা অর্ধশিক্ষিতা নারী সর্বত্রই চোখে পড়ছে।

তথাপি সমাজের এই অর্ধেক অংশ এখনো নানারকম সামাজিক অন্ধ কুসংস্কার ও অজ্ঞতার অক্টোপাসে বাঁধা পড়ে আছে। নারী সমাজের সার্বিক মুক্তি এখনো অর্জিত হয়নি। নারী সমাজের মনুষ্য শক্তির একটি বিরাট কাঠামো শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে আছে। এই বিরাট সামাজিক অংশে শিক্ষার আলো পৌঁছিয়ে দিতে যে ধরনের বিরাট কর্মযজ্ঞ, উদ্যোগ ও আয়োজনের দরকার, তা আমাদের নেই। বিধিমাফিক শিক্ষার ধারায় এই কাজ সমাপ্ত হতে কয়েক শতাব্দী লেগে যেতে পারে। নারী সমাজকে একটি বিশেষ গোষ্ঠী হিসেবে গ্রহণ করে সমস্ত সামাজিক কুসংস্কারের বেড়াজাল ছিন্নভিন্ন করে শিক্ষার আলোকে উদ্ভাসিত করার জন্য চাই বিধি বহির্ভূত নতুন শিক্ষার ধারা—টি. ভি., রেডিও, লোকরঞ্জন, হাতের কাজ প্রভৃতি নানা কর্মসূচীর মাধ্যমে এই নারী সমাজকে টেনে এনে তাদের সক্রিয় ও সচেতন করে তুলতে হবে গ্রামীণ ও পরিবেশের পুণর্গঠন পালায় একটি অবশ্যম্ভাবী শক্তি হিসেবে।

জীবন ও জীবিকার এমন অনেক কিছু বিশেষ ক্ষেত্র আছে যেখানে নারী-সমাজের ক্ষমতা ও প্রতিভা অনেক বেশি কার্যকরী সম্পদ। নিরক্ষরতা দূরীকরণ, সন্তান পরিচর্যা, স্বাস্থ্য ও সেবা, হাতের কাজ, প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার, গ্রামীণ কুটীরশিল্প ও অন্যান্য অনেক কাজে নারীদের ভূমিকা সমাজের পক্ষে অনেক বেশী ফলপ্রদ। বিজ্ঞান সম্মত বাস্তব উপায়ে নারী সমাজের বিরাট অংশকে টেনে আনতে হবে সংহত কর্মসূচীর মাধ্যমে। ইংরেজি শিক্ষার সংস্পর্শে একদিন নারী জাগরণ এসেছিল সত্যি কথা কিন্তু স্বাধীন ভারতবর্ষে ইংরেজি শিক্ষার প্রাবল্য নারী সমাজের বৃহৎ অংশের পক্ষে একটি পর্বতপ্রমাণ বাধা হয়ে আছে। অথচ মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধের সমান। এই ভাষার মধ্য দিয়েই নারী সমাজের নতুন শিক্ষার্থী সহ গৃহবধূ, বৃদ্ধা সকলের জন্য শিক্ষার ন্যূনতম দ্বার খুলে দিতে হবে সহজ সহজ গণ-মাধ্যমের মধ্য দিয়ে। বিধিবহির্ভূত সামাজিক কর্মসূচীর মধ্য দিয়েই এই কঠিন কাজ করা সম্ভব হতে পারে। সমান সুযোগ ও অধিকারের মৌলিক আতি মেনে নিয়েও নারী সমাজের জন্য বিশেষ অধিকারের দাবীকে প্রাধান্য দিয়ে

জাতীয় নীতি হিসেবে জীবন ও জীবিকার কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে নারী সমাজের একচেটিয়া অধিকারকে স্বীকৃতি দিতে হবে।

**অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নারী সমাজের শিক্ষার আকাঙ্খাকে চরিতার্থ করতে হলে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সামাজিক ফলপ্রসূ উৎপাদনাত্মক কাজকর্মে নারীসমাজের বিশেষ প্রতিভাকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে কাজে লাগাতে হবে।** যেমন, এমন কতকগুলি ক্ষেত্র আছে যেখানে নারীদেরই দায়িত্ব দিলে কাজ সুন্দর হয়,। উদাহরণস্বরূপ, প্রাথমিক, প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা, নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রকল্প, গৃহস্থালি, কেটারিং, কুটীরশিল্প, প্রুফরিডিং, স্বাস্থ্য ও সেবা, টাইপরাইটিং স্টেনো ইত্যাদি কাজ নারীরা একচেটিয়া কাজের অধিকার পেলে সামাজিক ভারসাম্যের দিক দিয়ে তা যুক্তিসঙ্গত হয়। সেইভাবে জাতীয় নীতিতে মনুষ্য শক্তির সমাবেশ ঘটানো দরকার। অর্থনৈতিক চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে নারী শিক্ষার বিকাশ ঘটাতে হবে।

প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় নারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও জনসংখ্যার তুলনায় এবং পুরুষ শিক্ষার্থীর তুলনায় নারী শিক্ষার্থী এখনো অনেক কম। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, ২০০১ সালে ভারতের লোকসংখ্যা দাঁড়াবে এক শ' কোটি—মধ্যস্তর পর্যন্ত শিক্ষার আওতায় পুরুষ শিক্ষার্থী আসবে ৮৬·৭% এবং নারী শিক্ষার্থী ৭১%, মাধ্যমিক শিক্ষায় পুরুষ শিক্ষার্থী আসবে ৭১·৭%, নারী শিক্ষার্থী ৫৭·৩% কিন্তু শিক্ষার প্রগতিতে ১০০% ভাগ নর-নারীকে আনবার জন্য কোনো জাতীয় উদ্যোগ সমাপ্ত করতে হলে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় তা কুলিয়ে ওঠা মুস্কিল। এইজন্য চাই বিধিবহির্ভূত শিক্ষার কর্মসূচী এবং সেই কর্মসূচীকে অবশ্যই অর্থনীতিমুখীন হতে হবে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত মনুষ্যশক্তিকে লাভজনক দক্ষতামূলক ও উৎপাদনাত্মক কাজকর্মের ভেতর দিয়ে শিক্ষা ও শিক্ষণের ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য প্রত্যেক গ্রামে ও শহরের নির্দিষ্ট এলাকায় বিদ্যালয়কেই 'সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষার' মূলকেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠতে হবে।

নারী সমাজের মুক্তির জন্য আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ পালিত হয়েছে। এঁদের যেসব পৃথক সামাজিক সমস্যা আছে তা দূর করার জন্য চাই বিজ্ঞানভিত্তিক সামাজিক আন্দোলন। গণতান্ত্রিক সমাজের নারীরা ক্রমেই নিজেদের অধিকার ও দায়দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হচ্ছেন। 'পুরুষ-প্রধান সমাজে নারীর বিশেষ

মর্যাদা ও অধিকারকে মান্য করার সংস্কৃতিবোধ উচ্চগ্রামে প্রোথিত করতে হবে। বিগত যুগের সর্ববিধ কুসংস্কার এবং বর্তমান যুগের সর্ববিধ অনাচার অত্যাচারের হাত থেকে নাবী সমাজের সার্বিক মুক্তিব জন্য চাই প্রকৃত জীবন ও জীবিকাধর্মী শিক্ষার প্রসার। এইভাবে নারীর মহত্ত্ব ও উচ্চমর্যাদা সমাজের বুকে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে।

নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা দেখা দেয়, সে সম্পর্কে আরো কিছু বলা দরকার। নারীর দেহ গঠন পুরুষেব মতো নয়। ভারী কাজ, যান্ত্রিক ও কারিগরী দক্ষতার কাজ নারীদের পক্ষে করা সম্ভব হয় না, যদিও ক্ষেত্রবিশেষে ব্যতিক্রমও আছে। নারীর দৈহিক ও মানসিক বিকাশ পুরুষের চেয়ে অনেক দ্রুত। এইজন্য দেখা যায়, একজন পুরুষ সন্তানের চেয়ে নারী সন্তান তাড়াতাড়ি কথাবার্তা বলতে পারে, দৌড়ঝাঁপ করে, বুদ্ধিবৃত্তিতে সে দ্রুত এগিয়ে চলে। পুরুষ সন্তানের ক্ষেত্রে এই অগ্রগতি শ্লথ। বুদ্ধির দিক দিয়ে পুরুষের চেয়ে নারীব বিকাশ ক্ষমতা দ্রুত পরিণতিব দিকে এগিয়ে যায়। এইসব দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে অনেক মনস্তাত্ত্বিক মন্তব্য করেছেন, নাবীও পুরুষের বুদ্ধিবৃত্তির গতিপ্রকৃতিতে মৌলিক পার্থক্য আছে। আমাদের ধারণা, এই পার্থক্য প্রকৃতিগত পার্থক্য হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে না। কারণ, সমাজজীবনে দেখা যায়, যে কোনো কাজে নারীরা পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অগ্রসর হতে পারে না। ট্যাক্সি চালানো, উড়োজাহাজ চালনা করা, বন্দুক ছোঁড়া, সাঁতার কাটা, যুদ্ধের সৈনিক হওয়া, রাষ্ট্রতরণীর কর্ণধার হওয়া, ইঞ্জিনিয়র হওয়া ইত্যাদি ভারী কাজেও নারীরা অগ্রগামী। এমন কি, দৈহিক পরিশ্রমের কাজেও নারীরা পরিশ্রমী, তার প্রমাণ আদিবাসী সমাজের নারী শ্রমিক বাহিনী। আসলে, পুরুষ-শাসিত সমাজে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির স্বার্থপরতার জন্য নারী ও পুরুষে একটা ভেদরেখা টেনে বিচার করা হয়।

আমাদের সমাজের রক্ষণশীল পন্থীরা নারী ও পুরুষের সমান অগ্রগতিকে মর্যাদার চোখে দেখেন না, এইটে নিম্নমানের দৃষ্টিভঙ্গির ফল। এঁরা বলতে চান, নারীকে বাইরের জগতে স্বাধীনভাবে এগিয়ে যেতে দিলে সমাজের সমস্ত ভিত্তিমূল কেঁপে উঠবে। কথায় কথায় নারীর স্বাধীনতা চাই এই ধুয়ো তুললে পারিবারিক জীবনে নানারকমের অশান্তি দেখা দিতে বাধ্য। এই সবের পরিণতিতেই আসছে সামাজিক ভ্রষ্টাচার, পাপাচার, ডিভোর্সের মামলা ইত্যাদি। তাঁদের

অভিযোগ, নারী পুরুষের সমান প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা অর্থনৈতিক জীবনকেও দুর্বিষহ করে তুলেছে, মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটাচ্ছে। এইভাবেই আসছে খাদ্যে ভেজালের সঙ্গে জন্মের মধ্যেও ভেজাল। রক্ষণশীল সমাজের এইসব যুক্তি আসলে নারী সমাজের প্রকৃত মুক্তির অনিবার্য উপাদানগুলিকে উপেক্ষা করার কৌশল।

নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই মৌলিক অধিকার এক ও অভিন্ন। ক্ষমতা ও দক্ষতার বিচারেও অনেক সময় পৃথক মাপকাঠি সুনির্দিষ্ট করা কঠিন। তবে সমাজ জীবনের প্রকৃত কল্যাণের দিকে তাকিয়ে নারী-সমাজের সমস্যাকে বিশেষ সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে সাধারণভাবে নারী সমাজের দ্বারা যেসব কাজ সুষ্ঠুভাবে ও সুন্দরভাবে হয়, সেইগুলি উৎসাহিত করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। সর্বপ্রকার অশুভ উপাদান থেকে সমাজকে পরিচ্ছন্ন রাখার আসল চাবিকাঠি আছে সামাজিক শিক্ষার মধ্যেই।

আধুনিক জীবন এক প্রবল অর্থনীতির জটিলতায় ঘুরপাক খাচ্ছে অবিরত। এক্ষেত্রে নারীদের হতে হবে আদর্শ কন্যা, আদর্শ জায়া, আদর্শ জননী—সেই সঙ্গে তাঁদের হতে হবে পরিবার ও সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়নেরও যোগ্য অংশীদার। সুকুমার কোমল বৃত্তিই নারী হৃদয়ের মূল উপাদান। তাঁর অন্তরের স্নেহশীলতা ও সূক্ষ্ম রুচিশীলতার স্পর্শ একটি পৃথক মর্যাদার দাবী রাখে। তাই, সামাজিক ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নারী সমাজকে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে সমাজ সেবা প্রকল্পে, গ্রামীণ পুণর্গঠনের নানা সূক্ষ্ম ও রুচিশীল কর্মসূচীতে যোগ্য ভূমিকায় অংশ নিয়ে।

আধুনিক যুগ জ্ঞান বিজ্ঞানের যুগ। পর্দানসীন যুগ নয়। জাতিগত বৈষম্য, পণপ্রথা, ভারী গহনার গর্ব, দামী সাড়ী পরার জৌলুষ ইত্যাদির বিরুদ্ধে নারী সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে দেবীর ভূমিকায়। শুদ্ধ সৌন্দর্যের আদর্শ প্রতীক এই নারী সমাজ সামাজিক সৌন্দর্য ও উৎকর্ষের প্রাণপ্রতিমা। আধুনিকতার নামে কোনো মিথ্যাচার বা ভণ্ডামির মধ্যে তাঁদের বিদ্রোহ চাই, সামাজিক স্বাস্থ্যের পক্ষে যা কদর্য ও কুরুচিপূর্ণ তার বিরুদ্ধে চাই নারী সমাজের গণ আন্দোলন। যুগ যুগ ধরে পুরুষেরা নারীর চোখের জলের কোনো মূল্য দেয়

নি, তাকে অন্তঃপুরে নির্বাসিত করে খেলার পুতুল হিসেবে ব্যবহার করে এসেছে দীর্ঘকাল। আধুনিক সমাজে তাই নারীর জন্য চাই মর্যাদার আসন, নারীকেও হতে হবে সমাজের যোগ্য উত্তরাধিকার, বুদ্ধিতে, মেধায়, পরিশ্রমে, যত্নে, স্নেহশীলতায়, ঔদার্যে, নিষ্ঠায়, শক্তিমত্তায়, সৌন্দর্য রচনায়।

বিদ্যালয়ে সহ-শিক্ষা প্রচলনের মধ্য দিয়ে নারী ও পুরুষের একাত্মভূমিকার একটি মূল্যবান সামাজিক দিক আছে। স্বাভাবিক অথচ সুনিয়ন্ত্রিত মেলামেশার ভেতর দিয়ে পরস্পরের সুকুমার বৃত্তিগুলি স্বাভাবিক উদ্‌গতি সাধনের পথ পায়। এ সব ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে, ভ্রষ্টাচার বাড়েনি বরং সামাজিক সুস্থ পরিবেশ অর্জনের পক্ষে এই ব্যবস্থা স্বাভাবিক ও মর্যাদাপূর্ণ বলে প্রমাণিত হয়েছে। তথাপি, নারীদের জন্য বিশেষভাবে আলাদা শিক্ষার সুযোগ প্রসারিত হয়েছে স্বাধীনোত্তর কালে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সহ-শিক্ষা অব্যাহত আছে। নারী শিক্ষার অগ্রগতি সামাজিক অগ্রগতিরই সূচক। তাই, নারী প্রগতির জন্য সুস্থ আন্দোলন সমাজের মঙ্গলের জন্য সকলেরই কাম্য।

## ॥ ১০ ॥

## জাতীয় সংহতি

ভারতবর্ষ একটা বিরাট দেশ। মহাদেশ বললেও অত্যুক্তি হয় না। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতম গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে তার আখ্যা বা পরিচয়। নানা ভাষা নানা জাতি নানা পরিধান, বিবিধের এই মনোভূমিতে আছে ঐক্যপূর্ণ এক সংস্কৃতির যোগসূত্র। এর মনোভূমিতেই আছে সংস্কৃতির বীজ—যা উদার, গণতান্ত্রিক, বস্তুতান্ত্রিক ও নিরপেক্ষতা ধর্মী।

সেই যোগসূত্র সবকিছু বিভিন্নতা ও বিচিত্রতার মধ্যে এনে দিয়েছে পারস্পরিক ঐক্যের এক জাতীয় সমতা। যুগ যুগ ধরে ভারতের বুকে নেমে এসেছে বিচিত্র ধরনের ঘাত ও প্রতিঘাত। তার অন্তরাত্মাকে খণ্ডবিচ্ছিন্ন করে দেবার জন্য তার ভৌগোলিক পরিসীমার উপর এসেছে নানারকমের আঁচড়। তা সত্ত্বেও ভারতবর্ষ তার একটি সাংস্কৃতিক মনোভূমিতে ভাবসংহতি নিয়ে মূর্ত হয়ে আছে একটি উজ্জ্বল দীপশিখার মতো। সুগভীর দেশাত্মবোধ ও জাতীয় চেতনা তার ভাব সংহতিকে এক

সূত্রে বেঁধে রেখেছে। তার প্রতিফলন আধুনিক ভারতের রাজনৈতিক ভূগোলের মধ্যেও বিধৃত। **রামায়ণ মহাভারতের এই মহাদেশ উত্তরে দক্ষিণে পূর্বে পশ্চিমে নানা বৈচিত্র্যের মধ্যেও এক অপূর্ব মননশক্তির উজ্জ্বল উদ্ভাসে সমাচ্ছন্ন।** পরাধীনতার নাগপাশে জড়িয়ে গিয়ে ভারতাত্মার ভেতর যে ঘুণ ও ঘূর্ণী জমেছে, তাকে দূর করাব জন্য চাই দূরদর্শী জাতীয় পরিকল্পনা ও নিরপেক্ষ নীতির ব্যাপ্তি। শ্রীশ্রীঅরবিন্দের ভাষায়—আমাদের সভ্যতা-রথের চারটি চক্র—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। আধুনিক সমাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক দৃষ্টিতে বিজ্ঞানসম্মতভাবে এই নীতির প্রসারণা চাই। সঙ্কীর্ণ অর্থে নয়। ভারতীয় জনগণের জীবন-চক্রকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এই চার—চক্রের ধারায়—দুরন্ত গতিতে, অনিবার্য নির্দেশনায়।

ইংরেজ আমলে ভারতবর্ষের যে সুমহান ভৌগোলিক দিগন্ত ছিল তা খণ্ডবিচ্ছিন্ন হলেও এই উপ-মহাদেশে একই সাংস্কৃতিক চেতনা বিস্তৃত হয়ে আছে, যা ভারতবর্ষের যুগ যুগান্তের ঐতিহ্য ও মানব-সংস্কৃতিরই অবদান। এই মানসিকতাকে বিনষ্ট করে দেবার ষড়যন্ত্র কখনো বরদাস্ত করা যায় না।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমরা এক গণতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করেছি, যার কেন্দ্রভূমি ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকার। বিভিন্ন প্রদেশে নির্বাচিত সরকার থাকলেও কেন্দ্রীয় নীতি থেকে কেউ বিচ্ছিন্ন নয়। অথচ দেশের অভ্যন্তরে কিছু বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি ভারতের অখণ্ড ঐক্যকে পর্যদুস্ত করতে চায় নানা অজুহাতে—ধর্ম নিয়ে, ভাষা নিয়ে, জাতপাত নিয়ে, আঞ্চলিকতা নিয়ে এই ধরনের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়েছে বিভিন্ন সময়। এর ভেতর নানারকমের কূটনীতিও কাজ করছে—অনেক সময় বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে দেখা দিচ্ছে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম—সম্পত্তি নাশ, জীবননাশ, লুঠতরাজ ইত্যাদি আখছার ঘটছে।

**ভারতের জনগণের সার্বিক ঐক্য বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন আছে সুসংগঠিত ও শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের যা প্রতিষ্ঠিত থাকবে জাতীয় নীতির উপর ভিত্তি করে, কোনো সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা চালিত হয়ে নয়।** রাজ্যে রাজ্যে প্রাদেশিক সরকার থাকলেও এবং সংবিধান সম্মতভাবে কেন্দ্র ও রাজ্যের দায়দায়িত্ব ও ক্ষমতার ব্যাখ্যা সত্ত্বেও লক্ষ্য রাখতে হবে কিভাবে সংবিধানে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিগুলি দেশের সামগ্রিক স্বার্থে

সমস্ত রাজ্যের জনগণের সার্বিক অধিকারের প্রতি সশ্রদ্ধ হয়। এত বড়ো বিরাট দেশে কেন্দ্রীয় সরকারের একার পক্ষে সর্বপ্রকার ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখা সম্ভব নয়। প্রত্যেক রাজ্যের উপর নির্ভর করে চলতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে, দেখতে হবে জাতীয় নীতি রাজ্যস্তরে কার্যকরী হচ্ছে কিনা। সেজন্য রাজ্যের হাতে পক্ষপাতহীনভাবে আর্থিক সঙ্গতি থাকা চাই এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন ও রূপায়ণের ব্যাপারে রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা থাকা বাঞ্ছনীয়। কেননা, রাজ্য সরকার জনগণের একেবারে নীচের স্তরে থেকেই কাজ করেন। জাতীয় সংহতি ও ঐক্য বজায় রাখার স্বার্থে এবং দেশের অনগ্রসর এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত হবে রাজ্য সরকারগুলিকে সংবিধানসম্মত উপায়ে পক্ষপাতহীনভাবে সাহায্য করা। সাংবিধানিক ক্ষমতার কোনো অপব্যবহার যেন না হয়। সংবিধানের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি যেন কাগজে-কলমের ব্যাপার না হয়। এক একটি এলাকার বিশেষ বিশেষ সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য কেন্দ্রকে সহনশীল মনোভাবের পরিচয় দিতে হবে। যেহেতু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠেছে, অনেক সময় কেন্দ্রের রাজনৈতিক পরিচয়ের সঙ্গে বিভিন্ন রাজ্যের রাজনৈতিক পরিচয় একরকম নাও হতে পারে। বিভিন্ন দলকে নির্বাচিত করার অধিকার আছে জনগণের। এক সময় গেছে যখন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের প্রভাবাধীন। কিন্তু এই জিনিস সবসময় বজায় থাকার কথা নয়, যেহেতু সংবিধানেই স্বীকৃতি আছে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের স্বাধীনতার। রাজনৈতিক মতবাদের ঐকীকরণের মধ্য দিয়ে জাতীয় ঐক্য ও সংহতিকে ধরে রাখার প্রচেষ্টা ঠিক নয়। জাতীয় ঐক্য ও সংহতির মনোভূমিতে থাকবে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী। যখনই যে সরকার রাজ্যে হোক আর কেন্দ্রে হোক অধিক সংখ্যক ভোটে নির্বাচিত হয়ে সরকার গড়বেন, তখনই তার চরিত্রগত রূপ যেন দলীয় না হয়। তাকে হতে হবে জাতীয়। সেই সরকারের সমস্ত কাজকর্ম রাজনীতিগতভাবে হবে রাজ্যপাল, বিচারপতি, রাষ্ট্রপতি প্রভৃতির মতো নৈর্ব্যক্তিক ভূমিকায়। কোনো প্রাদেশিক সরকার জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী কাজ করলে তাকে খারিজ করার অধিকার নিশ্চয় থাকবে কেন্দ্রীয় সরকারের কিন্তু

তা যেন পক্ষপাতদুষ্ট না হয়, এ জিনিস একান্তভাবেই যেন জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে সংবিধানসম্মত হয়। প্রাদেশিক সরকারের কোনো বক্তব্য থাকলে তা প্রকাশ্য-ভাবে যেন জনগণ জানতে পারেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার কোনো প্রাদেশিক সরকার খারিজ করার পূর্বে যেন সুপ্রীম কোর্টের কাছে প্রাদেশিক সরকারের বক্তব্য যাচাই করে নেন, তাহলে অযথা বিতর্ক হবে না।

ভারতের জনগণ সার্বিকভাবে ভারতের ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এই প্রমাণ পাওয়া গেছে চৈনিক ও পাক আক্রমণের সময়, এমন কি বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়। ভারতের ঐক্য রক্ষার তাগিদে জনগণ যে কোনো কঠিন আত্মত্যাগে পরাঙ্মুখ নন, এ প্রমাণ বারংবার পাওয়া গেছে। তবুও দেশের অভ্যন্তরে কোনো-না-কোনো ছুতোয় এবং রাজনৈতিক উস্কানিতে ধর্ম, ভাষা ও আঞ্চলিকতা নিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি মাথা চাড়া দেয়। এর সর্বশেষ প্রমাণ আসামের আন্দোলন। স্থানীয় দাবীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের আড়ালে ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার গোপন বাসনা পোষণ করে জাতীয় প্রবাহধারা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার জন্য সংকীর্ণ অর্থনৈতিক অবরোধের পরিকল্পনা আসামের জনগণেরই অগ্রগতিকে সবার আগে পিছিয়ে দিয়েছে কি না খতিয়ে দেখা দরকার। রাষ্ট্রনেতাদেরও একটি দায়দায়িত্ব আছে। এই আন্দোলনের আড়ালে সত্যই স্থানীয়ভাবে জনগণের প্রতি অবিচার ও অসাম্য করা হয়েছে কি না অথবা ব্যাপারটি সমগ্র দেশের বিভিন্ন এলাকার মৌলিক প্রশ্নেরই সামিল, তা খতিয়ে দেখে সেইভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে আসা উচিত এবং যে কোনো মূল্যে ভারতের ঐক্য ও সংহতিকে বজায় রাখা উচিত। মুষ্টিমেয় জনগোষ্ঠীর আন্দোলনকে জনগণের আন্দোলন হিসেবে না দেখাই উচিত। তবে দেখতে হবে কোথায় কোনো যুক্তিসঙ্গত ভিত্তিতে জনগণের মধ্যে অসন্তোষ দানা বেঁধেছে অথবা তা কোনো চক্রান্ত বা উস্কানির সামিল। এত বড়ো বিরাট দেশে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য রাজ্য, জেলা ও পঞ্চায়েত পর্যায় পর্যন্ত ক্ষমতা ও দায়দায়িত্বের সুষ্ঠু বিভাজন দরকার এবং কেন্দ্রীয় পর্যায় পর্যন্ত সুষ্ঠু সমন্বয়, তদারকী ও পর্যালোচনার ব্যবস্থা থাকা দরকার।

যে সব আন্দোলনের পশ্চাতে বৈজ্ঞানিক বাস্তবজনোচিত দৃষ্টিভঙ্গির অভাব, জাতীয় ঐক্য ও সংহতির পক্ষে ক্ষতিকারক, সেইসব আন্দোলন চূরমার করে দেবার জন্য রাজনীতিগতভাবে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে ব্যবস্থা নেওয়া অন্যায়

নয়। জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষাকে সমাজের বিশেষ সুবিধাভোগী জন অংশের স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়ে স্বৈরতান্ত্রিক উপায়ে সমস্যাব মোকাবিলা করার চেষ্টা হলে তা সাময়িক উত্তেজনা হ্রাসের পক্ষে সহায় কিঞ্চিমাত হলেও এর ফল মারাত্মক হয়। লাঠি, গুলি, কাঁদানে গ্যাস সমস্যা সমাধানের পথ নয়। পথ জনগণে' সার্বিক আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণে সত্যিকার পক্ষপাতহীন বলিষ্ঠ পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে। তা না হলে দেশেব যে কোনো প্রান্তে যে কোনো সময় যে কোনো অজুহাতে জনবিস্ফোরণ ঘটতে পারে মতলববাজদেব উস্কানিতে। এর ফলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অন্যান্য কাজ পিছিয়ে যায এবং জাতি হিসেবে আমরা এক সমস্যা থেকে আরেক সমস্যার জাঁতাকলে জড়িযে যাই।

জাতীয় ঐক্য ও সংহতিব ক্ষেত্রে প্রধানতম বাধা হোলো সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতা, সঙ্কীর্ণ ধর্মীয় চেতনা ও সঙ্কীর্ণ বাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি। সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতা প্রধানতঃ দেখা যায ভাষাব প্রশ্নে এবং আঞ্চলিক অধিকাব রক্ষার দাবীতে।

ভাবতেব ভাষা সমস্যা সত্যই জটিল। সবকারী পর্যায়ে হিন্দী রাষ্ট্রভাষা ও ইংরাজি ভাষা সংযোগবক্ষাকারী প্রধান ভাষা। ভাবতেব দক্ষিণাঞ্চল ও পশ্চিমবঙ্গ সহ পূর্বাঞ্চলের কিছু এলাকায হিন্দী ভাষার প্রতি টান নেই। এর উপর নিজ নিজ প্রদেশেব মাতৃভাষা তো আছেই। কোনো কোনো রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে একাধিক মাতৃভাষা, এক এক জনগোষ্ঠীব এক এক বকম ভাষা। যেমন, পশ্চিমবঙ্গে সাঁওতালী, নেপালী, ইংরাজি, হিন্দী প্রভৃতি ভাষা একটি সুসংহত জনগোষ্ঠীর ভাষা। এইসব জটিলতার জন্য স্কুল কলেজে ভাষার স্থান কি হবে সে নিয়ে নানারকম টানাপোড়েন আছে। আমাদের বিবেচনায় স্কুল কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজ নিজ মাতৃভাষাব মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া উচিত। যেখানে একাধিক ভাষা, সেখানে মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষার সুযোগ মেনে নিতে হয়। হিন্দী ভাষা রাষ্ট্রভাষা হলেও বুদ্ধিজীবিদের ব্যাপকতম অংশের পক্ষে এবং অহিন্দীভাষীদের পক্ষে ভারতীয় ইংরাজী ভাষা **সংযোগরক্ষাকারী ভাষা** হিসেবে অব্যাহত থাকা উচিত। এই সংযোগরক্ষাকারী ভাষা বিদ্যালয়েব প্রাথমিক পর্যায় থেকে শিক্ষা দেওয়াব কোনো সার্থকতা নেই। মাধ্যমিক স্তরে এই ভাষা কার্যকবী হিসেবে এবং পরবর্তী পর্যাযে বিশেষভাবে যারা সেই ভাষা শিক্ষা করতে চায় তাদের জন্য ব্যবহাব করা যেতে পারে। জ্ঞানবিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ আহরণের জন্য ইংরাজি অথবা অন্য কোনো আন্তর্জাতিক ভাষা শিক্ষাদানের

ব্যবস্থা থাকা উচিত মাধ্যমিক পর্যায় থেকে। এ ছাড়া, রাষ্ট্রভাষাকেও কার্যকরী ভাষা হিসেবে শিক্ষায় গ্রহণ করতে আপত্তি নেই। দক্ষিণ অঞ্চল ও অ-হিন্দী-ভাষীরা যেমন হিন্দী শিখবে, তেমনি হিন্দী এলাকায় অন্য যে কোনো একটি প্রাদেশিক ভাষা শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। জাতীয় সংহতি এইভাবেই গড়ে উঠতে পারে। ইংরেজি হঠাও আর হিন্দী চাপাও, এই ধরনের জোর-জবরদস্তি জিগির ভারতীয় ঐক্য ও ভাব সংহতির পক্ষে ক্ষতিকারক। যুক্তিসিদ্ধ ভাষা-নীতিই আমাদের একান্ত কাম্য।

ধর্মের ব্যাপারে এইটে বলা যায়, ভারতের সাংবিধানিক আদর্শে ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রীয় আদর্শের কথা আছে। সকল ধর্মমতের স্বাধীনতা এখানে মেনে নেওয়া হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ধর্মহীনতা নয়, বরং শ্রেষ্ঠ সার্বজনীন আদর্শেরই অভিব্যক্তি। স্কুল কলেজের শিক্ষায় কোনো বিশেষ ধর্মমতের প্রাধান্য থাকা উচিত নয়, বরং শিক্ষার নানা স্তরে সর্বধর্মসমন্বয়ের আদর্শে ধর্মকে বিজ্ঞানভিত্তিক দৃষ্টিতে বিচার করে তুলনামূলক পারস্পরিক লেনদেনের সংযোগসেতুর সাংস্কৃতিক উপাদান হিসেবে গ্রহণ করা যায়। বর্তমান যুগের মূল্যবোধ সমাজতান্ত্রিক আদর্শের দিকেই প্রবাহিত। এর যে সব সক্রিয় মাধ্যম আছে—পরিবার, বিদ্যালয়, সমাজ, গোষ্ঠী, পরিবেষ্টনী ইত্যাদি, সেইসব মাধ্যমের ভেতর দিয়ে ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক নতুন যুগাদর্শের দিকে এগিয়ে যেতে হবে, সঙ্কীর্ণ ধর্মীয় অন্ধতার ভেতর দিয়ে নয়। শিক্ষার কর্মসূচীতে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ জাগিয়ে দেবার ব্যবস্থা রাখতে হবে। সেই ব্যবস্থা হবে রাষ্ট্রীয় ধর্ম-নিরপেক্ষ আদর্শের ভিত্তিতে। রাজনৈতিক বা ধর্মীয় সমাজবাদ নয়, ইস্কুল কলেজের পাঠ্যসূচীর মাধ্যমে জাগিয়ে দিতে হবে সার্বজনীন আদর্শের প্রেরণা ও বিজ্ঞান-ভিত্তিক মানসিকতা। বিদ্যালয়ের পরিবেষ্টনীতে বিধিমাফিক ও বিধিবহির্ভূত নানা কর্মানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এমন এক গণতান্ত্রিক-ধর্মনিরপেক্ষ-রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক বিজ্ঞানধর্মী চেতনা জাগিয়ে দিতে হবে, যার সঙ্গে শিক্ষার্থীর গৃহগত পরিবেশের ক্ষেত্রে বিরোধের ব্যাপার না হয়ে বরং পরিবার ও বিদ্যালয়কে একাত্ম করে দেবে। এইভাবেই আসতে পারে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি।

শিশুরা বিদ্যালয় ও গৃহগত পরিবেশের প্রভাবেই স্বৈরাচার, ধর্মান্ধতা,

কুসংস্কার, রক্ষণশীলতা প্রভৃতি সামাজিক ধ্যানধারণায় অভ্যস্ত হয়—এইজন্য বিদ্যালয় ও গৃহগত পরিবেশের ভেতর থেকেই ধর্মনিরপেক্ষ উদার সার্বজনীন বিজ্ঞানসম্মত মানসিকতা সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন সর্বজনগোষ্ঠীর কল্যানে পাঠ্যধারার এক ঐকীকরণ বিন্যাস। সামগ্রিক উন্নয়নেব মাধ্যমেই সঙ্কীর্ণ বৈষম্য ও অস্কতা দূরীভূত হতে পারে।

**অর্থনীতিই সামাজিক বৈষম্যের একটি মূল উপাদান। তাই, সমাজের ভেতব থেকে গুণগত পরিবর্তন আনতে গেলে অর্থনীতিকে সমাজধর্মী করে তুলতে হবে এবং সেইজন্য চাই ইস্কুল কলেজের শিক্ষায় সামাজিক দিক দিয়ে ফলপ্রদ অভিজ্ঞতাভিত্তিক বিজ্ঞানসম্মত উৎপাদনাত্মক শিক্ষা। 'কমন স্কুল সিস্টেম' বলতে যা বোঝায় তাই দরকার জাতীয় সংহতির স্বার্থে।** ভাবতীয় জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তোলার জন্য যেমন চাই একই জাতীয় পতাকা, একই জাতীয় সঙ্গীত, একই শিক্ষা ব্যবস্থা, একই আইন ধারা ও নীতি নির্দেশ, তেমনি গণচেতনার বিস্তারের জন্য স্থানীয় সংস্কৃতি ও সামাজিক বৈশিষ্ট্যকেও মূল্য দিতে হবে জাতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে, সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিতে নয়। ভারতবর্ষ যেন এক অখণ্ড নেশন হিসেবে দানা বাঁধতে পারে। এক একটি ভাষাভাষী এলাকা যেন এক একটি পৃথক নেশন বা জাতি, এই ধরনের প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা আমাদের জাতীয় ঐক্যের পক্ষে ক্ষতিকর। **ভাষা ও ধর্মের ভিত্তিতে ভারতের মানচিত্রের পুণর্বিন্যাস সম্ভব নয়। একমাত্র রাষ্ট্রীয় আদর্শে আঞ্চলিক উন্নয়নকে প্রাধান্য দিয়ে ক্ষমতার যথার্থ বিকেন্দ্রীকরণের সাহায্যে কেন্দ্রীকরণ করাই ভারতের ঐক্য ও স.হতির পক্ষে সুস্থ প্রস্তাব।**

ভারতীয় জাতীয়তাবোধের সম্প্রসারণের জন্য এক এলাকার সঙ্গে আরেক এলাকার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ও মেলামেশার তাগিদে চাই সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান। পর্যটন ব্যবস্থার ব্যাপক প্রসার। পর্যটনকে ধর্ম-নিরপেক্ষ উদারতার মাপকাঠিতে জনপ্রিয় করে তোলা। খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক চিন্তাধারার আদান-প্রদান বাড়িয়ে দেওয়া। এইসব পদ্ধতির মধ্য দিয়েই ভারতের মানসিকতায় এক নতুন চিন্তা-বিপ্লব দেখা দিতে পারে—সেই চিন্তাবিপ্লবের ভিত্তিতে আসবে বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে ঐক্যবোধ। সুস্থ সাংস্কৃতিক উজ্জীবনের মধ্য দিয়ে আসবে প্রকৃত জাতীয় ঐক্য ও সংহতি।

## ॥ ১১ ॥

## বৃত্তিগত যোগ্যতার শিক্ষা

কোঠারি কমিশনের ভাষায় বলা যেতে পারে, শিক্ষাই একপ্রকার জাতীয় উন্নয়ন। সামাজিক পরিবর্তনের প্রধান হাতিয়ার। আধুনিক যুগের দাবী, শিক্ষাকে জীবনধর্মী হতে গেলে তাকে জীবিকাধর্মী করে গড়ে তুলতে হবে। সামাজিক দিক দিয়ে উন্নয়নমূলক, ফলপ্রদ উৎপাদনাত্মক সৃষ্টিশীল শিক্ষার ভেতর দিয়েই আসতে পারে জাতীয় উন্নয়ন ও সামাজিক পরিবর্তন।

মানুষের জ্ঞানবিজ্ঞান চিন্তাভাবনা সব কিছুই কিসের জন্য? মানুষ যাতে ভালোভাবে বাঁচতে পারে সেই জন্যই তো। জীবন চর্চার মধ্য দিয়েই ভালোভাবে বাঁচবার কৌশল আয়ত্ত করার জন্য শিক্ষার্থীকে জানতে হয় **বাঁচবার কৌশল**। এইজন্যে বিদ্যালয়ের সঙ্গে চাই পরিবেশ ও বৃহত্তর পরিবেশের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন। বিদ্যালয় হবে এমন যোগ্যতাসম্পন্ন উৎপাদনাত্মক কলাকৌশল আয়ত্ত করার কেন্দ্র, যেখানে শিক্ষা গ্রহণ করে শিক্ষার্থী তার পরবর্তী জীবনে ভালোভাবে বাঁচতে পারে এবং জাতীয় পুণর্গঠনে আত্মনিয়োগ করতে পারে। শিক্ষার এই অর্থনৈতিক দিক বাদ দিয়ে চিন্তা করা যায় না। জ্ঞানের নিছক কচকচানিতে মানুষের পেট ভরবে না। এই যুক্তির আলোকেই বিদ্যালয়কে সমাজ জীবনের কর্মমুখর প্রাণকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

শিক্ষাবিদেরা এই ভাবনা চিন্তা থেকে বিদ্যালয়ের সাধারণ ভিত্তিভূমিতে বৃত্তিমুখী শিক্ষার উপর ঝোঁক সৃষ্টির জন্য অনুকূল পরিবেশ গঠনের আবেদন জানিয়েছেন। সাধারণ শিক্ষা ও বৃত্তিমুখী শিক্ষায় মিশ্র এবং পৃথক পৃথক কর্মসূচীতে স্বাধীনতার সুযোগ রক্ষা করে বৃত্তিমুখী একটি মেজাজ নিয়ে জীবনের পরবর্তী পদক্ষেপে বহুমুখী ধারায় বেরিয়ে যাওয়ার সংহত কর্মসূচী গ্রহণের প্রস্তাব স্বীকৃতি পেয়েছে।

শিক্ষাদর্শনের মূল কথা, শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত হবে দৈনন্দিন জীবনধারার বাস্তবধর্মী চর্চা। এই নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই শিক্ষার অর্থনৈতিক বাস্তবধর্মী কর্মসূচীই সত্যিকারের কাম্য হওয়া উচিত। পরাধীন ভারতের শিক্ষার চাহিদা ও উদ্দেশ্যাবলী একটি স্বাধীন জাতির পক্ষে একেবারেই অনুপযুক্ত। প্রচলিত ধারার উপর রংপালিশ করে একটা সংস্কার সাধনে কোনো লাভ নেই। দরকার

একেবারে দিগন্ত বিস্তারী পরিবর্তন। শিক্ষার দিগ্‌দর্শনকে একেবারে জনগণের চাহিদার সঙ্গে সংযুক্ত করে নতুনভাবে ঢেলে সাজাতে হবে। শিক্ষার্থীর বৃত্তিগত যোগ্যতার শিক্ষা এইরকম একটা জিনিস, যা তার জীবনচর্চা ও ভালোভাবে বেঁচেবর্তে থাকার প্রধান চাবিকাঠি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিস্তার যুগে নিছক কেতাবী শিক্ষাব কোনো মূল্য নেই। **শিক্ষার্থীকে দিতে হবে এমন একটা মানসিক পশ্চাৎভূমি, এমন একটা বিজ্ঞান-প্রযুক্তিধর্মী সাধারণ দক্ষতা অর্জনের মেজাজ, যা তাকে বাস্তববাদী ও অভিজ্ঞতাধর্মী এবং সমাজ সম্পর্ক নির্ণয়ের অন্যতম স্রষ্টা হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। এরই নাম 'যথার্থ শিক্ষা।**

শিক্ষার পরিকল্পনা হবে এমন যাতে করে সমগ্র জনগোষ্ঠীকেই মূল্যবান উপাদান হিসেবে কাজে লাগানো যায়। শিক্ষা কি শুধু মুখস্থ বিদ্যার গলিত চর্বন? যারা উৎপাদনাত্মক পদ্ধতি জেনে দেশ গঠনে ও জীবনযাত্রা মান উন্নয়নে সহায়ক হতে পারে তারাই তো সত্যিকার আধুনিক যুগের দাবী ও চাহিদার প্রতি অনুরক্ত হতে পাবে। শিক্ষার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বিশেষ শিক্ষণের যে দিকেব কথাই ভাবা যাক না কেন, সামাজিক মূল্যবোধ উপেক্ষা করে শিক্ষা কখনো জাতির আশা আকাঙ্খা পূরণ করতে পাববে না।

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায সমাজের একশ্রেণীর সুবিধাভোগীরই লাভ হচ্ছে। ব্যাপক জনসাধারণের দিকে লক্ষ্য রাখা হয নি। ফলে একদিকে বাড়ছে শিক্ষিত বেকার, যারা কোনো বিষয়ে দক্ষ নয়, শুধু কাগজে-কলমে লম্বা চওড়া ডিগ্রীধারী। অন্যদিকে দেশের বৃহত্তম জনগণের জন্য নেই পরিকল্পিতভাবে বিশেষ বিশেষ দক্ষতা অর্জনের জন্য শিক্ষণের ঢালাও ব্যবস্থা। সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাকে এইজন্য নিচু পর্যায় থেকে এমনভাবে ঢেলে সাজানো দবকার যার ফলে সমগ্র শিক্ষাপর্বই হবে এক ধরনের 'নির্বাচিত' ব্যাপার। যার যে দিকে ঝোঁক বা প্রবণতা সেদিকে যাবার জন্য খোলা থাকবে নানা রকমের দবজা। সেই সঙ্গে অর্জিত হবে মজবুত সাধারণ ভিত্তিভূমির শিক্ষা। অনেক বেশি ব্যয় করে এবং অনেক সময় ব্যয় করে পেশাদারী প্রশিক্ষণেব পর পেশাদারদের এমন কাজে নিয়োগ করা হয়, যার জন্য এত দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষণের প্রয়োজন ছিল না। এইভাবে জনশক্তির কি বিপুল অপচয় হচ্ছে তা চিন্তা করা যায় না। সময়, অর্থ—সবই নষ্ট হচ্ছে অযথা।

সামাজিক চাহিদার দিকে তাকিয়ে **মধ্যম শ্রেণীর পেশাদার শিক্ষণের স্বল্পমেয়াদী ব্যবস্থা** দেশের সার্বিক পুনর্গঠনের জন্য বেশি প্রয়োজন। অথচ এই জিনিসটি অবহেলা করা হয়েছে এতদিন। শিক্ষার জনমুখীন স্বার্থ হোলো, কিভাবে সত্বর সারা দেশের জনগণের শতকরা ১০০ ভাগকে ব্যবহারিক স্বাক্ষরতার শিক্ষা দেওয়া যায়। সেই সঙ্গে স্বল্পমেয়াদী কিছু উৎপাদনাত্মক প্রশিক্ষণ। মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করে বৃত্তিমূলক শিক্ষার দিকে যাওয়ার একটা মানসিক প্রস্তুতি গড়ে তোলা দরকার আছে। সেইসঙ্গে পেশাদারী কাজের শিক্ষণে ব্যয় সঙ্কোচ করে সামাজিক দিক দিয়ে ফলপ্রদ শিক্ষণের জন্য স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার প্রয়োজন আছে।

সর্বস্তরের শিক্ষার পাঠ্যসূচীতে চাই **সৃজনশীল শিক্ষার** দিকেই ঝোঁক—অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সহজভাবে স্বাধীনভাবে, অনেকটা 'ক্যাকেটেরিয়া' ধরনের ব্যবস্থাপনায় জনগণের বিরাট একটা অংশ যাতে বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে এক এক এলাকায় এক একটি সামাজিক-অর্থ নৈতিক-শিক্ষাগত কেন্দ্র গড়ে তুলতে পারে সেই দিকেও দৃষ্টি দেওয়া দরকার। এই ব্যবস্থাপনা বিধিমাফিক শিক্ষার পরিবর্তে একটা দিনরাত্রির কর্মশালার মতো ব্যাপার হয়ে উঠবে। শিক্ষণ-কাজ-শিক্ষণ এই নীতিতে চলবে শিক্ষার অব্যাহত ধারা, সকল পর্যায়েই। শিক্ষার যা কিছু বিষয়বস্তু তা হবে জীবনধর্মী, অভিজ্ঞতা ভিত্তিক, সমাজধর্মী, নীতিধর্মী, অর্থনীতিমুখীন, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে যুগ মূল্যবোধের অনুসারী।

'ওয়ার্ক-একস্‌পিরিয়েন্স' বা 'কর্মভিত্তিক অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে বিভিন্ন জ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। শিক্ষার এই সর্বাধুনিক নীতি মান্য করে সারা দেশের জন্য একই ধাঁচের শিক্ষা পরিকল্পনা চালু করে শিক্ষা ও বৃত্তিগত প্রশিক্ষণ এবং জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে প্রবেশের ব্যাপারটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে। এইভাবে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাকে যুক্তিধর্মী, ঐক্যমুখী, বাস্তববাদী, প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানধর্মী, সংস্কৃতিমুখী, সৃষ্টিশীল ও অভিজ্ঞতাধর্মী করে গড়ে তুলতে হবে। এই বাস্তববাদী শিক্ষা পরিকল্পনার জন্য চাই বিজ্ঞানভিত্তিক দার্শনিক দূরদৃষ্টি। শিক্ষাদর্শন হবে ব্যবহারিক যুক্তিধর্মী শিক্ষা দর্শন।

ভারতের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার বাস্তব পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, এদেশে শতকরা ৬০ জন শিক্ষার্থী প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাটুকুও সমাপ্ত না করে

পড়াশোনা ছেড়ে দেয়। বড় জোর শতকরা ২৫ জন শিক্ষার্থী অষ্টম মানের শিক্ষা নিতে পারে। এদের মধ্যে আবার শতকরা ১০ জন ম্যাট্রিক স্তর পর্যন্ত পৌছুতে পারে আর মাত্র এক ভাগ বা দুই ভাগ শিক্ষার্থী যায় উচ্চশিক্ষার দিকে। অথচ কি আশ্চর্যের বিষয়, গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠ্যসূচী এমনভাবে তৈরি, তা এই এক ভাগ বা দুই ভাগ শিক্ষার্থীদের দিকে তাকিয়েই রচিত। সমাজের বিপুলতম অংশের আশা-আকাঙ্খার দিকে আদৌ তাকানো হয়নি। শিক্ষা ব্যবস্থার ভেতর এইটে এত বড়ো ক্রুটি যা জঘন্যতম অপবাধের সামিল। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা আদৌ উৎপাদনমুখী তো নয়ই, বরং উৎপাদন-বিরোধী, সংবিধানের আদর্শ বিবোধী, ভারতের বাস্তব সামাজিক অবস্থার বিরোধী, এক কথায় ব্যবস্থাপনাটা একশ্রেণীর সুচতুব সুবিধাভোগী সমাজেব জাতিকে হত্যা করার সুপরিকল্পিত কলা বৈভব ছাড়া অন্য কিছু নয়।

সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থাকে জনমুখীন ও উদ্দেশ্যবাহী করার জন্য এবং সমাজের ধনবৈষম্যের ফারাক দূর করে শিক্ষাকে পুনর্গঠন ও প্রগতির অঙ্গ হিসেবে গণ্য করাব জন্য বিধিমাফিক ও বিধিবহির্ভূত শিক্ষার মধ্যে নতুন ব্যবস্থাপনা গডে তুলতে হবে। যারা বিধিমাফিক শিক্ষা নিয়ে পডাশোনা অব্যাহত রাখতে পারবে না, তাদের জন্য চাই বৃত্তিমুখীন প্রশিক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা। আর যারা উচ্চ শিক্ষার সাধারণমুখী দিকে যেতে চায় তাদের জন্যেও রাখতে হবে ব্যবস্থা। এই অবস্থায় শিক্ষার কাঠামোর ভেতরেই চাই দুইটি সমান্তরাল স্তর—সাধারণমুখী শিক্ষা আর বৃত্তিমুখীন শিক্ষা। গ্রামীণ পুনর্গঠনের কথা বিবেচনা কবে গ্রামাঞ্চলে চাই সাধারণ ও বৃত্তিমুখীন শিক্ষার মিশ্র পাঠ্যসূচী নেওয়ার স্বাধীন ও অবাধ সুযোগ। প্রচলিত সাধারণ শিক্ষার ক্রুটি হোলো, এখানে সাধারণ শিক্ষার্থী যাবা পড়াশোনা শেষ করে বেরিয়ে আর উচ্চ শিক্ষায় যাবে না, তাদের জন্যে নেই কোনো বৃত্তিগত শিক্ষণের সুযোগ। বৃত্তিগত শিক্ষণের কোনো মেজাজও তাদের তৈরি করার সুযোগ নেই। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত বা অসমাপ্ত রেখে যারা বেরিয়ে আসে তাদের জন্য আধা-দক্ষতার প্রশিক্ষণের জন্য চাই বিধিবহির্ভূত শিক্ষার পরিকল্পিত ব্যবস্থা। প্রত্যেক এলাকায় এদের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা উচিত। আধুনিক অর্থনৈতিক

উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গ্রামীণ অঞ্চলের সুযোগ সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে কিভাবে আধা-পেশাদারী মধ্যম শ্রেণীর কাজের সুযোগ বাড়ানো যায় সেইদিকে লক্ষ্য করে জাতীয় পরিকল্পনা চাই। দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা যারা সমাপ্ত করবে তাদের জন্য চাই ব্যবহারিক কার্যকরী জ্ঞানের শিক্ষা। সেই সঙ্গে ভবিষ্যৎ বৃত্তি শিক্ষার দিকে যাবার জন্য একটা মানসিক প্রস্তুতির শিক্ষণ। ব্যবহারিক দক্ষতা এখানে এমনভাবে অর্জিত হবে তা ঠিক ক্ষুদে বিশেষজ্ঞ হওয়ার মতো শিক্ষণ নয়। কিন্তু, শিক্ষার্থীকে এমনভাবে মজবুত করে তোলা প্রয়োজন আছে যার সাহায্যে সে পরবর্তী বৃত্তিমুখীন শিক্ষার দিকে একটা বেশ পাকাপোক্ত ভিত্তি অর্জন করতে পারে।

যারা দশম শ্রেণীর পর শিক্ষা অব্যাহত রাখতে পারবে না, তারা যাতে বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে এসে স্বল্পকালীন আধা পেশাদারী শিক্ষণের সুযোগ পায় সেইজন্য এক বছরের কর্মসূচী ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা যেতে পারে। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচী হবে বহুমুখী। সাধারণ অ্যাকাডেমিক দক্ষতার কাজ থেকে শুরু করে ব্যবহারিক দক্ষতার নানা শ্রেণীর কাজ। +২ পর্যায়ে বড় জোর শিক্ষার্থীদের ২৫% ভাগ আসবে। কিন্তু, এদের জন্যও চাই এমন শিক্ষণ ব্যবস্থা, যার ভেতর থাকবে প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, মানবিক বিদ্যা, জীবন-বিজ্ঞান, প্রকৃতি বিজ্ঞান প্রভৃতির শিক্ষা। উচ্চতর পেশাদারী শিক্ষার প্রস্তুতি পর্ব হিসেবে এই প্রশিক্ষণ হবে বেশ গোছালো এবং মজবুত। তবে এই পর্যায়কে কখনো বিশেষজ্ঞ তৈরির বৃত্তিগত যোগ্যতা অর্জনের শিক্ষা হিসেবে গণ্য করা উচিত হবে না। এই স্তরের শিক্ষা সমাপ্ত করে শিক্ষার্থীরা যাতে তিন চার বছরের মেয়াদের উচ্চতর পেশাদারী শিক্ষায় যেতে পারে সেইভাবে প্রস্তুত করতে হবে।

এর পরে উর্ধমুখী আরো উচ্চ স্তরের পেশাদারী শিক্ষায় শিক্ষণীয় বিষয় কেন্দ্রীভূত হবে কোনো এক বিষয়ের সীমাবদ্ধ এলাকায়। মোদ্দা কথা, শিক্ষার কাঠামো এমনভাবে সুবিন্যস্ত করতে হবে যার মধ্য দিয়ে সাধারণ ও পেশাদারী শিক্ষার বহুমুখী দরজা দিয়ে শিক্ষার্থীরা বেরিয়ে যাবে, কেউ যাবে বৃত্তিমুখীন উচ্চশিক্ষায় বা সাধারণ শিক্ষায়, কেউ যাবে স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণের পর জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে। এইভাবে জনশক্তির প্রাণপ্রাচুর্যকে ক্ষয়ের হাত থেকে বাঁচিয়ে সমগ্র জনশক্তিকেই দেশের উৎপাদনমুখী পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি

স্থাপন কবতে হবে। এই ধরনের ব্যবস্থাপনার ভেতর দিয়ে সমাজজীবনে বেরিযে আসবে তিন ধরনেব শিক্ষার্থী—

(১) যারা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তর পার হয়ে বেরিযে আসবে।

(২) যারা মাধ্যমিক ও কারিগরী শিক্ষণ নিয়ে বেরিযে আসবে।

(৩) যারা সাধারণ ও উচ্চতর পেশাদারী শিক্ষণ নিয়ে বেরিযে আসবে। এইভাবে সমাজের এক বিপুলতম অংশ পেতে পারবে দক্ষ শ্রমশীল কাজেব ক্ষমতা ও যোগ্যতা। গ্রামীণ কৃষি ও আনুষঙ্গিক নানা ক্ষুদ্র কাজের জন্য তৈরি হবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আধা ও মধ্যম শ্রেণীব কর্মীবাহিনী। পেশাদারী ও উচ্চতব যোগ্যতার কাজে নিযুক্ত হতে পারবে একদল বিশেষজ্ঞ। শিল্প ও কৃষিব ক্ষেত্রে প্রয়োজনভিত্তিক জনশক্তিকে কাজে লাগাবাব জন্য স্থানীয় অবস্থার দিকে তাকিয়ে এমন সুসম্বন্ধ পবিকল্পনা নিতে হবে যাতে জনশক্তিব কোনো অংশই যেন না অবহেলিত ও উপেক্ষিত হয়। শিক্ষার ধারাকে এইভাবে মজবুত ও বাস্তবধর্মী কর্মকেন্দ্রিক করে তুলতে হবে।

বৃত্তিগত ঝোঁক সৃষ্টি, বৃত্তিগত শিক্ষণের প্রাথমিক প্রস্তুতি প্রভৃতির মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য প্রযোজন শিক্ষাগত পথনিদেশ ও বৃত্তিগত পথনির্দেশেব কাযকরী ব্যবস্থা।

বৃত্তিগত পথনির্দেশেব জন্যই চাই সুসংগঠিত শিক্ষাগত পথনির্দেশ। শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকেই দরকাব শিক্ষাগত পথনির্দেশের। তা না হলে শিক্ষার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হযে যাবে। গণতান্ত্রিক সমাজে শিক্ষার পথনির্দেশ ও বৃত্তিগত পথনির্দেশ পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবেই যুক্ত। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গেই পথনির্দেশ ব্যাপারটি জড়িত। শিক্ষাব কাঠামোর মধ্যে কি ধরনেব যুগান্তকাবী পরিবর্তন আসছে, জীবন ও জীবিকাব বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশেব পরিবর্তিত সামাজিক-অর্থনৈতিক পটভূমিকায় কি ধবনেব পথ খোলা আছে বা খোলা হবে, এ সম্বন্ধে একটি পরিচ্ছন্ন পথনির্দেশের ব্যবস্থাপনা খুবই জরুরি।

নতুন সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে সমাজের নতুন নতুন আশা আকাঙ্খার আলোকে জীবন ও জীবিকার বিভিন্ন দিগন্তের সন্ধান দেবে এই পথনির্দেশ-সংস্থা। এঁর কর্মকর্তারা হবেন আধুনিক মনস্তত্ত্ব, শিক্ষাদর্শন প্রভৃতির ক্ষেত্রে সুশিক্ষিত একদল বিশেষজ্ঞ।

১৯০৮ সালে আমেরিকার বোষ্টন শহরে ফ্রাঙ্ক পার্সনস্ পেশাগত তথ্য পরিবেশনের জন্য এই ধরনের সংস্থা গঠনের প্রথম যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। আমাদের দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তনের যে নতুন ধারা আসছে, সে সম্পর্কে খুঁটিনাটি তথ্যমূলক উপদেশ ও নির্দেশদানের জন্য প্রত্যেক বিদ্যালয়ে চাই পথ নির্দেশের ব্যবস্থাপনা—শিক্ষাগত ও পেশাগত পথ-নির্দেশের উপযুক্ত কেন্দ্র। এই কেন্দ্রের সঙ্গে জাতীয় পরিকল্পনার দ্বারা আয়োজিত কর্মসংস্থানকেন্দ্র ও পেশাদারী প্রশিক্ষণকেন্দ্রগুলির নিবিড় যোগসূত্র থাকা দরকার।

মনে রাখা দরকার, শিক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীকে শুধু ভালোভাবে বাঁচবার শিক্ষা দেওয়া নয়—তাকে উপযুক্ত ও যোগ্য করে তোলাও অন্যতম উদ্দেশ্য। ব্যক্তিজীবনে একজন শিক্ষার্থী তার শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিগত, নৈতিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও সৌন্দর্যগত নানা গুণপনার বৈশিষ্ট্য নিয়ে ভালোভাবে বেঁচেবর্তে থাকার জন্য তৈরি হতে পারে। সামাজিক দিক থেকে তাকে গড়ে উঠতে হয় যোগ্য নাগরিক হিসেবে এবং সুদক্ষ কর্মী হিসেবে, কেননা জীবনের অনিবার্য প্রয়োজন ও আকর্ষণের ভেতর দিয়ে বাঁচতে গেলে মানুষের ব্যবহারিক ও বাস্তব জনোচিত অনেক গুণপনার প্রয়োজন। এইজন্য শিক্ষার্থীকে একদিকে যেমন তৈরি হতে হয় সমাজের উৎপাদনক্ষম একজন যোগ্য অংশীদার হিসেবে তেমনি তাকে রপ্ত করতে হয় গণতান্ত্রিক সমাজ-জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের অভিব্যক্তিকে। প্রকৃত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় ব্যক্তি জীবনের আদর্শের সঙ্গে সমাজ জীবনের আদর্শের ফারাক নেই। বরং একে অন্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। পথ নির্দেশ ব্যবস্থা এইদিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে সমাজ জীবনের প্রকৃত মানবিক শক্তিকে চিহ্নিত করা যায়। তার প্রকৃত বিকাশ সাধনে সাহায্য করা যায়। ফলে, শিক্ষার ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধার প্রকৃত পথটি ধরিয়ে দেবার জন্য জাতির মানবিক শক্তি, দক্ষতা ও ক্ষমতার প্রকৃত স্ফুরণের ক্ষেত্রে কোনো অপচয় হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। কর্মসংস্থানের ব্যাপারে যে সব ফাঁক-ফোকর আছে অথবা যে যে ক্ষেত্রে প্রকৃত যোগ্যতাসম্পন্ন ও দক্ষ লোকের অভাব, সেগুলি জানার সুবিধে হয় বলে দেশের সর্বাঙ্গীণ পুনর্গঠনের পক্ষে খুবই সহায়ক হয়। অপচয় নিরোধ করে, শ্রমশক্তির প্রকৃত ব্যবহারের দিগদিগন্ত খুলে দিয়ে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা আসে, তার ফলে অর্থনীতি শক্তিশালী হয়। মানুষের আয় বাড়ে। ব্যয় সংকোচ হয়।

জীবনের বিভিন্ন দিক ফুলে-ফলে-পল্লবে প্রস্ফুটিত হতে পারে। এইভাবে জাতির জীবনীশক্তিতে আসে এক নতুন প্রাণের আমেজ।

পথনির্দেশের ব্যাপারটি আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের জটিলতার যুগে এক অপূর্ব অবদান বলতে হবে। কেবলমাত্র শিক্ষাদানের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর প্রবণতা, দক্ষতা, যোগ্যতা, অনুরাগ প্রভৃতি গুণাবলীর প্রকৃত পরিচয় মেলে না। কিন্তু পথনির্দেশ ব্যাপারটি এক বিজ্ঞানসম্মত ব্যাপার। এর সাহায্যে শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন কাজকর্ম ও তার ব্যক্তিত্বের নানা দিক মূল্যায়ন করে এমন কতকগুলি পথের সন্ধান দেওয়া যায়, যার সাহায্যে শিক্ষার্থী নিজেকে যোগ্য মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার প্রেরণা পায়। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শিক্ষায়তনে পথ-নির্দেশের সংস্থা গঠনের তাগিদ এসেছে। এই ব্যাপারটি নিশ্চিত একটা পেশাদারী প্রচেষ্টার মতো এবং এর কাজকর্মের সঙ্গে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, পাঠ্যসূচী, পাঠ্যদান, শিক্ষার পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ, পরিকল্পনা, জাতীয় যোগসূত্র, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার প্রভৃতি ব্যাপারগুলি নিবিড়ভাবে জড়িত।

কারিগরি খুঁটিনাটির দিক দিয়ে কেউ কেউ এই পথনির্দেশ ব্যাপারটিকে সঙ্কীর্ণ পরিসরের মাধ্যমে বিচার করে বলতে চান, এর দ্বারা শিক্ষার্থীর কিছু মুখ্য সমস্যা ও নির্বাচনী প্রক্রিয়ার নির্ধারণ করা যেতে পারে। কেননা, এর কাজ এক ধরনের বিশেষজ্ঞ দ্বারা প্রদত্ত বিশেষ ধরনের নির্দেশ। শিক্ষার্থীরা কি কি বিষয় নিয়ে পাঠ নেবে এর জন্য দিতে হয় শিক্ষাগত নির্দেশ। কি ধরনের জীবিকার পথে এগোবে সেজন্যে দিতে হয় বৃত্তিগত নির্দেশ। এ ছাড়াও, শিক্ষার্থীর নিজের কিছু ব্যক্তিগত সমস্যা থাকে সে বিষয়েও নির্দেশ দিতে হয়।

বিজ্ঞানসম্মতভাবে এইসব কাজ সম্পাদনের জন্য বিদ্যালয়ে দরকার হয় উপদেষ্টার। এইজন্য গড়ে তুলতে হয় উপদেষ্টা সংস্থা। ব্যবহার করতে হয় নানারকমের মনস্তাত্ত্বিক পরিমাপের ব্যবহার্য উপাদান, যা দিয়ে শক্তিমত্তা, দক্ষতা, অনুরাগ, বুদ্ধি, স্মৃতিশক্তি, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি পরিমাপ করা যায়।

স্বভাবতই এই বিশেষ ধরনের মনস্তাত্ত্বিক ও পরীক্ষামূলক কাজে অনেক তথ্য সংগ্রহ করতে হয়, সেগুলির ব্যাখ্যা করতে হয় এবং সিদ্ধান্তে আসতে হয়। কিন্তু এই বিশেষ ধরনের পদ্ধতি ব্যবহারের মধ্যে এতো দুর্বলতা আছে এবং আমাদের দেশের কর্মসংস্থানের সুযোগ ও উপাদানের এতোই অভাব, যে এই ধরনের

মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষামূলক পদ্ধতিতে তথ্য আহরণ করে শিক্ষাগত ও বৃত্তিগত পথনির্দেশ দেওয়া অনেকটা বিলাসবহুল ব্যাপারের মতো। আবার অনেকটা তা নিছক পশ্চিমী রীতি অনুসরণের অন্ধ প্রবণতার মতো।

তাই, শিক্ষাবিদেরা এই ধরনের ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে **ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি** নিয়ে পথ নির্দেশ দানের বিশেষ পক্ষপাতী।

আমাদের দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক পটভূমিকায় এবং নতুন শিক্ষার কাঠামো প্রবর্তনের পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পথনির্দেশকে বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গিতে শিক্ষাপদ্ধতির অঙ্গ হিসেবেই দেখা সমীচীন।

শিক্ষার্থীর সর্বোচ্চ বিকাশসাধনের জন্য, তার শিক্ষাগত, বৃত্তিগত, শারীরিক-মানসিক, ব্যক্তিগত, সামাজিক ইত্যাকার সর্বতোমুখী বিকাশসাধনের জন্য যেকোনোপ্রকার সাহায্যকেই মেনে নেওয়া দরকার। এইজন্য পথনির্দেশ প্রকৃতপক্ষে হবে শিক্ষাকাজের এক দৈনন্দিন সমীক্ষার সার্বিক ফলাফল। এই কাজে যিনিই সহযোগিতা করুন, তিনি শিক্ষক হোন, অভিভাবক হোন, উপদেষ্টা হোন, কর্মসংস্থান কেন্দ্রের নিয়ামক হোন, তাঁরা সকলেই এক অর্থে উপদেষ্টা বাহিনীরই একজন অংশীদার। শিক্ষার্থীর গৃহগত কাজকর্ম, বিদ্যালয়ে, খেলার মাঠে, নানারকম কর্মানুষ্ঠানে, সামাজিক ব্যবহারে, দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটিতে, শিক্ষাগত উৎকর্ষ অর্জনে, মূল্যবোধ অর্জনে ও প্রকাশে যে অভিব্যক্তি পাওয়া যায়, তার সার্বিক মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর পক্ষে সবচেয়ে ফলপ্রদ হবে। এই ধরনের পথনির্দেশদান অনেকখানি বিকাশধর্মী, সংশোধনধর্মী নয়। এ জিনিস একটা শিক্ষাপদ্ধতিরই ব্যাপার, এর ধারা অব্যাহত, ছেদ নেই এর মূল্যায়নের।

পথনির্দেশ শুরু করতে হয় **প্রাথমিক শিক্ষার** স্তর থেকেই। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে ঘর থেকে বিদ্যালয়ে টেনে আনা যায়, অপচয় ও শিক্ষা সঙ্কোচনকে দূর করা যায়, কাজকর্মের দিকে শিক্ষার্থীর মনকে গড়ে তোলা যায়। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে এই পথনির্দেশ কোনো সংগঠিত উপায়ে আমাদের দেশে হয়নি। শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকরা এ বিষয়ে নিজস্ব বিচার বিবেচনা মতো কাজ করে থাকেন।

কিন্তু **মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে** পথনির্দেশের আবশ্যকতা নীতি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং ইতিপূর্বে 'কেরিয়ার মাস্টারস্' তৈরি করার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু পরিবর্তিত নতুন শিক্ষা কাঠামো প্রবর্তনের ক্ষেত্রে পথনির্দেশের খুবই জরুরী প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। দশম শ্রেণীর পাঠ সমাপ্ত করে অনেক

শিক্ষার্থী যাবে প্রাথমিক বৃত্তি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অথবা বিভিন্ন রকমের বৃত্তিগত পাঠ্যসূচীর দিকে। আবার +২ স্তরের জন্য এই স্তরে প্রবেশের মুখে এবং এই স্তর পার হওয়ার মুখে উপযুক্ত পথনির্দেশের প্রয়োজনীয়তা খুবই জরুরি। সুতরাং এই পর্যায়গুলিতে শিক্ষার্থীর অনুরাগ, দক্ষতা, মেজাজ, প্রবণতা প্রভৃতি চিহ্নিত করে দিয়ে তাদের পরবর্তী জীবনের বিকাশ সাধনে সার্থকভাবে সাহায্য করার জন্য চাই উপযুক্ত পথনির্দেশ। এর সাহায্যে শিক্ষার্থীরা জানতে পারবে তাদের নিজেদের ওজন, ক্ষমতা ও দক্ষতার পরিমাপ, ভবিষ্যতের চাহিদা মেটানোর উপযুক্ত পথের সন্ধান। শিক্ষকরাও এই পথনির্দেশের ফলাফল দেখে তাঁদের শিক্ষাদানের ব্যাপারে আরো বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করে ভবিষ্যতের কর্মসূচী নির্বাচন করতে উৎসাহ পাবেন।

শিক্ষা, পাঠ্যসূচী ও পথনির্দেশ এই তিনটি ব্যাপার আলাদা আলাদা হলেও এরা সকলেই একই লক্ষ্যের অভিসারী। শিক্ষার কাজ যেহেতু শিক্ষার্থীকে গণতান্ত্রিক সমাজের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা, সেজন্যে তার সামাজিক, অর্থনৈতিক, বৃত্তিগত, ভাবগত, নৈতিক ইত্যাদি সমস্ত দিকেই বিকাশ সাধন করা হবে শিক্ষা, পাঠ্যসূচী ও পথ নির্দেশের উদ্দেশ্য। আধুনিক শিক্ষার পাঠ্যসূচীতে পাঠ্যবস্তু এখন শুধু নির্বাচিত কিছু পুস্তক নয়, নানান ধরনের কর্মবৃত্তিই এখন পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষা, পাঠ্যসূচী ও তৎসংক্রান্ত যাবতীয় কর্মধারা এবং পথনির্দেশ পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবেই জড়িত, বিচ্ছিন্ন নয়। পথনির্দেশ ও পাঠ্যসূচী ও কর্মবৃত্তির ব্যাপারে যাঁরা যুক্ত, তাঁরা একে অন্যের সহায়ক। উভয়েরই কাজ শিক্ষার্থীর সঙ্গে, অভিভাবকের সঙ্গে, শিক্ষকের সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলা। উভয়েরই কাজ শিক্ষার্থীর চাহিদা ও আশা-আকাঙ্খার মূল বিন্দুগুলি আবিষ্কার করে তার বিকাশ সাধনে সাহায্য করা। উপদেষ্টা ও শিক্ষক উভয়েই মিলিতভাবে পথনির্দেশ ও শিক্ষা-দানের ব্যাপারে এমন পদক্ষেপ নেবেন যার ফলে শিক্ষার্থী তার শক্তিসামর্থ্য ও প্রবণতা নিয়ে যোগ্যতা অর্জনের দিকে এগোতে পারে সার্থকভাবে।

পথ নির্দেশ পরিকল্পনাকে বাস্তবসম্মতভাবে সংগঠিত করার জন্য কোঠারি কমিশনের সুপারিশ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই কমিশনের মতে, সমস্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়েই পথনির্দেশ দেবার জন্য দশটি ইস্কুল পিছু একজন উপদেষ্টা নিয়োগ করা যেতে পারে। কিছু সুনির্বাচিত বিদ্যালয়ে সুসংগঠিতভাবে

পথনির্দেশ সংস্থা গড়ে তোলা দরকার। রাজ্য পর্যায়ের পথনির্দেশ গবেষণা সংস্থার অধীনে কিছু ভ্রাম্যমান পথনির্দেশক থাকা দরকার যাঁরা বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পথনির্দেশ পরিকল্পনা রূপায়ণে সাহায্য করবেন। শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক—সকলেই পথনির্দেশক সংস্থার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন।

এই জিনিসটি একটি বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত কাজ হিসেবে মনে না করে সুসংগঠিত-ভাবে ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে গ্রহণ করার জন্য প্রবণতা দেখা দিয়েছে। পরিবর্তিত শিক্ষার কাঠামোয় পথনির্দেশক সংস্থার ভূমিকা আরো অনেক ব্যাপক হবে এবং আশা করা যায়, একই সংগঠিত প্রক্রিয়ারের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক মূল্যায়ন ও ভবিষ্যৎ কর্মবৃত্তি নিরূপণ ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন হবে। সেজন্য প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পক্ষে প্রয়োজনীয় **'কিউমুলেটিভ রেকর্ড কার্ড'** থাকবে, বিদ্যালয় শিক্ষা সমাপ্তি ও কার্যকারিতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হবে এই জাতীয় মূল্যায়ন পদ্ধতি।

---

# একাদশ পরিচ্ছেদ

# ব্যবহারিক শিক্ষা-পঞ্জী ও অনুলেখ

[ *দর্শন ভাবনার প্রয়োগ ও প্রযুক্তি* ]

# ব্যবহারিক শিক্ষা-তথ্যপঞ্জী ও অনুলেখ

সামাজিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজ জীবনে আসে নতুন নতুন সমস্যা। পুরাতন সমাজের ভিত ধ্বসে পড়ে, নতুন নতুন সামাজিক সমস্যা আসে, দেশের অনগ্রসর ও প্রগতিশীল অংশের মধ্যে নানারকমের লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন দেখা দেয়।

এই অবস্থায় সমাজ শিক্ষার কাজের জন্য প্রয়োজন হয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নানারকম তথ্য সংগ্রহের। সেই তথ্যগুলিকে আবার সংগ্রহ করে তার বিচার-বিশ্লেষণ করতে হয় বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে। ফলাফলের ভিত্তিতে একটি যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্তেও আসতে হয়। এই ধরনের ক্ষেত্র থেকে তথ্য আহরণ, সমবায়, বিশ্লেষণ, তুলনা, বিচার ও সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে এগোতে পারলে পরিকল্পনার ত্রুটিবিচ্যুতি বা ফাঁক সম্বন্ধে পরিচয় পাওয়া যায়। অগ্রগতির নমুনা পেলে কাজে উৎসাহিত হয়ে আরো নতুন নতুন পথের সন্ধানে অগ্রসর হওয়া যায়। তাই, শিক্ষা—তথ্য সগ্রহ ও সেগুলির অর্থপূর্ণ ব্যাখ্যা, অনুলেখের মাধ্যমে সকলের সামনে জীবন্ত করে তুলে ধরার একটি বিশেষ শিক্ষাগত তাৎপর্য আছে। যুক্তিধর্মী সিদ্ধান্ত নেবার দৃষ্টিভঙ্গি এক ধরনের দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি।

উদাহরণের সাহায্যে বলা যেতে পারে। যেমন, একটি অনগ্রসর এলাকায় শিক্ষার প্রকৃত চিত্র কি তা জানার জন্য একটি তথ্যমূলক সার্ভে করা দরকার। এইক্ষেত্রে একটি অঞ্চল বা ব্লক এলাকা নির্বাচিত করে নিয়ে সেখানকার কিছু সাধারণ তথ্য সর্বাগ্রে সংগ্রহ করা যায়—যেমন, এলাকার লোকসংখ্যা, নারী ও পুরুষ, বয়স অনুযায়ী তাদের সংখ্যা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা, বয়স অনুসারে ছাত্র ও ছাত্রীর বিদ্যালয়ের তালিকাভুক্তির বিবরণ, ঐ একই বয়সের কত ছাত্র ও ছাত্রী বিদ্যালয়ে একেবারে যোগ দেয়নি, যারা যোগ দেয়নি তাদের কর্ম-পরিচয়ের বিবরণ, গত পাঁচ বছরে বিদ্যালয় কত ছিল, কত শিক্ষার্থী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যোগদান করেছিল, কতজন শিক্ষা সমাপ্ত করেছে, কতজন শিক্ষা সমাপন না করে পড়াশোনা ছেড়েছে, কতজন মাধ্যমিক শিক্ষায় গেছে, এলাকায় মাধ্যমিক বিদ্যালয় কত, তাদের দূরত্ব ও এলাকার জনসংখ্যার হিসেব অনুপাতে অবস্থিতি, এলাকার সমস্ত শিক্ষার্থীর সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কত বিদ্যালয় চাই, কতজন শিক্ষক দরকার ইত্যাদি। এইভাবে তথ্যগুলি সংগ্রহ করে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখলে একটি এলাকার শিক্ষাগত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের স্পষ্ট সামগ্রিক চিত্র চোখের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। সেগুলি শিক্ষক, শিক্ষার্থী, জনসাধারণ, অভিভাবক শিক্ষাবিভাগ ও অন্যান্য সম্প্রসারণশীল বিভাগের কর্মকর্তা

প্রভৃতির পক্ষে এক পলকে একটি সার্বিক ধারণা সংগ্রহ করার সুবিধে হয়। অনুলেখের সাহায্যে এইসব তথ্যের পরিচয় পোষ্টার, মডেল, প্রদর্শনী, ডিস্প্লে, ফিল্মচিত্র প্রভৃতি আকারে জনসাধারণের সম্মুখে তুলে ধরা যেতে পারে এবং খুব আকর্ষণীয়ভাবে সেগুলি প্রচারের হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগানো যেতে পারে। অগ্রসর, উন্নয়নশীল ও অনগ্রসর—যে কোনো দেশের পক্ষেই এই প্রচার খুবই শিক্ষাপ্রদ, আকর্ষণীয় হতে পারে।

একটি এলাকার শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক-সামাজিক চাহিদা জানার জন্য তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে নিম্নলিখিতভাবে :

(১) এলাকার ভৌগোলিক বিবরণ—খাল, নদ-নদী, নালা, রাস্তাঘাট, স্কুল-কলেজ, প্রাকৃতিক সম্পদ ইত্যাদি। সেগুলি নানা রকমের রং বুলিয়ে মানচিত্র বা স্কেচ বা ডায়াগ্রাম বা মডেল আকারে তৈরি করা যেতে পারে। এর দ্বারা স্থানীয় বৈশিষ্ট্য, সুবিধা-অসুবিধা ইত্যাদি সম্পর্কে একটি মনে ধরার মতো চিত্র উপস্থিত হতে পারে এবং তার আবেদন খুবই সংবেদনশীল হতে পারে।

(২) একটি এলাকায় একটি বিদ্যালয় ( প্রাথমিক বা মাধ্যমিক ) প্রতিষ্ঠিত হলে কোন্ কোন্ এলাকা থেকে কি ধরনের অর্থনৈতিক গোষ্ঠী থেকে ছাত্র-ছাত্রী আসতে পারে তার একটি তথ্যমূলক বিবরণ সংগ্রহ করে অনুলেখের সাহায্যে তার চিত্ররূপ তুলে ধরা যেতে পারে। যেমন,

| এলাকার লোকসংখ্যা | | শিক্ষিতের হার | বিদ্যালয়গামী ছাত্র-ছাত্রীর সম্ভাব্য সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| হিন্দু | স্ত্রী/পুরুষ | স্ত্রী/পুরুষ | স্ত্রী/পুরুষ |
| মুসলমান | ঐ | ঐ | ঐ |
| তপশীল | ঐ | ঐ | ঐ |
| উপজাতি | ঐ | ঐ | ঐ |

| অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর বিবরণ | | আয়ের বার্ষিক অনুপাত ও শতকরা হিসাব |
|---|---|---|
| উচ্চমধ্যবিত্ত | চাকুরীজীবী | ঐ |
| | ব্যবসাদার | ঐ |
| | জমির মালিক | ঐ |
| | অন্যান্য পেশা | ঐ |
| নিম্নমধ্যবিত্ত | ঐ | ঐ |
| সাধারণ দরিদ্র | ঐ | ঐ |

(৩) একটি এলাকার ( যেমন ব্লক পর্যায়ে ) কোথায় কোথায় বিদ্যালয় আছে, প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের স্থান বা ভৌগোলিক সম্ভাব্যতা ইত্যাদি সম্পর্কে মানচিত্র তৈরি করা যেতে পারে।

(৪) এইভাবে এলাকার লোকসংখ্যা, নারী ও পুরুষ, শিক্ষিত অশিক্ষিতের সংখ্যা, নারী ও পুরুষ, বিভিন্ন বয়সের শিক্ষার্থীর সংখ্যা, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার সম্ভাব্যতা, বিদ্যালয় গৃহ বা জমি সংগ্রহে স্থানীয় জনগণের নিকট সম্ভাব্য সাহায্যের পরিমাণ, সরকারী অনুদান, অন্যান্য দানের বিবরণ, আগামী তিন বছরের একটি প্রস্তাবিত বাজেট, শিক্ষক সংগ্রহের সুবিধা, অসুবিধা, খেলার মাঠ, ছাত্র-ছাত্রীদের থাকার ব্যবস্থা, প্রতিবেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দূরত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহ করে তার মূল্যায়ন করে সুন্দরভাবে সেগুলি অনুলেখের মাধ্যমে প্রকাশ করা যেতে পারে। এইসব তথ্য অনুলেখের সাহায্যে তুলে ধরলে জনগণের কাছে খুবই বোধগম্য হয় এবং এর ফলে জনগণের চেতনা সম্প্রসারিত হয়। গণতান্ত্রিক সমাজের সমাজ পুনর্গঠনের কাজে এই জাতীয় শিক্ষা-তথ্য সংগ্রহ করা ও তার ব্যাখ্যা দেওয়া খুবই কাজের কাজ হয়।

**শিক্ষা সংক্রান্ত সার্ভে** করার জন্য কতকগুলি আবশ্যকীয় শর্ত পালন করা দরকার আছে। যেমন—

(১) ব্যাপ্তি—সার্ভে কতখানি এলাকা বা কি ধরনের এলাকা বা ক্ষেত্র নিয়ে করা হবে।

(২) ঘনত্ব—সার্ভে ঠিক কি কি ধরনের বিশেষ সমস্যা চিহ্নিত করে তথ্য সংগ্রহ করবে।

(৩) গভীরতা—তথ্যপঞ্জীর ভিতর দিয়ে ঠিক কি কি বিষয়ের গভীর রহস্য উন্মোচিত হওয়া দরকার তার এলাকা চিহ্নিতকরণ ও সেই অনুসারে তথ্য সংগ্রহ করা।

(৪) প্রশ্নাবলীর নিখুঁত বিন্যাস—যে সব প্রশ্ন তৈরি করা হবে এবং যে সব প্রশ্ন উত্তর সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন জায়গায় জনগন বা বিশেষ কোনো চিহ্নিত ব্যক্তিদের কাছে পাঠানো হবে সেগুলি যেন পর্যায়ক্রমে সুবিন্যস্তভাবে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং সেগুলির উত্তর যা পাওয়া যাবে তা যেন সমস্যাধর্মী হয়—কেননা, অনেক সময় শুধু মাত্র "হাঁ" বা "না" চিহ্নিত উত্তরের দ্বারা কোনো ক্ষেত্রের সুস্পষ্ট পরিচয়

পরিস্ফুট হয় না। তাই, প্রশ্নগুলি যেন বিজ্ঞানসম্মত হয় এবং তার উত্তরও যেন সমস্যাধর্মী হয়। প্রশ্নগুলি তাই সাধ্যমত চিন্তা উদ্দীপক হওয়া চাই।

(৫) সামগ্রিক বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ—সার্ভের দ্বারা যেসব তথ্যাবলী নানা সূত্র থেকে সংগৃহীত হবে এইবার তার বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যার জন্য পরিচ্ছন্নভাবে বিচার বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ করা দরকার এবং তথ্যগুলি থেকে যেসব চিত্র সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে সেগুলিকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা দরকার।

(৬) অপ্রয়োজনীয় তথ্যাবলী তৈরি করা বা তার পুনর্মূল্যায়ন করা, দরকার হলে পুনরায় ক্ষেত্রে গিয়ে তার অনুসন্ধান করা, পুনর্মূল্যায়ন করা, সারসত্তা যাচাই করে দেখা দরকার হয়।

(৭) সংগৃহীত তথ্যের বিজ্ঞানসম্মত, সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত এমন হবে তা যেন শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির উদ্দেশ্য ও কার্যকারিতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়।

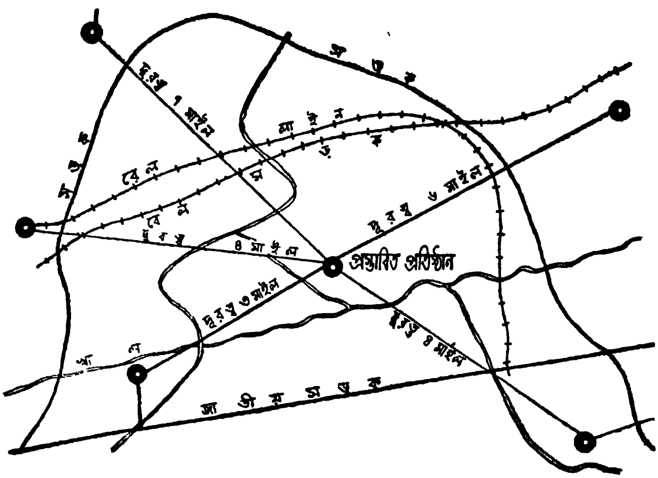
(৮) এইভাবে সংগৃহীত শিক্ষাসংক্রান্ত তথ্যাবলীকে রিপোর্টের আকারে পুস্তিকা মারফৎ বা অন্য কোনো জনসংযোগের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় এবং অনুলেখের সাহায্যে সেগুলি জীবন্ত করে তুলে জনসমক্ষে প্রচার করা যায়। আলোচনার সুবিধার জন্য নিম্নে কয়েকটি অনুলেখের বিবরণ ও চিত্র উপস্থাপন করা গেল :—

## ॥ ১ ॥

একটি এলাকায় কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হবে বা হাসপাতাল বা শিল্পকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হবে। এইজন্য চাই এলাকা ও এলাকাসংলগ্ন বা বহির্ভূত এলাকার একটি ঘনীভূত সুস্পষ্ট চিত্র। দেখতে হবে প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠান থেকে বর্তমানে প্রচলিত প্রতিষ্ঠানের দূরত্ব কতদূর, যানবাহন ও অন্যান্য যোগাযোগের ব্যবস্থা কি রকম আছে (কাঁচা রাস্তা, পাকা রাস্তা, রেল লাইন, মেঠো রাস্তা, জলপথ ইত্যাদি)। কোন্ কোন্ জায়গায় কি ধরনের প্রতিষ্ঠান আছে, সেখানে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী কত জন, কত জন সুযোগ পায়, কেন পায় বা পায় না, পাশাপাশি এলাকার শিক্ষার্থীদের সম্ভাব্য সংখ্যা কত, নতুন একটি প্রতিষ্ঠান হলে তার শিক্ষার্থী কত হতে পারে, পাঁচ বছরে কি রকম অগ্রগতি হতে পারে, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত কতজনের রুজি রোজগারের ব্যবস্থা হতে পারে, স্থানীয়

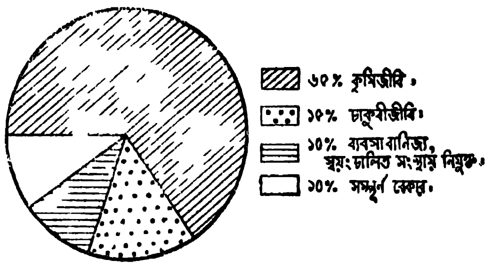
অর্থনীতিতে এই নতুন প্রতিষ্ঠান সংযোজনের সম্ভাব্য ফলাফল কি ইত্যাদি নানারকমের তথ্য কেন্দ্র করে একটি পূর্ণাঙ্গ সার্ভের দ্বারা সমস্যাটিকে ভালোভাবে অনুধাবন করা যায়।

একটি মানচিত্র তৈরি করে দেখানো যেতে পারে নতুন সম্ভাব্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের দূরত্ব ও যোগাযোগের সমস্যা :

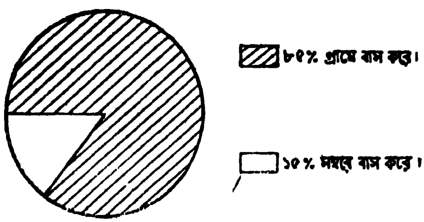



এই মানচিত্রের সাহায্যে প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের দূরত্ব এবং যোগাযোগ সমস্যা এবং সম্ভাব্য যোগাযোগের ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি নিখুঁত চিত্র পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। নতুন সম্ভাব্য যোগাযোগ ব্যবস্থা হলে দূরবর্তী তিনটি প্রতিষ্ঠিত শিক্ষায়তনের যোগাযোগ ব্যবস্থা কিরূপ উন্নত হতে পারে, তা এই চিত্রে দেখানো হয়েছে। এই যোগাযোগ ব্যবস্থা হলে এলাকার একটি সামগ্রিক উন্নয়নের খুবই সুবিধে হবে এবং ধীরে ধীরে সমগ্র এলাকাটিকেই একটি উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার আওতায় এনে এলাকাটিকে আদর্শ গ্রাম-শহর হিসেবে গড়ে তোলা যেতে পারে। এইভাবে আরো একটি নক্সা এই সঙ্গে যুক্ত করা হোলো।

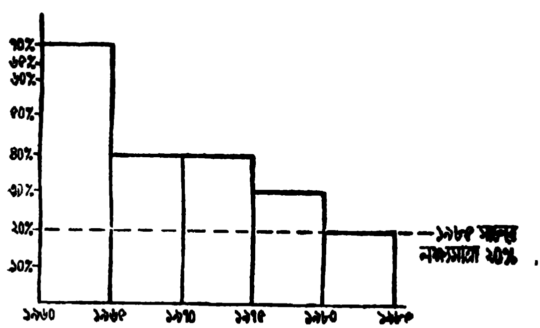
সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বা গ্রামীণ পুনর্গঠনের জন্য একটি এলাকার অর্থনৈতিক-সামাজিক-শিক্ষাগত নানা সমস্যাকে তুলে ধরা যায় অনুলেখ চিত্রের সাহায্যে। যেমন, একটি গ্রামের অর্থনৈতিক চিত্র জ্যামিতিক পাই-গ্রাফে তুলে ধরা যায়ঃ




একটি বৃহত্তর এলাকার কত অংশ গ্রামে বাস করে, কত অংশ শহরে বাস করে তা তুলে ধরা যেতে পারে লোকশিক্ষা প্রচারের জন্য ঃ

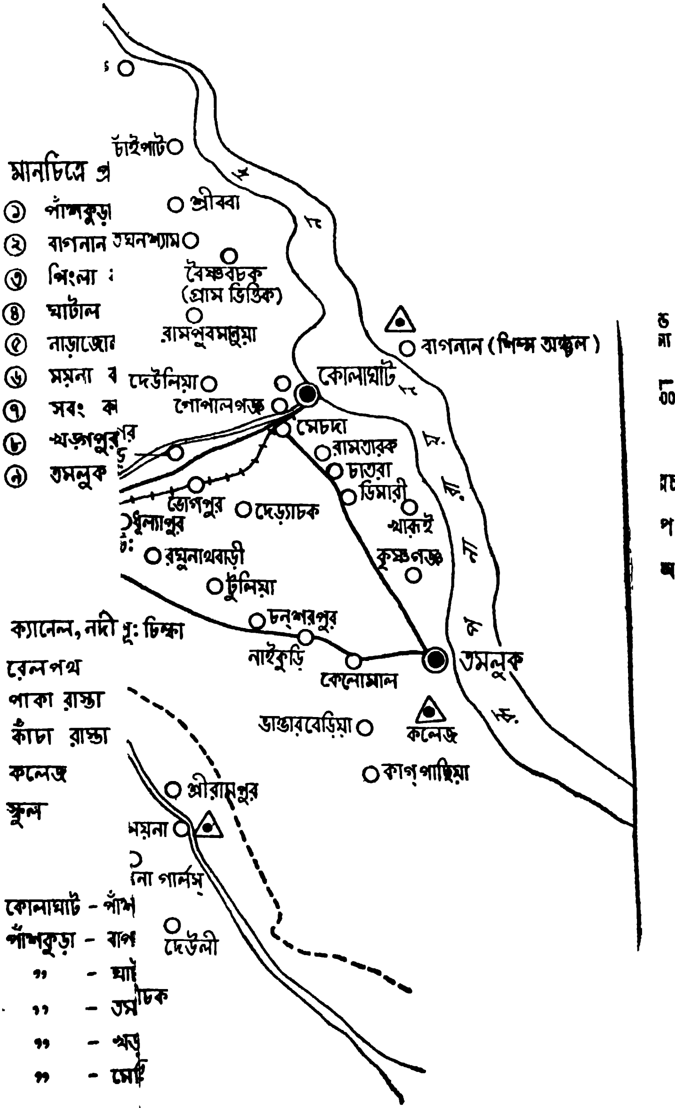



নিরক্ষরতা দূরীকরণের ব্যাপারে একটি এলাকার সাফল্যকে তুলে ধরা যেতে পারে [ হিস্টোগ্রাম পলিগণ জাতীয় অনুলেখের সাহায্যে ]ঃ




হিস্টোগ্রাম

মগ্রণে নতুন




রিচয় সহজ-

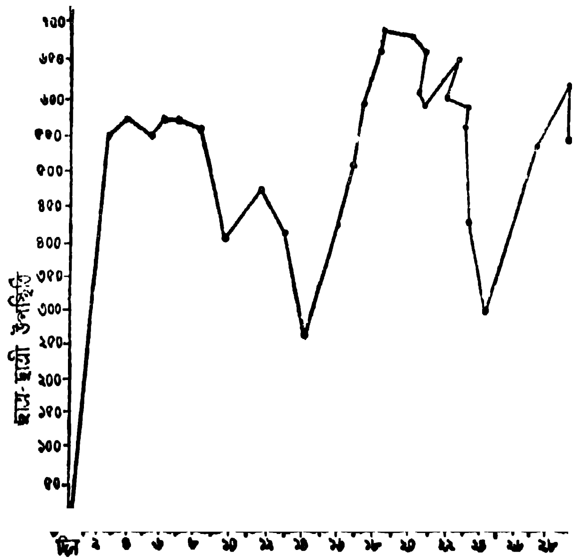
পলিগণ—

অনা গ্রহের

াংবাদিক

় বিন্যাস

একটি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ৭০০। মাসিক উপস্থিতির পরিচয় সহজবোধ্য হিসেবে পাওয়ার জন্য দৈনন্দিন উপস্থিতির অঙ্ক অনুযায়ী একটি পলিগণ—পদ্ধতিতে অনুলেখ তৈরি করা যেতে পারে। শিক্ষার প্রতি আগ্রহ অনাগ্রহের একটি সামাজিক পরিচয় এর দ্বারা ফুটে উঠেছে।



গ্রাম, গ্রাম-শহর, শহর, শিল্পাঞ্চল বিস্তৃতভাবে পরিক্রমা করে তরুণ সাংবাদিক বৃন্দশংকর গোস্বামী যে সব তথ্যপঞ্জী সংগ্রহ করে তার বিশ্লেষণমূলক বিন্যাস

করেছেন, এই অংশে সেইরকম অনেকগুলি তথ্যপঞ্জীর সমাবেশ করা গেল, যার বাস্তবসম্মত ও বিজ্ঞানসম্মত দিকটি লক্ষণীয় :—

**ক. অনগ্রসর গ্রাম এলাকা :** ( শুশুনিয়া, বাঁকুড়া )

বাঁকুড়া পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত একটি অনগ্রসর জেলা। অর্থনৈতিক দিক থেকে পশ্চাৎপদ্ এই এলাকার অধিবাসীদের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় সংগ্রহ করার কাজে উক্ত সমীক্ষক শুশুনিয়া অঞ্চলের পাহাড়ী এলাকার দূরতম পল্লীতে একটি নমুনা সমীক্ষা চালিয়ে যে তথ্যপঞ্জী সংগ্রহ করে আনেন তারই কিছু চুম্বক এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

এই তথ্যাবলীকে পরিসংখ্যান রীতিতে ব্যাখ্যা করে দেখানো হয়েছে তালিকা তৈরি করে পৌনঃপুন্য বিস্তার দেখিয়ে। হিস্টোগ্রাম ও পলিগনের সাহায্যে এই তথ্যাবলী অনুলেখের মাধ্যমে তৈরি করে প্রচার পুস্তিকার মাধ্যমে তুলে ধরা যায়। হিস্টোগ্রাম ও পলিগণ অনুলেখের নমুনা-পদ্ধতি পূর্বেই দেখানো হয়েছে বলে এখানে তার উল্লেখ প্রয়োজন হয়নি।

লোকসংখ্যার বিস্তৃতি ( বয়স ও লিঙ্গ অনুযায়ী )—শুশুনিয়া, বাঁকুড়া।

তালিকা নং ১

| বয়স-গোষ্ঠী | পুরুষ | মহিলা | মোট | শতকরা (%) |
|---|---|---|---|---|
| ০—৯ | ৪৭ | ৬৩ | ১১০ | ২০·৪ |
| ১০—১৯ | ৯১ | ৬৪ | ১৫৫ | ২৮·৭ |
| ২০—২৯ | ৪৫ | ৪০ | ৮৫ | ১৫·৭ |
| ৩০—৩৯ | ৩২ | ৩০ | ৬২ | ১ ·৫ |
| ৪০—৪৯ | ২৬ | ২২ | ৪৮ | ৮·৯ |
| ৫০—৫৯ | ২৩ | ২১ | ৪৪ | ৮·২ |
| ৬০—৬৯ | ১৯ | ৭ | ২৬ | ৪·৮ |
| ৭০+ | ৬ | ৪ | ১০ | ১·৮ |
| মোট | ২৮৯ | ২৫১ | ৫৪০ | — |
| শতকরা (%) | ৫৩·৫ | ৪৬·৫ | — | — |

**বিশ্লেষণ :**—প্রাথমিকভাবে লোকগণনার জন্য শুশুনিয়া গ্রামের কয়েকটি

সুনির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়। এইজন্য কাজের সুবিধার দিক বিবেচনা করে "নমুনা" হিসেবে ঐ গ্রামের তিনটি পরিবারকে বেছে নেওয়া হয়। এখানে পরিবার বলতে বুঝিয়েছে যারা একান্নবর্তী সংসারের শরিক। "মুদ্রিত লোক-গণনার ফর্ম" লক্ষ্য রেখে তথ্যগুলি সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়—যেমন, নাম, ধাম, বয়স, লিঙ্গ, বিবাহিত, অবিবাহিত প্রভৃতি পরিচয়, পেশা, শিক্ষাগত পরিচয় ইত্যাদি।

আলোচ্য তালিকায় ( তালিকা ৩ ) "বয়স গোষ্ঠী"কে আটটি "বিস্তারে" ( ডিস্ট্রিবিউনে ) ভাগ করা হয়েছে। পৌনঃপুন্য বিস্তার ধরা হয়েছে ০—৯ একক ধরে। সর্বশেষ একক ধরা হয়েছে ৭০ ও তদূর্ধ। এই গ্রামে ৫৪০ জন ব্যক্তির মধ্যে পুরুষ ২৮৯ এবং নারী ২৫১ জন। ১০ থেকে ১৯ বছর বয়স গোষ্ঠীতে দেখা যাচ্ছে

বিবাহগত পরিচয় অনুযায়ী লোকবিন্যাস—শুশুনিয়া, বাঁকুড়া।

তালিকা নং ৩

| বয়স-বিভাগ | পুরুষ | | | | | মহিলা | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | অবিবাহিত | বিবাহিত | স্ত্রীবিয়োগ | বিবাহ বিচ্ছেদ | মোট | অবিবাহিত | বিবাহিত | বিধবা | বিবাহ বিচ্ছেদ | মোট |
| ০—৯ | ৪৭ | — | — | — | ৪৭ | ৬৩ | — | — | — | ৬৩ |
| ১০—১৯ | ৯১ | — | — | — | ৯১ | ৫৭ | ৭ | — | — | ৬৪ |
| ২০—২৯ | ৩২ | ১৩ | — | — | ৪৫ | ৬ | ৩৩ | ১ | — | ৪০ |
| ৩০—৩৯ | ১ | ৩১ | — | — | ৩২ | — | ২৯ | ১ | — | ৩০ |
| ৪০—৪৯ | ২ | ২৪ | — | — | ২৬ | — | ২০ | ১ | ১ | ২২ |
| ৫০—৫৯ | ২ | ১৯ | ২ | — | ২৩ | — | ১৪ | ৭ | — | ২১ |
| ৬০—৬৯ | — | ১৮ | ১ | — | ১৯ | — | ৩ | ৪ | — | ৭ |
| ৭০+ | — | ৩ | ৩ | — | ৬ | — | — | ৪ | — | ৪ |
| মোট | ১৭৫ | ১০৮ | ৬ | — | ২৮৯ | ১২৬ | ১০৬ | ১৮ | ১ | ২৫১ |
| % | ৬০·৫ | ৩৭·৪ | ২·১ | | | ৫০·৬ | ৪২·০ | ৭·৫ | ·৩ | |

৯১ জন পুরুষ ও ৬৪ জন মহিলা। অর্থাৎ মহিলাদের চেয়ে পুরুষের সংখ্যা বেশি। ৭০ বছরের উর্ধে লোকসংখ্যা মাত্র দশজন। এই তালিকার সাহায্যে পরিষ্কার-ভাবে বোঝা যাচ্ছে যে, এখানকার পরিবারের মধ্যে মহিলার সংখ্যা কম, বৃদ্ধের

সংখ্যাও কম কিন্তু যুবক গোষ্ঠীর মধ্যে মহিলা সংখ্যা কম হওয়ায় নারী পুরুষের সমতার ক্ষেত্রে বৈষম্য দেখা যাচ্ছে।

**বিশ্লেষণ :** আলোচ্য তথ্যপঞ্জীতে বিবাহগত পরিচয়ের বিন্যাস করতে গিয়ে জনসমষ্টিকে সুচিন্তিতভাবে ভাগ করা হয়েছে নিম্নলিখিতভাবে :—

(১) অবিবাহিত

(২) বিবাহিত

(৩) বিধবা

(৪) বিবাহবিচ্ছেদ

এই তালিকায় দেখা যাচ্ছে, পুরুষ অবিবাহিতের সংখ্যা ১৭৫ জন, মহিলা অবিবাহিতের সংখ্যা ১২৬ জন। অবিবাহিত পুরুষের বয়স গোষ্ঠী ১০—১৯ কিন্তু মহিলাদের অবিবাহিত বয়সগোষ্ঠীর কোনো প্রকৃত পরিচয় ০—৯ বয়সগোষ্ঠীর ওপরে নির্ভরযোগ্যভাবে পাওয়া যায়নি। বিবাহবিচ্ছিন্নের কোনো দৃষ্টান্ত পুরুষ বয়সগোষ্ঠীর মধ্যে পাওয়া যায়নি। কিন্তু ৪০—৪৯ বয়সগোষ্ঠীর মধ্যে একজন বিচ্ছেদপ্রবণ মহিলার সন্ধান পাওয়া গেছে। বিধবাদের অস্তিত্ব মহিলাদেব ক্ষেত্রে (১৮) এবং স্ত্রীবিহীন পুরুষের ক্ষেত্রে (৬) জন দেখা গেছে।

পরিবার সংখ্যা অনুসারে "জাতি"গত বিন্যাস—শুশুনিয়া, বাঁকুড়া।

তালিকা নং ২

| ক্রমিক নং | জাতি | পরিবাব-সংখ্যা | শতকরা % |
|---|---|---|---|
| ১ | কর্মকার | ২১ | ২৫·৯ |
| ২ | তন্তুবায় | ১৭ | ২০·৯ |
| ৩ | বৈষ্ণব | ৯ | ১১·১ |
| ৪ | বাউরি | ৯ | ১১·১ |
| ৫ | ব্রাহ্মণ | ৯ | ১১·১ |
| ৬ | শুঁড়ি | ৩ | ৩·৮ |
| ৭ | তাম্বলি | ১২ | ১৪·৮ |
| ৮ | গন্ধবণিক | ১ | ১·৩ |
| মোট | | ৮১ | |

**বিশ্লেষণ :** আলোচ্য তালিকাটি পরিবার সংখ্যা অনুসারে জাতিগত বিন্যাসের একটি তথ্যগত পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে। বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, ৮১টি পরিবারের মধ্যে কর্মকার জাতির লোকসংখ্যা সবচেয়ে বেশি (২১)। এর পরেই তন্তুবায়ের স্থান (১৭)। তাম্বলির সংখ্যা (১২)। স্বভাবতই বোঝা যাচ্ছে, এই নমুনা এলাকায় পরিবারগুলির মধ্যে কর্মকার জাতি জীবিকার ভিত্তিতে বেশি ঘনীভূত। লক্ষণীয়, এখানকার পরিবারগুলি অর্থনৈতিক গোষ্ঠীতে জাতিগত পরিচয়ে বিভক্ত। গন্ধবণিক শ্রেণী এখানে ক্ষয়িষ্ণু, অবলুপ্তির পথে।

পুরুষ জনসমষ্টির ক্ষেত্রে সাক্ষরতার বিস্তার—শুশুনিয়া, বাঁকুড়া।

তালিকা নং ৪

| বয়সগোষ্ঠী | ০—৯ | ১০—১৯ | ২০—২৯ | ৩০—৩৯ | ৪০—৪৯ | ৫০—৫৯ | ৬০—৬৯ | ৭০+ | মোট | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| নিরক্ষর/অশিক্ষিত | ২৭ | ১৪ | ৯ | ৩ | ৭ | ৬ | ৪ | ১ | ৭১ | ২৪·৬ |
| সাক্ষর/শিক্ষিত | | | | | | | | | | |
| বিদ্যালয় অনুত্তীর্ণ | ১ | ১ | ১ | ২ | ২ | ৪ | ১ | — | ১২ | ৪·২ |
| প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯ | ২৬ | ১০ | ৮ | ৩ | ৬ | ১৩ | ১ | ৮৬ | ২৯·৮ |
| জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় | — | ৩১ | ৭ | ৬ | ৬ | ৫ | ১ | ১ | ৫৭ | ১৯·৭ |
| উচ্চ বিদ্যালয় | — | ১৯ | ১৩ | ১১ | ৭ | ২ | — | — | ৫২ | ১৭·৯ |
| মহাবিদ্যালয় | — | — | ৫ | ১ | ১ | — | — | ৩ | ১০ | ৩·৫ |
| বিশ্ববিদ্যালয় | — | — | — | ১ | — | — | — | — | ১ | ·৩ |
| মোট | ৪৭ | ৯১ | ৪৫ | ৩২ | ২৬ | ২৩ | ১৯ | ৬ | ২৮৯ | |

**বিশ্লেষণ :** শুশুনিয়া গ্রামের পুরুষ জনসমষ্টির ২৮৯ জন ব্যক্তির মধ্যে সাক্ষরতার পরিচয় নেওয়ার জন্য এই নমুনা সমীক্ষায় পর্ব ভাগ করা হয়েছে নিম্নলিখিত ভাবে :—

(১) নিরক্ষর/অশিক্ষিত

(২) সাক্ষর/শিক্ষিত

(৩) বিদ্যালয় অনুত্তীর্ণ

(৪) প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার বিভিন্ন স্তর

আলোচ্য তালিকায় (তালিকা ৪) দেখা যাচ্ছে, এই গ্রামেব ২৮৯ জন পুরুষের মধ্যে ৭১ জন নিরক্ষর বা অশিক্ষিত ( কিন্তু এরাও নানাভাবে জাতিগত পেশায় নিযুক্ত )। নামমাত্র সাক্ষবেব কোনো পরিচয় পাওয়া যায়নি। তবে লক্ষণীয়, এই গ্রামে ১০ ১৯ বছর বয়সের ৯১ জন পুরুষ কিছু আলোকপ্রাপ্ত, ২০—২৯ বছর বয়সের ৪৫ জন, ৩০—৩৯ বছবের ৩২ জন, ৪০—৪৯ বছবের ২৬ জন, ৫০—৫৯ বছরের ২৩ জন, ৬০—৬৯ বছরের ১৯ জন শিক্ষাপ্রাপ্ত, এমনকি মহাবিদ্যালয স্তর পর্যন্ত আলোকপ্রাপ্ত পুরুষেব আনুপাতিক হিসাব ৩'৫%, উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণ করেছে ১৭'৯%, প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে ২৯'৮%। বিশ্ববিদ্যালযেব শিক্ষা পেয়েছে মাত্র একজন।

নারী জনসমষ্টিব ক্ষেত্রে সাক্ষরতাব বিস্তার—শুশুনিয়া, বাঁকুড়া।

তালিকা নং ৫

| শিক্ষাগত স্তর ( বয়সগোষ্ঠী ) | ০—৯ | ১০—১৯ | ২০—২৯ | ৩০—৩৯ | ৪০—৪৯ | ৫০—৫৯ | ৬০—৬৯ | ৭০+ | মোট | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| নিরক্ষর/অশিক্ষিত | ৩৯ | ১৯ | ১৭ | ১৬ | ৪ | ৪ | ৫ | ৩ | ১২৭ | ৫০'২ |
| শিক্ষিত/সাক্ষর | | | | | | | | | | |
| বিদ্যালয় অনুত্তীর্ণ | — | ৩ | ৪ | ২ | ৫ | ৩ | ২ | — | ১৯ | ৭'৬ |
| প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২৫ | ২০ | ১২ | ৯ | ৩ | ৩ | — | ১ | ৭৩ | ২৯'০ |
| জুনিয়ার উচ্চ বিদ্যালয় | — | ১৪ | ৪ | ৩ | — | ১ | — | — | ২২ | ৮'৮ |
| উচ্চ বিদ্যালয | — | ৮ | ৩ | — | — | — | — | — | ১১ | ৪'৪ |
| মহাবিদ্যালয় | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| বিশ্ববিদ্যালয় | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| মোট | ৬৪ | ৬৪ | ৪০ | ৩০ | ২২ | ২১ | ৭ | ৪ | ২৫২ | |

**বিশ্লেষণ :** আলোচ্য তালিকায় নারী জনসমষ্টির ক্ষেত্রে সাক্ষরতার নমুনা পরিচয় নিতে গিয়ে তাদেব ভাগ করা হয়েছে নিরক্ষর/অশিক্ষিত, সাক্ষর, অনুত্তীর্ণ,

প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষা-স্তরের বিভিন্ন পর্যায়ে। নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের দেশ কত শোচনীয়ভাবে পিছিয়ে আছে তার নমুনা চুম্বক এই শুশুনিয়া গ্রাম, যেখানে মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত লেখাপড়ার কোনো চিহ্ন নেই, উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার্থীর আনুপাতিক হার মাত্র ৪'৪% এবং নিরক্ষরের সংখ্যা ৫০'২%। যারা অর্ধশিক্ষিত, কিংবা প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত লেখাপড়া শিখেছে তাদের হার ২৯'০%। ২৫২ জন নারীর মধ্যে প্রকৃত শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত ধরা যায় মাত্র ১৩% ভাগ অংশকে যারা প্রাথমিক স্তরের ঊর্ধে কিছু লেখাপড়া শিক্ষা করেছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে বিপুল অপচয়ের কথা সকলেই জানেন। জনসমষ্টিকে ১০০% ভাগ সুশিক্ষিত করে তোলার সমস্যাটি যে কত ভয়াবহ তা ১০ থেকে ৩৯ বছর বয়সগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার্থীর অপ্রতুলতা লক্ষ্য করলে বোঝা যায়।

অর্থনৈতিক মর্যাদা অনুসারে জনসমষ্টির বিস্তার—শুশুনিয়া, বাঁকুড়া।

তালিকা নং ৬

| বয়সগোষ্ঠী | পুরুষ | | | | মহিলা | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | উপার্জনক্ষম | অপরের আয়ের উপর নির্ভরশীল | সম্পূর্ণভাবে অপরের উপর নির্ভরশীল | মোট | উপার্জনক্ষম | অপরের আয়ের উপর নির্ভরশীল | সম্পূর্ণভাবে অপরের উপর নির্ভরশীল | মোট |
| ০—৯ | — | — | ৪৭ | ৪৭ | — | — | ৬৩ | ৬৩ |
| ১০—১৯ | ১ | ১১ | ৭৯ | ৯১ | — | ৪ | ৬০ | ৬৪ |
| ২০—২৯ | ১৯ | ১২ | ১৪ | ৪৫ | ১ | ৪ | ৩৫ | ৪০ |
| ৩০—৩৯ | ২৬ | ৩ | ৩ | ৩২ | ১ | ৪ | ২৫ | ৩০ |
| ৪০—৪৯ | ২৫ | — | ১ | ২৬ | — | ৩ | ১৯ | ২২ |
| ৫০—৫৯ | ২১ | ২ | — | ২৩ | ২ | — | ১৯ | ২১ |
| ৬০—৬৯ | ১৯ | — | — | ১৯ | — | ১ | ৬ | ৭ |
| ৭০+ | ৫ | — | ১ | ৬ | — | — | ৪ | ৪ |
| মোট | ১১৬ | ২৮ | ১৪৫ | ২৮৯ | ৪ | ১৬ | ২৩১ | ২৫১ |

**বিশ্লেষণ:** আলোচ্য তালিকায় অর্থনৈতিক মর্যাদা অনুসারে আয়

উপায়ের ক্ষেত্র বিবেচনা করে নারী-পুরুষের বিস্তার পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, ৯ বছর বয়স পর্যন্ত বয়সের সীমানায় কোনো পুরুষ আয় উপায় করে না। ( গ্রাম-শহর, শিল্পাঞ্চল ও শহর অঞ্চলে কিন্তু দেখা যায় শিশু শ্রমিক যারা খুব অল্প বয়স থেকেই রোজগারপাতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে বা সহযোগিতা করে )। আলোচ্য সমীক্ষায় ১০—১৯ বছরের বয়স সীমানায় কোনো নারী রোজকারকারী দেখা যায়নি। পুরুষ ২৮৯ জনের মধ্যে ১৪৫ জন নির্ভরশীল, ২৮ জন অপরের রোজগারের উপর নির্ভরশীল, ১১৬ জন কোনো-না-কোনো জীবিকা থেকে আয় উপায় করে। মহিলাদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে ২৩১ জন সম্পূর্ণ-ভাবে অপরের উপর নির্ভরশীল, আয় উপায়ে সাহায্যকারী নারীর সংখ্যা মাত্র ১৬ এবং উপার্জনশীল এমন নারীর সংখ্যা মাত্র ৪।

পুরুষ জনগোষ্ঠীর প্রধান জীবিকার বিস্তার—শুশুনিয়া, বাঁকুড়া।

তালিকা নং ৭

| বয়সগোষ্ঠী | শ্রম | কৃষি মালিক | শ্রমজীবি কৃষক | অস্থায়ী শ্রমজীবি | দিন মজুর | চাকুরীজীবি | অন্যান্য বৃত্তিভোগী | টেকনিক্যাল কাজ | কুটির শিল্প | অন্যান্য | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ০ ৯ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ১০—১৯ | — | ১ | — | — | — | — | — | — | — | — | ১ |
| ২০—২৯ | — | ৪ | — | ১ | ৪ | ৫ | ১ | — | ৪ | — | ১৯ |
| ৩০—৩৯ | ১ | ৫ | ১ | — | ৩ | ৬ | ৪ | ২ | ৪ | — | ২৬ |
| ৪০—৪৯ | ৫ | ৫ | ১ | — | ৩ | — | ৫ | — | ৬ | — | ২৫ |
| ৫০—৫৯ | ১ | ৬ | — | — | ৩ | ৩ | ২ | ১ | ৪ | — | ২০ |
| ৬০—৬৯ | ১ | ৭ | — | ১ | ১ | — | ২ | — | ৭ | — | ১৯ |
| ৭০+ | — | ১ | — | — | — | — | — | — | ১ | ৩ | ৫ |
| মোট | ৮ | ২৯ | ২ | ২ | ১৪ | ১৪ | ১৪ | ৩ | ২৬ | ১৩ | ১১৫ |

**বিশ্লেষণ ঃ** এই সমীক্ষায় শুশুনিয়া গ্রামের একটি অর্থনৈতিক জীবিকার চিত্র পাওয়া যায়। যারা উপার্জনশীল, তাদের পেশা কেন্দ্র করে সমীক্ষা করে

দেখা হয়েছে। এই চিত্রের মধ্যে নারীর সমস্যাটিকে আলাদা করে সরিয়ে রেখে পুরুষদের জীবিকার ক্ষেত্রটি কেমন ধরনের তা বিচার-বিবেচনা করা হয়েছে। কৃষি মালিক এই গ্রামে ২৯ জন, এর পরেই কুটীর শিল্পীর স্থান ২৬ জন। চাকুরীগত পেশায় নিযুক্ত পুরুষের সংখ্যা ১৪ জন মাত্র। কারিগরী জাতীয় পেশায় ৩ জন নিযুক্ত . শ্রমজীবি কৃষক মাত্র ২ জন। একটি গ্রামের অনগ্রসরতা ও উৎপাদন ক্ষমতা বুঝতে এই জাতীয় পরিসংখ্যানের মূল্য খুবই অসাধারণ।

**খ. শিল্প ও শহর ঘেঁষা গ্রাম অঞ্চল:—**

বয়স অনুপাতে জনসংখ্যার বিস্তার—দক্ষিণ বারাসতের হরিনারায়ণপুর মৌজা—

তালিকা নং ১

| নং | বয়সগোষ্ঠী | পুরুষ | | মহিলা | | মোট | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | নং | % | নং | % | নং | % |
| ১ | ০—৪ | ৬৬ | ৭.৬৯ | ৬৭ | ৭.৮০ | ১৩৩ | ১৫.২৬ |
| ২ | ৫—৯ | ৬১ | ৭.১০ | ৬৪ | ৭.৪৫ | ১২৫ | ১৪ ২৬ |
| ৩ | ১০—১৪ | ৫৪ | ৬.২২ | ৫০ | ৫.৮২ | ১০৪ | ১২ ১২ |
| ৪ | ১৫—১৯ | ৩৫ | ৪.০৭ | ৩৭ | ৪.৩১ | ৭২ | ৮.৩৯ |
| ৫ | ২০—২৪ | ৩১ | ৩.৬১ | ৩৯ | ৪.৫৪ | ৭০ | ৮.১৫ |
| ৬ | ২৫—২৯ | ৩৩ | ৩.৭৭ | ৩৮ | ৪.৪৩ | ৭১ | ৮.২৭ |
| ৭ | ৩০—৩৪ | ৩০ | ৩.৪৯ | ২৯ | ৩.৩৭ | ৫৯ | ৬.৮৯ |
| ৮ | ৩৫—৩৯ | ২২ | ২ ৫৬ | ২৪ | ২.৭৯ | ৪৬ | ৫.৩৬ |
| ৯ | ৪০—৪৪ | ২২ | ২.৫৬ | ২১ | ২.৪৪ | ৪৩ | ৫.০১ |
| ১০ | ৪৫—৪৯ | ১৭ | ১.৯৭ | ১৮ | ২.০৯ | ৩৫ | ৪.০৭ |
| ১১ | ৫০—৫৪ | ৯ | ২.২১ | ১৭ | ২.০০ | ৩৬ | ৪.২১ |
| ১২ | ৫৫—৫৯ | ৭ | .৮১ | ৯ | ১.০৪ | ১৬ | ১.৮৬ |
| ১৩ | ৬০—৬৪ | ১১ | ১.২৮ | ১৩ | ১.৫১ | ২৪ | ২.৭৯ |
| ১৪ | ৬৫—৬৯ | ৯ | ১.০৪ | ৭ | .৮১ | ১৬ | ১.৮৬ |
| ১৫ | ৭০+ | ৩ | .৩৪ | ৫ | .৫৮ | ৮ | .৯৩ |
| | মোট | ৪২০ | ৪৮.৭২ | ৪৩৮ | ৫০.৯৮ | ৮৫৮ | ৯৯.৪৩ |

**বিশ্লেষণ:** আলোচ্য তালিকায় দক্ষিণ বারাসতের হরিনারায়ণপুর মৌজায় ৮৫৮ জন পুরুষ ও মহিলার মধ্যে পুরুষ ৪২০ জন এবং মহিলা ৪৩৮ জন অর্থাৎ

মহিলার সংখ্যা পুরুষের চেয়ে বেশি। এই হার ২·২৬% বেশি। পুরুষের হার ৪৮·৭২%, মহিলার হার ৫০·৯৮%। মহিলাদের বয়স অনুপাতে দেখা যাচ্ছে ০—৪ বয়সের মধ্যে ৭·৮০%, যা অন্যান্য বয়স গোষ্ঠীব চেয়ে বেশি। ৭০-এর উর্ধে বয়সগোষ্ঠীর হাব মাত্র ·৫৮%। পুরুষগোষ্ঠীর মধ্যেও ০—৪ বয়সগোষ্ঠীতে শতকরা হার ৭·৬৯% দেখা যাচ্ছে এবং ৭০ বযসের উর্ধসীমায় মাত্র ·৩৪% ভাগ। কমবয়সের আওতায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে এবং উর্ধসীমায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা চলেছেন অবলুপ্তির পথে, ৭০-এর উর্ধে পুরুষ ও মহিলার গড পরমায়ু নেই বললেও অত্যুক্তি হয় না। জন বিস্ফোরণ ও জীবনীশক্তির বিস্তার বোঝা যাচ্ছে এই তালিকা থেকে।

জাতি বা গোষ্ঠী অনুসারে জনগণের বিস্তার—দক্ষিণ বারাসতের হরিনারায়ণপুর মৌজা—

তালিকা নং ২

| নং | বয়সগোষ্ঠী | পুরুষ | | মহিলা | | মোট | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | নং | % | নং | % | নং | % |
| ১ | ০—৪ | ৬৬ | ১৫·৭১ | ৬৭ | ১৫·২৯ | ১৩৩ | ১৫·২৬ |
| ২ | ৫—৯ | ৬১ | ১৪·৫২ | ৬৪ | ১৪·৬১ | ১২৫ | ১৪·৫৬ |
| ৩ | ১০—১৪ | ৫৪ | ১২·৮৫ | ৫০ | ১০·৪১ | ১০৪ | ১২·১২ |
| ৪ | ১৫—১৯ | ৩৫ | ৮·৩৩ | ৩৭ | ৮·৪৪ | ৭২ | ৮·৩৯ |
| ৫ | ২০—২৪ | ৩১ | ৭·৩৮ | ৩৯ | ৮·৯০ | ৭০ | ৮·১৫ |
| ৬ | ২৫—২৯ | ৩৩ | ৭·৮৫ | ৩৮ | ৮·৬৭ | ৭১ | ৮·২৭ |
| ৭ | ৩০—৩৪ | ৩০ | ৭·১৪ | ২৯ | ৬·৬২ | ৫৯ | ৬·৮৯ |
| ৮ | ৩৫—৩৯ | ২২ | ৫·২৩ | ২৪ | ৫·৪৭ | ৪৬ | ৫·৩৬ |
| ৯ | ৪০—৪৪ | ২২ | ৫·২৩ | ২১ | ৪·৭৯ | ৪৩ | ৫·০১ |
| ১০ | ৪৫—৪৯ | ১৭ | ৪·০৪ | ১৮ | ৪·১০ | ৩৫ | ৪·০৭ |
| ১১ | ৫০—৫৪ | ১৯ | ৪·৫২ | ১৭ | ৩·৮৮ | ৩৬ | ৪·২১ |
| ১২ | ৫৫—৫৯ | ৭ | ১·৬৬ | ৯ | ২·০৫ | ১৬ | ১·৮৬ |
| ১৩ | ৬০—৬৪ | ১১ | ২·৬১ | ১৩ | ২·৯৬ | ২৪ | ২·৭৯ |
| ১৪ | ৬৫—৬৯ | ৯ | ২ ১৪ | ৭ | ১·৫৯ | ১৬ | ১ ৮৬ |
| ১৫ | ৭০+ | ৩ | ·৭১ | ৫ | ১·১৪ | ৮ | ·৯৩ |
| | মোট | ৪২০ | ৯৯·৯২ | ৪৩৮ | ৯৯·৯২ | ৮৫৮ | ৯৯·৭৩ |

**বিশ্লেষণ :** এই তালিকায় দেখা যাচ্ছে, দক্ষিণ বারাসতের হরিনারায়ণপুর মৌজায় নানা জাতি বা গোষ্ঠীর বসবাস যেমন, কায়স্থ, সুবর্ণ বণিক, নাপিত, বৈষ্ণব, সদ্‌গোপ, শুঁড়ি, পৌণ্ড্র, নমঃশূদ্র, বাগ্‌দী, ক্যাওরা। জনসংখ্যার মধ্যে মুসলমান জনগোষ্ঠীও আছে। পৌণ্ড্ররাই বেশি, তারপর সদ্‌গোপ জাতীয় লোকের ঘনত্ব এখানে বেশি। ক্যাওরা জাতের লোক খুব কম। বয়স গোষ্ঠীর বিচারে পুরুষ ও মহিলার আনুপাতিক হার মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে যে এই গ্রামে নিম্ন বয়স গোষ্ঠীতে জনসংখ্যার বিস্তার বেশি এবং ঊর্ধ বয়সগোষ্ঠীতে জনসংখ্যার তীব্র হ্রাস।

জাতি ও গোষ্ঠী অনুপাতে জনসংখ্যার বিস্তার - দক্ষিণ বাবাসতের হরিনারায়ণপুর মৌজা—

তালিকা নং ৩

| নং | জাতি | পরিবার সংখ্যা | জন সংখ্যা | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | পুরুষ | | মহিলা | | মোট | |
| | | | নং | % | নং | % | নং | % |
| ১ | কায়স্থ | ৫ | ১৪ | ৬০'৮৭ | ৯ | ৩৯'১৩ | ২৩ | ২'৬৮ |
| ২ | সুবর্ণবণিক | ১ | ৩ | ৪২'৮৫ | ৪ | ৫৭'১৪ | ৭ | '৮১ |
| ৩ | নাপিত | ১৫ | ৩১ | ৩৩'৩৩ | ৩২ | ৫০'৭৯ | ৬৩ | ৭'৩৪ |
| ৪ | বৈষ্ণব | ১ | ৪ | ৩৩'৩৩ | ২ | ৩৩'৩৩ | ৬ | '৬৯ |
| ৫ | সদগোপ | ২৩ | ৬৫ | ৫১'১৮ | ৬২ | ৪৯'৬০ | ১২৭ | ১৪'৮০ |
| ৬ | শুঁড়ি | ১ | ৫ | ৬২'৫০ | ৩ | ৭১'৫০ | ৮ | '৯৩ |
| ৭ | পৌণ্ড্র | ১০৩ | ২৫২ | ৪৭'১৯ | ২৮২ | ৫২'৮০ | ৫৩৪ | ৬২ ২৩ |
| ৮ | নমঃশূদ্র | ১০ | ২৫ | ৪৭'১৬ | ২৮ | ৫২'৮৩ | ৫৩ | ৫২'৮৩ |
| ৯ | বাগদী | ২ | ৩ | ৪২'৮৫ | ৪ | ৫৭'১৪ | ৭ | '৮১ |
| ১০ | ক্যাওরা | ১ | ২ | ৬৬'৬৬ | ১ | ৩৩'৩৩ | ৩ | '৩৪ |
| ১১ | মুসলিম | ৩ | ১৬ | ৫৯'২৫ | ১১ | ৪০'৭৪ | ২৭ | ৩'১৪ |
| | মোট | ১৬৫ | ৪২০ | ৫৪৭'১৭ | ৪৩৮ | ৪৯৮'৩৩ | ৮৫৮ | ১৪৬'৬০ |

**বিশ্লেষণ : এই তালিকায় কায়স্থ, সুবর্ণবণিক, নাপিত, বৈষ্ণব, সদ্‌গোপ, শুঁড়ি, পৌণ্ড্র, নমঃশূদ্র, বাগদী, ক্যাওরা জাতের লোকদের পুরুষ ও মহিলার জনসংখ্যার বিস্তার অনুসন্ধান করা হয়েছে (মুসলমান গোষ্ঠীর ৩টি পরিবারসহ) ১৬৫টি পরিবারের হিসেব নিয়ে। দেখা যাচ্ছে, এই এলাকায় পৌণ্ড্রদের জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি ( পুরুষ ৪৭'১৯%, মহিলা ৫২'৮০%), সর্বনিম্ন লোকসংখ্যা ক্যাওরা জাতের।**

**বিবাহিত/অবিবাহিত প্রভৃতি বিচার বিবেচনায় জনগোষ্ঠীর বিস্তার—দক্ষিণ বারাসতের হরিনারায়ণপুর মৌজা—**

তালিকা নং ৪

| নং | বয়স গোষ্ঠী | পুরুষ | | | | | মহিলা | | | | | সর্বমোট | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | অবিবাহিত | বিবাহিত | বিধবা | বিবাহ বিচ্ছেদ | মোট | অবিবাহিত | বিবাহিত | বিধবা | বিবাহ বিচ্ছেদ | মোট | অবিবাহিত | বিবাহিত | বিধবা | বিবাহ বিচ্ছেদ | মোট |
| ১ | ০—৪ | ৬৬ | — | — | — | ৬৬ | ৬৭ | — | — | — | ৬৭ | ১৩৩ | — | — | — | ১৩৩ |
| ২ | ৫—৯ | ৬১ | — | — | — | ৬১ | ৬৪ | — | — | — | ৬৪ | ১২৫ | — | — | — | ১২৫ |
| ৩ | ১০—১৪ | ৫৪ | — | — | — | ৫৪ | ৩৪ | ১৬ | — | — | ৫০ | ৮৮ | ১৬ | — | — | ১০৪ |
| ৪ | ১৫—১৯ | ৩১ | ৪ | — | — | ৩৫ | ১০ | ২৫ | ১ | — | ৭ | ৪২ | ২৯ | ১ | — | ৭২ |
| ৫ | ২০—২৪ | ১৪ | ১৭ | — | — | ৩১ | ৩ | ৩৩ | ২ | ১ | ৩৯ | ১৭ | ৫০ | ২ | ১ | ৭০ |
| ৬ | ২৫—২৯ | ১ | ২৯ | ৩ | — | ৩৩ | — | ৩৪ | — | ৪ | ৩৮ | ১ | ৬৩ | ৩ | ৪ | ৭১ |
| ৭ | ৩০—৩৪ | ৬ | ১৭ | ৫ | ২ | ৩০ | — | ২৯ | — | — | ২৯ | ৬ | ৪৬ | ৫ | ২ | ৫৯ |
| ৮ | ৩৫—৩৯ | — | ১৯ | ৩ | — | ২২ | — | ২২ | ২ | — | ২৪ | | ৪১ | ৫ | — | ৪৬ |
| ৯ | ৪০—৪৪ | — | ২১ | — | ১ | ২২ | — | ১৭ | ৩ | ১ | ২১ | | ৩৮ | ৩ | ২ | ৪৩ |
| ১০ | ৪৫—৪৯ | — | ১৭ | — | — | ১৭ | — | ১২ | ৬ | — | ১৮ | | ২৯ | ৬ | — | ৩৫ |
| ১১ | ৫০—৫৪ | — | ১৪ | ২ | ৩ | ১৯ | — | ১৪ | ৩ | — | ১৭ | | ২৮ | ৫ | ৩ | ৩৬ |
| ১২ | ৫৫—৫৯ | — | ৬ | ১ | — | ৭ | — | ৮ | ০ | ১ | ৯ | | ১৪ | ১ | ১ | ১৬ |
| ১৩ | ৬০—৬৪ | — | ৬ | ২ | ৩ | ১১ | — | ৫ | ৬ | ২ | ১৩ | | ১১ | ৮ | ৫ | ২৪ |
| ১৪ | ৬৫—৬৯ | — | ৬ | ২ | ১ | ৯ | — | ৩ | ৪ | — | ৭ | | ৯ | ৬ | ১ | ১৬ |
| ১৫ | ৭০+ | — | ২ | ১ | — | ৩ | — | ১ | ৪ | — | ৫ | | ৩ | ৫ | — | ৮ |
| | মোট | ২৩৩ | ১৫৮ | ১৯ | ১০ | ৪২০ | ১৭৯ | ২০৯ | ৩১ | ৯ | ৪৩৮ | ৪১২ | ৩৭৭ | ৫০ | ১৯ | ৮৫৮ |

**বিশ্লেষণঃ** আলোচ্য তালিকা থেকে জানা যাচ্ছে যে, জনগোষ্ঠীকে বিবাহিত, অবিবাহিত, বিধবা, বিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গ জীবন অনুযায়ী ভাগ করা যায়। ৮৫৮ জনসংখ্যার মধ্যে ৪২০ জন পুরুষ এবং ৪৩৮ জন মহিলা। ১৭ বছরের সময় বিস্তারের আওতায় মহিলার সংখ্যা ১১'৭৩% এবং অন্যান্য বয়সের বিস্তার এই তালিকা থেকে জানা যাচ্ছে।

পরবর্তী (৫) নং তালিকায় বয়স সীমার বিস্তারে পুরুষ ও মহিলার বিবাহ হওয়ার বিবরণের পরিসংখ্যান নেওয়া হয়েছে তা এখানে সংযুক্ত করা হোলো।

পরবর্তী (৬)নং তালিকায় উক্ত এলাকার জনসংখ্যার মধ্যে শিক্ষিত, অশিক্ষিত পুরুষ ও মহিলার শতকরা হার লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

৭নং তালিকা থেকে জানা যাচ্ছে উক্ত গ্রামের প্রাথমিক উপার্জনের ক্ষেত্রে জনসংখ্যার বিস্তার কি রকম।

তালিকা নং ৫

| বয়সগোষ্ঠী | পুরুষ | | বয়সগোষ্ঠী | মহিলা | |
|---|---|---|---|---|---|
| | নং | % | | নং | % |
| ১৬ | ২ | ১'০৬ | ৫ | ২ | '৫৮ |
| ১৭ | ৩ | ১'৬০ | ৬ | ৩ | '৪৭ |
| ১৮ | ৪ | ২'১৩ | ৭ | ৩ | '৪৭ |
| ১৯ | ৫ | ২'৬৭ | ৮ | ৪ | ১'১৭ |
| ২০ | ১৬ | ৮'৫৫ | ৯ | ৫ | ১'৪৬ |
| ২১ | ৭ | ৩'৭৪ | ১০ | ৬ | ১'৭৫ |
| ২২ | ১৮ | ৯'৬২ | ১১ | ৭ | ২'০৫ |
| ২৩ | ২১ | ১১'২২ | ১২ | ৪ | ২'৩৪ |
| ২৪ | ৩২ | ১৭'১১ | ১৩ | ১০ | ২'৯৩ |
| ২৫ | ২২ | ১১'৭৬ | ১৪ | ২৩ | ৬'৭৪ |
| ২৬ | ১৫ | ৮'০২ | ১৫ | ২৮ | ৮'২১ |
| ২৭ | ১২ | ৪'৭১ | ১৬ | ৩০ | ৮'৭৯ |
| ২৮ | ৯ | ৪'৮১ | ১৭ | ৪০ | ১১'৭৩ |
| ২৯ | ৬ | ৩'২০ | ১৮ | ৩২ | ৯'৩৮ |
| ৩০ | ৪ | ২'১৩ | ১৯ | ২৩ | ৬'৭৪ |
| ৩১ | ৫ | ১'৬০ | ২০ | ১০ | ২'৯৩ |
| ৩২ | ৩ | ২'৬৭ | ২১ | ৯ | ২'৬৩ |
| ৩৩ | ০ | ০ | ২২ | ৬ | ১'৭৫ |
| ৩৪ | ২ | ১'০৬ | ২৩ | ৪ | ১'১৭ |
| ৩৫ | ১ | '৫৩ | ২৪ | ৩ | '৪৭ |
| ৩৬ | | | ২৫ | ২ | '৫৮ |
| ৩৭ | | | ২৬ | ১ | '২৯ |
| মোট | ১৮৭ | ৯৮'১৯ | | ২৫৫ | ৭৪'৬৩ |

জনসংখ্যার শিক্ষিত অশিক্ষিত অনুপাত

তালিকা নং ৬

| নং | | পুরুষ | | মহিলা | | মোট | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | নং | % | নং | % | নং | % |
| ১ | অশিক্ষিত | ২২৬ | ৫৩·৮ | ২৬৮ | ৬১·১ | ৪৯৪ | ৫৭·৫৭ |
| ২ | শিক্ষিত | ৪৭ | ১১·১ | ৭৭ | ১৭·৫ | ১২৪ | ১৪·১৫ |
| | বিদ্যালয় অনুত্তীর্ণ | | | | | | |
| ৩ | প্রাথমিক | ১১২ | ২৬·৬ | ৬৮ | ১৫·৫ | ১৮০ | ২০·৯৭ |
| ৪ | মাধ্যমিক | ২৪ | ৫·৭ | ২১ | ৪·৭ | ৪৫ | ৫·২৪ |
| ৫ | মহাবিদ্যালয় | ৮ | ১·৮ | ৪ | ·৯১ | ১২ | ১·৩৯ |
| ৬ | বিশ্ববিদ্যালয় | ৩ | ·৭ | ০ | ০ | ৩ | ·৩৪ |
| | মোট | ৪২০ | ৯৯·৭ | ৪৩৮ | ৯৯·৭১ | ৮৫৮ | ৯৯·৬৬ |

প্রাথমিক উপার্জনশীলতার দিক দিয়ে জনসংখ্যার বিস্তার

তালিকা নং ৭

| নং | | পুরুষ | | মহিলা | | মোট | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | নং | % | নং | % | নং | % |
| ১ | কৃষিজীবি | ৩৭ | ২৩·২ | ৭ | ৩৩·৩ | ৪৪ | ২৪·৪ |
| ২ | দিনমজুর | ২৭ | ১৬·৯ | ১২ | ৫৭·১ | ৩৯ | ২১·৬ |
| ৩ | ভেণ্ডার | ৫৩ | ৩৩·৩ | — | — | ৫৩ | ২৯·৪ |
| ৪ | ভ্যানপুলার | ১৪ | ৮·৮ | — | — | ১৪ | ৭·৭ |
| ৫ | সরকারী চাকুরে | ১৭ | ১০·৫ | — | — | ১৭ | ৯·৪ |
| ৬ | শিক্ষক | ৩ | ১·৮ | — | — | ৩ | ১ ৬ |
| ৭ | ডাক্তার | ০ | ০ | — | — | — | — |
| ৮ | ব্যবসায়ী | ৭ | ৪·৪ | — | — | ৭ | ৩·৮ |
| ৯ | ভিক্ষুক | ১ | — | ২ | ৯·৯ | ৩ | ১·৬ |
| | মোট | ১৫৯ | ৯৮·৯ | ২১ | ১০০·৩ | ১৮০ | ৯৯·৫ |

মেদিনীপুর জেলার দীঘা-র নিকটবর্তী খাদাল-গোবরা গ্রামের জনগোষ্ঠীর বয়স, লিঙ্গ, জাতপাত, শিক্ষাদীক্ষা, উপার্জনশীলতার একটি পরিসংখ্যান তথ্যপঞ্জী নীচে সন্নিবিষ্ট হোলো। এই তথ্যচিত্র থেকে বিশদ বিবরণ জানা যাবে— জনসংখ্যার বিস্তার ও তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের একটি পরিপূর্ণ চিত্র।

দেখা যাচ্ছে, ৯৭২ জন পুরুষ-মহিলার মধ্যে ০—৯ বছর বয়সগোষ্ঠীতে সংখ্যা ২৯০ এবং পরবর্তী বয়স গোষ্ঠী পর্যায়ক্রমে কমে এসেছে। ৬০ বছরের উর্ধে জীবিত লোকের সংখ্যা ৪৪ জন। যদি সকলেই বেঁচে থাকে ০—৯ বছরের বয়স-গোষ্ঠীর নারী-পুরুষ, তাহলে ৫০ বছর পরে এই দেশের লোকসংখ্যার আনুপাতিক হার ৭ গুণ বৃদ্ধি পেতে পারে বলে সাধারণভাবে অনুমান করা যায়। জাত-পাতের তালিকায় দেখা যাচ্ছে, সমাজের নিম্নবর্ণের ও নিম্নধরনের জীবিকার লোকসংখ্যার ঘনত্ব এখানে বেশি কিন্তু উচ্চবর্ণের সংখ্যার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের হারের সমতা নেই। ফলে, আগামীদিনে সামাজিক ক্ষেত্রে এই জাতপাতের ভেদরেখা অনেকখানি শিথিল হয়ে পড়তে বাধ্য। ১৯ বছর বয়ঃক্রমের মধ্যে পুরুষ ও মহিলারা বিবাহিত দেখা যাচ্ছে এবং বিধবার সংখ্যাও আনুপাতিক হারে বেশি নয়। বিধবারা পুনরায় বিবাহিত কিনা সে তথ্য এখানে সংগৃহীত হয়নি। শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, ৪৯২ জন নারী-পুরুষের মধ্যে মাত্র ১১ জন মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে। ৪৯২ জনের মধ্যে ৩৭১ জন অশিক্ষিত—ফলে শিক্ষার প্রসার এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে তেমন বিস্তার লাভ করেনি দেখা যাচ্ছে। ৪৪২ জন পুরুষের জীবিকার বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, এরা অধিকাংশই মৎস্যজীবি—অন্যান্য জীবিকার মধ্যে কৃষি, দিনমজুরী, স্বল্প লোক কিছু চাকরী-বাকরী করে জীবন-ধারণ করে। অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার প্রসারণা, জীবন ও জীবিকার মানের উন্নতি, শিক্ষার মাধ্যমে জাত-পাতের বাঁধন শিথিল করা প্রভৃতি কিছু অত্যাবশ্যক কর্মসূচী এই অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর জন্য অত্যন্ত জরুরী।

বয়সগোষ্ঠী অনুসারে মেদিনীপুর দীঘা সন্নিহিত খাদাল-গোবরা গ্রামের জনসংখ্যার ব্যাপ্তি।

তালিকা নং ১

| বয়সগোষ্ঠী | পুরুষ | মহিলা | মোট |
|---|---|---|---|
| ০—৯ | ১৪০ | ১৫০ | ২৯০ |
| ১০—১৯ | ১১৮ | ১০২ | ২২০ |
| ২০—২৯ | ৬৯ | ৭৫ | ১৪৪ |
| ৩০—৩৯ | ৫৪ | ৫৩ | ১০৭ |
| ৪০—৪৯ | ৪৯ | ৪৫ | ৯৪ |
| ৫০—৫৯ | ৪১ | ৩২ | ৭৩ |
| ৬০+ | ২১ | ২৩ | ৪৪ |
| মোট | ৪৯২ | ৪৮০ | ৯৭২ |

জাতপাত অনুসারে জনগোষ্ঠীর বিস্তার

তালিকা নং ২

| বয়সগোষ্ঠী | পরিবার সংখ্যা | জনসংখ্যা | | মোট |
|---|---|---|---|---|
| | | পুরুষ | মহিলা | |
| রাজু | ৪৪ | ২২৭ | ২২২ | ৪৪৯ |
| নমঃশূদ্র | ৩২ | ১২৪ | ১১৯ | ২৪৩ |
| জালি-কৈবর্ত | ২৭ | ৫২ | ৫৭ | ১০৯ |
| কুর্মী | ১৭ | ৪৯ | ৪৫ | ৯৪ |
| বৈষ্ণব | ৮ | ২০ | ২১ | ৪১ |
| ব্রাহ্মণ | ৫ | ১১ | ৯ | ২০ |
| কায়স্থ | ৩ | ৯ | ৭ | ১৬ |
| মোট | ১৩৬ | ৪৯২ | ৪৮০ | ৯৭২ |

বিবাহিত/অবিবাহিত শ্রেণী অনুযায়ী জনগোষ্ঠীর বিস্তার

তালিকা নং ৩

| বয়সগোষ্ঠী | পুরুষ | | | মহিলা | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | অবিবাহিত | বিবাহিত | বিধবা | অবিবাহিত | বিবাহিত | বিধবা |
| ০—৯ | ১৪০ | — | — | ১৫০ | — | — |
| ১০—১৯ | ১১৫ | ৩ | — | ৮১ | ২১ | — |
| ২০—২৯ | ১২ | ৫৭ | — | — | ৭৫ | — |
| ৩০—৩৯ | — | ৫৪ | — | — | ৫১ | ২ |
| ৪০—৪৯ | — | ৪৭ | ২ | — | ৪০ | ৫ |
| ৫০—৫৯ | — | ৩৮ | ৩ | — | ২৫ | ৭ |
| ৬০+ | — | ১৬ | ৫ | — | ৫ | ১৮ |
| মোট | ২৬৭ | ২১৫ | ১০ | ২৩১ | ২১৭ | ৩২ |

শিক্ষাদীক্ষা অনুযায়ী জনগোষ্ঠীর বিস্তার

তালিকা নং ৪

| বয়সগোষ্ঠী | অশিক্ষিত | শিক্ষিত বিদ্যালয় অনুত্তীর্ণ | প্রাথমিক বিদ্যালয় | উচ্চ বিদ্যালয় | মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় |
|---|---|---|---|---|---|
| ০—৯ | ১৪০ | — | — | — | — |
| ১০—১৯ | ৯৩ | ৪ | ১৬ | ৪ | ১ |
| ২ —২৯ | ৪১ | ৬ | ১১ | ৬ | ৫ |
| ৩০—৩৯ | ২১ | ১৪ | ৮ | ৩ | ৪ |
| ৪০—৪৯ | ২৫ | ১২ | ৩ | ২ | ১ |
| ৫০—৫৯ | ৩১ | ৯ | ৪ | ১ | — |
| ৬০+ | ২৭ | ৫ | ১ | ১ | — |
| মোট | ৩৭৮ | ৫০ | ৪৩ | ১৭ | ১১ |

সর্বমোট লোক সংখ্যা = ৪৯৯ জন

## জীবিকা অনুযায়ী জনগোষ্ঠীর বিস্তার

### তালিকা নং ৫

| বয়সগোষ্ঠী | মৎস্যজীবি | কৃষিজীবি | দিনমজুর | চাকুরীজীবি | অন্যান্য | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১০—১৯ | ৪ | ২ | ৬ | ১ | — | ১৩ |
| ২০—২৯ | ৩৪ | ৭ | ২০ | ৭ | ১ | ৬৯ |
| ৩০—৩৯ | ২৫ | ৭ | ৯ | ১১ | ২ | ৫৪ |
| ৪০—৪৯ | ২২ | ৫ | ৫ | ৬ | ২ | ৪০ |
| ৫০—৫৯ | ১৫ | ৯ | ২ | ৫ | ১ | ৩২ |
| ৬০+ | ২ | ৭ | — | ৯ | ২ | ২০ |
| মোট | ১০২ | ৩৭ | ৪২ | ৩৯ | ৮ | ২২৮ |

মোট লোকসংখ্যা = ৪৫৬

# গ্রন্থপঞ্জী


১। রবীন্দ্রনাথ—শিক্ষা

২। ক্ষেত্রপাল দাসঘোষ—আমাদের শিক্ষা

৩। যোগেশচন্দ্ররায় বিদ্যানিধি—শিক্ষা-প্রকল্প

৪। ভুজঙ্গভূষণ ভট্টাচার্য—রবীন্দ্র শিক্ষা-দর্শন

৫। বিশ্বভারতী জার্নাল ও রবীন্দ্রভারতী পত্রিকার কিছু নির্বাচিত সংখ্যা

৬। এন. সি. আর. টি-র প্রকাশিত কিছু নির্বাচিত জার্নাল

৭। কে. কে. মুখার্জী—নিউ এডুকেশন এণ্ড ইট্‌স আসপেকট্‌স

৮। দিবাকর দাস মোহান্ত—এলোকেশন অফ পিউপিল্‌স্ ইন সেকেণ্ডারী এডুকেশন ১৯৬০

৯। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ—এন আইডিয়ালিস্ট ভিউ অফ লাইফ

১০। কে. কে. মুখার্জী—আওয়ার গ্রেট এডুকেটারস্

১১। হরিসাধন গোস্বামী—শিক্ষার নূতন দিগন্ত ( প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ) ( প্রকাশ মন্দির : কলিকাতা )

১২। দিবাকর দাস মহান্ত—আওয়ার এডুকেশন ইন দি মেকিং,

১৩। জন ডিউই—ডেমোক্র্যাসি এণ্ড এডুকেশন

১৪। পার্সিনান—এডুকেশন ইটস্ ডাটা এণ্ড ফাষ্ট প্রিন্সিপলস্

১৫। অন্নদাশঙ্কর রায়—শিক্ষার ভবিষ্যৎ

১৬। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ—ইস্টার্ন রিলিজিয়নস্ এণ্ড ওয়েস্টার্ন থটস্

১৭। হরিসাধন গোস্বামী—যুগের অভিব্যক্তি ও শিক্ষা ( ভারতী বুক স্টল, কলিকাতা )

১৮। রস—গ্রাউণ্ড ওয়ার্ক অফ এডুকেশন্যাল থিওরী

১৯। রাস্ক—দি ফিলজফিক্যাল বেসেজ, অফ এডুকেশন

২০। জে. এম. সেন—দি হিস্ট্রি অফ এলিমেণ্টারি এডুকেশন ইন ইণ্ডিয়া

২১। হরিসাধন গোস্বামী—শিক্ষা সাধনায় পূর্বসূরী ( নলেজ হোম কলিকাতা )

২২। জন ডিউই—স্কুল এণ্ড সোসাইটি

২৩। ব্রুবেকার—দি ফিলজফিস্‌ অফ এডুকেশন
২৪। জন ডিউই—এক্সপিরিয়েন্স এণ্ড এডুকেশন
২৫। চার্লস্‌ হ্যামেল—এডুকেশন টুডে ফর এডুকেশন অফ টুমরো (ইউনেস্কো)
২৬। আর্থার ম্যাথিউ—দি এডুকেশন অফ ইণ্ডিয়া
২৭। রাধাকুমুদ মুখার্জি—এন্‌সেণ্ট ইণ্ডিয়ান এডুকেশন
২৮। রবীন্দ্রনাথ—এন ইস্টার্ণ ইউনিভার্সিটি
২৯। রবীন্দ্রনাথ—সেণ্টার অফ ইণ্ডিয়ান কালচার
৩০। হরিসাধন গোস্বামী—মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠন (ক্যালকাটা পাবলিশার্স)
৩১। হরিসাধন গোস্বামী—ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্রমবিকাশ (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ)
৩২। হরিসাধন গোস্বামী—শিক্ষা ও সমাজ (১৯৫৪)